সন্তানের লালন-পালন ও তালীম-তরবিয়ত
ইসলামিক দৃষ্টিকোণ

(বাংলা-bengali-البنغالية)

মুহাম্মাদ বিন শাকের আশ্ শারীফ

অনুবাদক :আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

সম্পাদক : আবু শআইব মুহাম্মাদ সিদ্দীক
আলী হাসান তাইয়েব

1430هـ - 2009م

islamhouse.com

﴿ نحو تربية إسلامية راشدة من الطفولة حتى البلوغ ﴾

(باللغة البنغالية)

محمد بن شاكر الشريف

ترجمة

عبد الله شهيد عبد الرحمن

مراجعة

أبو شعيب محمد صديق

علي حسن طيب

2009 - 1430

islamhouse.com

সূচীপত্র

বিষয়

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রারম্ভিকা

সকল প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসূল সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ এর ওপর ও তাঁর পরিবার পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কেরামের প্রতি।

আল্লাহ তাআ'লা তার সম্মানিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রেসালাতের মাধ্যমে অপরাপর সকল মানুষের রেসালাতের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ মানবতার উন্নতি, অগ্রগতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনীত আদর্শে গিয়ে পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। যা সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দেবে প্রতিটি অগ্রগতি ও সভ্যতা বিনির্মাণের প্রয়াসে। যার উদ্দেশ্য পরিশুদ্ধ। এবং যার মধ্যে মানবজাতির সকল কল্যাণ নিহিত। তা হলো সূত্রনির্ভর ইসলামী জীবন বিধান ও তার অনুশাসনের ওপর এমনভাবে দৃঢ় থাকা যেখান থেকে কখনো বের হবে না, অবাধ্য হবে না কোন সময়। বরং সেই বিধানের সাথে জুড়ে থাকা ও তার পথ নির্দেশনা আঁকড়ে ধরার প্রয়াস পাবে সর্বদা।

শিশুর যত্ন ও প্রতিপালন বিষয়ক আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। আলোচনার গুরুত্বের মধ্যদিয়েই শিশুর যত্ন ও প্রতিপালনের মূল গুরুত্বটা ফুটে ওঠে। এখানে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন বোধ করছি। ফলে প্রশিক্ষণমূলক পদ্ধতিসমূহ অভিভাবকদেরকে তাদের প্রতিভার নিকটবর্তী একটা পর্যায় নিয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। এতে একজন অভিভাবক যে কোন উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে এমনভাবে সক্ষম হবেন, যেন তিনি বহুকাল থেকে এর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছেন ও সে এর জন্য যুগপোযুগী নিয়ম-নীতির অনুসরণ করবে।

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষামূলক তৎপরতা অনেক, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিভাবকের প্রতিপালন সংশ্লিষ্ট সামর্থ, অভিজ্ঞতা ও নৈপূণ্যের পরিধি, তার শিক্ষামূলক উপকরণ ও পদ্ধতিসমূহ সংগ্রহ ও তার মূল্যায়ন এবং যথাস্থানে তা বাস্তবায়নের সামর্থ্য ভেদে তা বিশাল রকমের প্রভাব বিস্তার করে থাকে ।

যে আধুনিক দৃশ্যপটে আমাদের মুসলিম উম্মাহ জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন সেটা শিশুর যত্ন ও প্রতিপালনের প্রচেষ্টার প্রতি গুরুত্বারোপের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করে তুলে। যারা প্রতিপালন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ বা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে অথবা এ ক্ষেত্রে যাদের সামান্য পরিমাণ গুরুত্ববোধ রয়েছে তারা যদি চান তাদের কাছে যা কিছু আছে তা দিয়েই তারা শিক্ষা দেবেন তাহলে ভালো কথা, তবে এতে তাদের ভূমিকা কী? এটা অভিভাবকদের দায়িত্ব।

কিন্তু মার্জিত মূল্যবোধসম্পন্ন মুসলিম ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণে যথাযথ তরবিয়তের ভূমিকা রয়েছে এই দিকেও দৃষ্টি ফেরাতে হবে। কারণ তা ধর্মহারা প্রজন্মকে ধর্মীয় অনুশাসন পালনে অভ্যস্ত করবে। নিজে ধর্মের ওপর চলবে ও অপরকে সেদিকে আহ্বান জানাবে। ফলশ্রুতিতে বাস্তবেই সর্বোত্তম জাতি হওয়ার যোগ্যতা নিশ্চিত হয়ে যাবে। আর নিশ্চিত করতে পারবে নিজের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালে মুক্তি-সফলতা। এর ওপর ভিত্তি করেই প্রতিপালনের তাৎপর্য ও এর প্রতি গুরুত্বারোপের মূল্যায়ন করা হয়েছে। এতদ্বিষয়ে মুসলিম জাতির সুষম আচরণের অভাব এবং অভিভাবকদের প্রায়োগিক জ্ঞানের ঘাটতি ঘুচানোর তীব্র প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করে আমার বিদ্যার স্বল্পতা সত্ত্বেও আমি 'শিশুর তালীম তরবিয়তে ইসলামী দিকনির্দেশনা' শীর্ষক বইটি পরিবেশন করে এই মহতি কাজে অংশ গ্রহণ করলাম। আমি আল্লাহ

তাআলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই ক্ষেত্রটাকে আরো সমৃদ্ধ করেন যেন তা অভিভাবকদের দিক-নির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়।

পরিকল্পনাঃ

আলোচ্য বইতে একটি প্রারম্ভিকা থাকবে যা ইতোমধ্যে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। তরবিয়ত শব্দের সংজ্ঞা ও তার গুরুত্ব, কাকে উদ্দেশ্য করে এই পুস্তক, কোন ভিত্তির ওপর নির্ভর করে প্রতিপালনের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে বয়সের স্তর বিন্যাস করা হয়েছে, এ সকল বিষয় সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হবে।

'পূর্বকথা' এর মধ্যে নিম্ন বর্ণিত তিনটি পরিচ্ছেদ থাকবে :

প্রথম : অবোধ শৈশব স্তর।

দ্বিতীয় : বুঝসম্পন্ন শৈশব স্তর।

তৃতীয় : বয়োঃসন্ধি স্তর।

প্রতিটি পরিচ্ছেদে আবার নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আলোচনা থাকবে।

- স্তরের বৈশিষ্ট ও গুণাবলি
- অন্তরায় ও সমস্যাসমূহ
- উপকরণ ও পদ্ধতিসমূহ
- পুরস্কার ও শাস্তি
- দিকনির্দেশনা ও উপদেশাবলি

পুস্তকের পরিশিষ্টে কতিপয় প্রমাণপঞ্জি সংযুক্ত করা হয়েছে, শিশুর যত্ন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে ওখান থেকেও সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

আলোচক অথবা অভিভাবক তরবিয়ত এর ক্ষেত্রে এমন গতানুগতিক বিষয় ব্যবহার করবে না যার বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন রয়েছে এবং যা যুগের চাহিদায় উত্তীর্ণ নয়। বরং তাকে মনে রাখতে হবে তিনি আচরণ করছেন একটি জীবন্ত পৃথিবীর সঙ্গে। আর সে পৃথিবীটা হলো আত্মা, হৃদপিণ্ড, বুদ্ধি ও দেহ নিয়ে গঠিত একজন পূর্ণ মানুষ।

এ কারণে সে জড় পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিধি-বদ্ধ ও প্রচলিত কতিপয় প্রণালী দ্বারা তার অনেক কর্মকাণ্ড আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। আর এ সকল গতানুগতিক নিয়ম-কানুন সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়। বরং প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাব ও গুণাবলির মাঝে রয়েছে বৈচিত্র্য। উপরন্তু সেগুলো একই ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বয়সের তারম্যের কারণে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সে কারণে একজন তরবিয়ত বিষয়ক আলোচকের পক্ষে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরিবর্তিত সাংঘর্ষিক দিকগুলো অথবা একজনের সকল বিষয় আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য বৈ-কি।

আলোচকের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ প্রকাশিত কয়েকটি বিষয় চিহ্নিত করবে। অতঃপর তার সমাধান পেশ করবে। ফলে এক্ষেত্রে সে একটি এমন আদর্শ উপস্থাপন করতে পারে যা ফলপ্রসূ হওয়া সম্ভব। অথবা তার ক্লাশ বা আলোচনার ওপর অনুমান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ফলে উদ্ভূত সাক্ষাত

প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে, যে সকল ভূমিকা সে পালন করবে ও যে সকল পরিস্থিতির সে সম্মুখীন হয় সেখানে বিনম্র পদ্ধতিতে আচরণ করতে সক্ষম হবে।

এখানে আর একটি অতিরিক্ত কথা বলে রাখছি, শিশুর যত্ন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় আয়ত্ব করা সম্ভব তার সবগুলো কিন্তু এই পুস্তকে সন্নিবেশ করা সম্ভব নয়। কারণ বিশদ ব্যাখ্যা, অসংখ্য প্রশাখা ও অগণিত উত্তর রয়েছে। সেগুলো আলোকপাত করা অথবা ওপর থেকে খাঁচায় আটকানোর জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। যাতে বক্ষমান পুস্তকটি মূল বিষয় অনুধাবনের ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে না যায়। অন্যথায় আমরা অসংখ্য ব্যাখ্যার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাবো। হারিয়ে ফেলব আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য। ফলে আলোচনা বস্তুত তার প্রথম জায়গাতেই ফিরে যাবে। তখন আলোচনাটা আর প্রতিপালনের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর নির্ধারিত প্রশাখা সংশ্লিষ্ট হবে না।

পুস্তকখানা নাতিদীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত করণের দিকে কঠোরভাবে লক্ষ্য রেখেছি ; তার মধ্যে সন্নিবেশিত বিষয়াবলী থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য বিরতি না দিয়ে তা ক্রমাগত অধ্যয়নে পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ তা'আলা সকল কল্যাণের নিয়ামক। অতএব আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার উসিলায় পুস্তকখানা সমাপ্ত করার জন্য তাঁর সাহায্য, হেদায়েত, তাওফিক ও দিকনির্দেশনা প্রার্থনা করি ।

মুহম্মদ বিন শাকের আশ্‌-শরীফ

রিয়াদ : ১০/৪/১৪২৬

ভূমিকা

এখানে থাকছে তরবিয়ত ও তালীম শব্দ দুটির বিশ্লেষণ, অভিভাবকদের প্রকারভেদ, তরবিয়ত এর স্তরবিন্যাস এবং তার ক্ষেত্র ও পরিধি সম্পর্কে পর্যালোচনা। তরবিয়ত সাংস্কৃতিক অর্থে একটি সামাজিক প্রক্রিয়, যা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে তার আচার-ব্যবহার, বৈষয়িক জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিদ্যায় সমৃদ্ধ করে একটি সু-নির্দিষ্ট গণ্ডিতে পৌছাতে সক্ষম করে। তবে হ্যাঁ, তা এক সমাজের সঙ্গে অন্য সমাজের পার্থক্যের ভিত্তিতে হতে পারে। কারণ প্রতিটি সমাজের ভিন্নতর কিছু বৈশিষ্ট্যতো থাকতেই পারে।

আর তরবিয়ত এর কর্মক্ষেত্রে প্রদান এবং গ্রহণের একটা স্তর তো রয়েছেই। প্রদানটা হবে অভিভাবকের পক্ষ থেকে আর শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে হবে গ্রহণ ও প্রভাবান্বিত হওয়া।

বস্তুতঃ অভিভাবকের প্রদান শুধুমাত্র তখনই ফলপ্রসূ ও কার্যকর হবে যখন তা নির্ভুল পদ্ধতি ও সঠিক উপকরণ সহযোগে হবে। বলাই বাহুল্য যে, দীক্ষা ও প্রতিপালন যদি অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর পরস্পর আদান-প্রদানের গভীর সম্পর্কের ভিত্তিতে সু-প্রতিষ্ঠিত না হয়, তা হবে অসাড় ও নিস্প্রাণ তরবিয়ত– যা কখনোই ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির কারো জন্যই কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

সমাজের বস্তুনিষ্ঠ পরিবর্তন, সার্বজনীন ও শাশ্বত কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তির সঠিক পরিচর্যা ব্যতীত কখনো কল্পনা করা যায় না। এই তরবিয়তই হচ্ছে সমাজ সংস্কারের মূল চালিকাশক্তি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ .(الرعد-11)

'আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।'[১]

সুতরাং ব্যক্তি বা সমাজের সুদূরপ্রসারী ও কার্যকর পরিবর্তন তরবিয়ত ব্যতিরেকে সুদূরপরাহত। ব্যক্তির সংস্কার হল সমাজ পরিবর্তনের মূখ্য ও প্রধান উপকরণ। অন্যান্য উপকরণের কার্যকারিতা এটার ওপর নির্ভরশীল।

তরবিয়ত এর আভিধানিক অর্থ :

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তরবিয়ত আরবী শব্দ, তা লিখিত রূপ হলো : التربية এ শব্দটি মৌলিকত্বের দিক দিয়ে তিন প্রকার :

এক. এর মূলধাতু (ر ب ب) থেকে আরবী ভাষাভাষীগণ বলে থাকেন-ربيته আমি তাকে সু-গঠিত করেছি। ربيته আমি তাকে তৈল মর্দন ও পরিপক্ক করেছি। ربها সে তাকে প্রবৃদ্ধি, পরিপূর্ণ ও পরিপক্ক করেছে। ربه يربه সে তার ব্যাপারে দায়িত্ব নিয়েছে, رباه تربية সে তার শৈশব পার হওয়া পর্যন্ত

[১]-সুরা আর-রা'দ : **১১**

সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করেছে এবং অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছে। أرب بالمكان সে তার গৃহ আঁকড়ে ধরে তার অভ্যন্তরে অবস্থান করছে ও সেখান থেকে বের হয় না।

দুই. এর মূলধাতু হতে পারে : (ر ب و) যেমন বলা হয়-

ربي الشي يربو ربوا বৃদ্ধি পেয়েছে, বেড়ে গেছে।

ربوت في بني আমি তাদের মধ্যে প্রতিপালিত ও বড় হয়েছি। ربيت فلانا أربيه تربية তাকে পানাহার করিয়েছি। আর তরবিয়ত শব্দের এসব অর্থ ব্যবহৃত হয় প্রতিটি ক্রমবর্ধনশীল বা বিকাশমান ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর ক্ষেত্রে। যেমন : সন্তান, ফসল প্রভৃতি।

তিন. এর মূল ধাতু হতে পারে : (ر ب ى) যেমন বলা হয় - أربي ربا وربيت ربيت ربيا رباء وربيا এর অর্থও আমি তাদের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছি।

মোদ্দাকথা তরবিয়ত এর আভিধানিক অর্থ ব্যক্তিকে প্রস্তুত করণ ও বিনির্মাণ এমনভাবে হতে হবে যা তাকে নিশ্চিত আত্মপ্রত্যয়ী ও অমুখাপেক্ষী হতে শেখায়। আর সমাজ তো ব্যক্তিরই অনুগামী।[২]

ইসলামী তরবিয়ত এর পারিভাষিক অর্থ : উল্লেখিত আভিধানিক অর্থ তো থাকছেই। উপরন্তু মুসলিম তরবিয়ত বিশারদগণ এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন ; ব্যক্তিকে তার বিশ্বাস, আরাধনা, চরিত্র, বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য এবং তার আচার ব্যবহার ও গতিবিধি তথা জীবনের প্রতিটি বাঁকে তাকে এমন একটি পুর্ণাঙ্গ পদ্ধতির ওপর নিয়ে আসা যা ইসলাম অনুমোদন করে।

তরবিয়ত শব্দের ব্যাখ্যায় মনীষীদের কয়েকটি মূল্যবান মতামত : আল্লামা ইসফাহানী রহ. বলেন, رب (রব) শব্দটির মূল হচ্ছে تربية (তারবিয়াহ) আর তা হল, কোন বস্তুকে পর্যায়ক্রমে পূর্নাঙ্গরূপ নিয়ে যাওয়া।

ইমাম বায়জাবী রহ.-ও অনুরূপ অর্থ করেছেন- 'কোন বস্তুকে ধীরে ধীরে পূর্ণতা দান করা।' বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, 'তরবিয়ত হচ্ছে কোন বস্তুর সংগঠন ও সংশোধনের দায়িত্বভার গ্রহণ।'

পবিত্র কুরআনে তরবিয়ত শব্দের ব্যবহার :

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য স্থানে এই শব্দটির মূল পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে তা হতে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হলো। মাতা-পিতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লার বাণী ঃ

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا(الأسراء-24)

'এবং বল, হে প্রতিপালক, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।'[৩]

১- লিসানুল আরব

[৩]. সুরা বনী ইসরাঈল : ২৪

ইবনে জরীর তাবারী রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আমার শৈশবে যেমনিভাবে তারা স্নেহ ও মায়া-মমতা দিয়ে আমাকে লালন-পালন করেছেন, যতক্ষণ না আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পেরেছি।'

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, আল্লাহ তাআ'লার উল্লেখিত বাণীতে বিশেষভাবে তরবিয়ত শব্দের উল্লেখ করার কারণ হল: তাকে লালন-পালন করতে মা-বাবাকে যে অসামান্য ক্লেশ ও গভীর স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করতে হয়েছে তা স্মরণ করে সন্তান যাতে তাদের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহ, অনুকম্পা ও মমতা প্রদর্শনে যত্নবান হয়।

আল্লাহ তাআ'লার বাণী- মুসা আ. এর ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে ফেরআউনের কথার উদ্ধৃতি দেন এভাবে –

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ. (الشعرآء-18)

'আমি কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি?'[৪]

ইবনে কাছির রহ. এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা এভাবে করেন- 'তুমি কি সেই ব্যক্তি নও? যে আমার বিছানায় আমার গৃহে থেকে আমাদের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছ ? এবং তোমার জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য বয়স সীমা পর্যন্ত আমি তোমার ওপর অনুগ্রহ করেছি ?'

তা'লিম ও তরবিয়ত শব্দদুটির বিশ্লেষণ :

ইলম বা জ্ঞান মূর্খ্যতা ও অজ্ঞতার বিপরীত। আর তা'লিম বা জ্ঞান বিতরণ হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধি অর্জন যা মূর্খ্যতা দূরীভূত করে। প্রকাশ থাকে যে, শুধুমাত্র ইলম কিংবা তা'লিম মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। বরং ইলম-জ্ঞানের ওপর যা আবর্তিত হয় সেটাই হলো চূড়ান্ত লক্ষ্য।

ইমাম শাতেবী রহ. বলেন, 'ইলম আহরণই করা হয় শুধুমাত্র আমলের জন্যে।' আবুদ্দারদা রা. কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলে উত্তরে তাকে বলেন, 'তুমি আমাকে যে বিষয়ে প্রশ্ন করলে তার ওপর নিজে আমল করো তো? তোমার বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআ'লার প্রমাণ বৃদ্ধি করে তুমি এ কি করছ ?'

হাসান রহ. বলেন, 'মানুষকে মূল্যায়ন করবে তার কথা নয়; কর্ম দিয়ে। অনন্তর আল্লাহ তাআ'লা এমন কোন কথা রাখেননি যার ওপর কাজকে প্রমাণ হিসেবে নির্ধারণ করে দেননি। যে কেউ ইচ্ছা করলেই তাকে সত্য অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে। কোন সুন্দর কথা শ্রবণ করলে প্রথমেই তার বক্তার দিকে লক্ষ করবে। যদি তার কথার সঙ্গে কাজের মিল পাও তাহলে কতই না সুন্দর।'

ইবনে মাসউদ রা. বলেন, 'সুন্দর করে কথা তো সকল মানুষই বলে। হ্যাঁ, তবে যার কথার সঙ্গে কাজের মিল আছে সেই তার উদ্দেশ্যে সফলকাম। পক্ষান্তরে যার কথার সঙ্গে কাজের মিল নেই সে তো নিজেকেই নিজে প্রতারিত করলো।'

শুধু ইলম অর্জন মূখ্য নয় এখানে এ বিষয়টা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হয়ে গেলো। শরিয়তের দৃষ্টিতে ইলম্ হলো আমলের বাহন। ইলমের ফজিলত ও তাৎপর্য সম্বলিত কুরআনের যত আয়াত ও হাদীস বিবৃত হয়েছে তা শুধু এই জন্য যে, বান্দা তদসংশ্লিষ্ট আমলে আদিষ্ট।

[৪].সুরা আশ্-শুআ'রা : ১৮

ইবনুল মুনকাদির রহ. বলেন, 'ইল্‌ম এসে আমলের দরজায় কড়া নাড়ে। সাড়া মিললে থাকে, না হয় চলে যায়।' ইমাম বুখারী র. বলেন,

العلم قبل القول والعمل

'ইলম হতে হবে কথা ও কর্মের পূর্বে।'

যে তরবিয়ত ইলম্ নির্ভর নয় তা কখনোই বিশুদ্ধ ও সঠিক তরবিয়ত হতে পারে না। সে কারণে পরিভাষায় ব্যবহারিক অর্থে তরবিয়ত ও তা'লিম- এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা দুরূহ ও কঠিন কাজ।

সুতরাং তরবিয়ত ও তা'লিম যদি এক সঙ্গে বাক্যের মধ্যে একই রীতি-পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়, তখন তরবিয়ত ইল্‌মের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট আমলের অর্থ নির্দেশ করবে। তখন তরবিয়ত এর অর্থ হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধি অর্জন ও জ্ঞানলব্ধ বিষয়ের বাস্তবায়ন। তবে তরবিয়ত ও তা'লিম শব্দদ্বয়কে ভিন ভিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করলে একে অন্যের অর্থ বহন করবে।

তরবিয়ত তার গ্রহিতার ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে, এমন কি সে শিক্ষার্থীকে এক রণাঙ্গন থেকে বিপরীতধর্মী রণাঙ্গনে নিয়ে যেতে পারে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأباه يهودانه أويمجسانه أوينصران كماتنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء.

'প্রতিটি নবজাতক তার স্বভাবজাত ধর্ম ইসলামের ওপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক হিসাবে গড়ে তোলে। যেমন কোন চতুষ্পদ জন্তু পরিপূর্ণ সন্তান জন্ম দেয়। তখন কি তোমরা তার কান-কাটা অবস্থায় দেখতে পাও।'[৫]

এ হাদীস থেকে অভিভাবকদের মন্দ ভূমিকার কুফল সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সাথে সাথে তার চাল-চলন, চরিত্র ও সমাজের বিশ্বাসের অনুকূল দায়িত্ব পালনে যত্নবান হওয়ার গুরুত্বও প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং একজন অভিভাবককে সঠিক ভিত্তির ওপর তৈরী করার কাজটা সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। বস্তুত আল্লাহর মেহেরবাণীতে প্রকৃত অভিভাবক তো সমাজের মেরুদণ্ড। যে ব্যক্তিকে সংগঠন ও বিনির্মাণে কার্যকর ও সফল ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

কাঙ্খিত অভিভাবক

আমি এই সংক্ষিপ্ত বইটিতে সঠিক ও **কাঙ্খিত** পদ্ধতিতে শিশুর যত্ন ও পরিচর্যার সুমহান দায়িত্বকে পালন করবেন সে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

গৃহে মা–বাবা, বিদ্যালয়ে শিক্ষকবৃন্দ এবং মসজিদের ইমাম প্রমূখ, এরা সকলেই কাংক্ষিত অভিভাবকদের অন্তর্ভুক্ত। তবে কতিপয় এমন অভিভাবক আছেন যাদেরকে হিসাব করা হয় না তারাও কিন্তু অভিভাবকের বাইরে নন। যেহেতু জাতিগঠন ও সমাজ বিনির্মাণে কখনো কখনো অনাকাংক্ষিত অভিভাবকদের থেকেও

[৫] . বুখারী : ১২৭০, মুসলিম : ৪৮০৩

বাস্তবে এমন বিরাট ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা এবং গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়- যা অনেক সময় কাংক্ষিত অভিভাবকদের ভূমিকাকেও ছাড়িয়ে যায়।

শিশু-সন্তানের বয়সভেদে অভিভাবক বিন্যাস

শিশুর বয়স স্তরের তারতম্যের কারণে অভিভাবকের ভূমিকার বিভিন্নতা সর্বজন স্বীকৃত। এক্ষেত্রে কিছু বিকল্প কর্মপন্থা শিশুর মননে প্রভাব বিস্তারে কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতে পারে।

ক- বাহিরের সমাজ-সংশ্রব ও বিদ্যালয় ভর্তি হওয়াপূর্ব বয়োঃস্তর বা নিরেট শৈশব :

তখন শিশুর প্রধান অভিভাবক হলো তার মা-বাবা। তাদের সহকারী হিসেবে থাকতে পারে ভাই-বোন এবং নিকট আত্মীয়– যাদের সঙ্গে তার নিয়মিত সাক্ষাত হয়।

খ- ভালোমন্দ নির্ণয় করার বয়োঃস্তর যখন সে বিদ্যালয় ভর্তি হবে :

তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক যেভাবে তার কাংক্ষিত অভিভাবক হিসেবে পরিগণিত হবে, বিদ্যালয়ের বন্ধুমহল, সহপাঠীবৃন্দ এবং তাকে পরিবেষ্টিত সমাজও গণ্য হবে সহকারী অভিভাবক হিসেবে। যেমন: প্রতিবেশী। যেহেতু একটি শিশু এই বয়সে তার প্রতিবেশী এবং বিদ্যালয়ের আসা যাওয়ার পথে যে সকল ছেলে-মেয়ের সঙ্গে দেখা হয় তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে ও সংশ্রব থেকে শিখতে আরম্ভ করে।

গ- মাধ্যমিক স্তর বা যখন সে ভালোমন্দ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে :

এ সময় তার প্রধান অভিভাবক হিসেবে পরিগণিত হবে মসজিদের ইমাম। যেভাবে তার চতুর্পাশ বেষ্টিত সমাজের সক্রিয় ভূমিকা সহকারী অভিভাবক হিসাবে শিক্ষার্থীর মনে প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি স্বীকৃত। এ ক্ষেত্রে আরো সহকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে প্রচার মাধ্যম, বন্ধুমহল, সভা-সেমিনার এবং বিবিধ জ্ঞানের মাধ্যম। যথা : বই, ক্যাসেট, গোলকধাঁধাঁ ও ইন্টারনেট ইত্যাদি।

এখানে একটা বিষয় নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, শিশু পরিচর্যার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ-এমন সহকারী অভিভাবকের একটা ধ্বংসাত্মক ও বিপদজনক ভূমিকা রয়েছে, যার দায়ভার কিন্তু আসল অভিভাবকদের ঘাড়ে গিয়ে পড়বে। শিশু প্রতিপালনের এ সকল সহায়ক উপকরণের ব্যবহার-পদ্ধতি ও তার সঠিক ব্যবহার, তা হতে শিক্ষা গ্রহণের সুন্দর ও সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। যাতে সে আহরিত জ্ঞান দ্বারা সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল লাভে সফল হতে পারে এবং অকল্যাণ ও ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে এমন বস্তু থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

প্রতিপালনের ক্ষেত্রসমূহ :

শুধুমাত্র দেহের নাম মানুষ নয়। বরং মানুষ আত্মা, হৃদপিণ্ড, বুদ্ধি ও দেহ এ সবের সমন্বয়ে গঠিত একটা সত্তার নাম। যার ওপর ভর করে আবর্তিত হয় আবেগ, অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা, বিশ্বাস ও পারস্পরিক সম্পর্ক। আচার-ব্যবহার ও চরিত্রের নিয়ন্ত্রণ, মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা ও অন্যের সংঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ধরন– এ সবই তার অন্তর্ভুক্ত।

নিচে সন্তান পরিচর্যার ক্ষেত্র বিন্যাস করা হলো :

দেহ পরিচর্যা : অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সংস্থান হতে হবে হালাল উপার্জন দ্বারা। সাথে সাথে যত্নবান হতে হবে সন্তানের স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও বিনোদনের প্রতি। এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে মা-বাবাকে।

ফকিহ্ সিরাজী রহ. শিশুর এই পরিচর্যার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'পশুর দুধে শিশুর পরিচর্যা তার স্বভাবকে ধ্বংস করে দেয়।'

ইমাম গাজ্জালী রহ. বিষয়টির প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেন, 'ধর্মানুরাগী এবং হালাল ভক্ষণকারী নয় এমন কোন মহিলাকে যেন শিশুর লালন-পালন ও দুগ্ধপানের জন্যে নিয়োগ দেওয়া না হয়। কারণ হারাম থেকে লব্ধদুধের মধ্যে কোন বরকত থাকে না। সুতরাং এর থেকে শিশুর যে শারীরিক বিকাশ-সেটা হবে দুষ্টমূল থেকে তার গঠন। তখন তার স্বভাব দুষ্টুমি ও অপবিত্র বিষয়ের দিকে ঝুঁকে পড়বে।' তিনি আরো বলেন, 'এবং দিনের কোন এক ভাগে তাকে হাঁটানো, নড়া-চড়া ও শরীর চর্চায় অভ্যস্ত করতে হবে, যাতে অলসতা কখনো তার ওপর ঝেঁকে বসতে না পারে।'

খ- হৃদপিণ্ড বা অন্তরের পরিচর্যা :

বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং সুদৃঢ় ঈমানের আলোকে অন্তরকে উদ্ভাসিত করা। ইমাম গাজ্জালী রহ. তার বক্তব্যে এই দিকেই ঈঙ্গিত করেন-শিশুদেরকে 'কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান আহরণ করাবেন। অধ্যয়ন করাবেন আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনী ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ঘটনাবলী। যাতে নেককারদের প্রতি ভালোবাসা তার অন্তরে অংকুরিত হয়ে থাকে।'

গ- আত্মার পরিচর্যা :

এটা অর্জিত হবে নান্দনিক চরিত্র ও ভালো আচরণের দিকে আহ্বান, শরিয়ত কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ও ইবাদতের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম গাজ্জালী রহ. বলেন, 'শিশু হচ্ছে মা-বাবার নিকট আল্লাহ প্রদত্ত একটি আমানত। তার পবিত্র আত্মা যে কোন ছবি ও অংকন থেকে মুক্ত, নির্মল ও উৎকৃষ্ট একটি রত্ন। সেখানে যা অংকিত হবে তাই সে গ্রহণ করতে সক্ষম। যে দিকে তাকে আকৃষ্ট করা হবে সে দিকেই সে ধাবমান হবে। সুতরাং যদি কল্যাণকর বিষয় বা শিষ্টাচার শিক্ষা ও এর ওপর তাকে অভ্যস্ত করা হয় ; তাহলে এভাবেই সে গড়ে উঠবে। সৌভাগ্য তার পদচুম্বন করবে ইহ ও পরলোকে। সে সফলতা ও পুরুস্কারে অংশীদার তার মা-বাবা এমনকি শিক্ষকবৃন্দও। পক্ষান্তরে যদি তাকে -আল্লাহ না করুন- চতুস্পদ জন্তুর মত ছেড়ে দিয়ে অকল্যাণ ও মন্দের ওপর অভ্যস্ত করা হয়, তাহলে সে হবে ব্যর্থমনোরথ ও হতভাগ্য। তখন এর দায়ভার সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবকদের কাঁধে গিয়ে পড়বে।

আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. (التحريم-6)

'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং পরিবার পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর....।'[৬]

একজন পিতা যখন তার সন্তানকে জাগতিক অগ্নি থেকে রক্ষা করতে সদা তৎপর থাকে, তখন পরকালের অগ্নি হতে তাকে রক্ষা করতে আরো বেশি সচেষ্ট ও তৎপর হওয়া দরকার। সচ্চরিত্র, শিষ্টাচার ও ভদ্রতা শিক্ষাদান এবং দুষ্ট সঙ্গ হতে নিবৃত করা- এসবের মাধ্যমেই প্রকৃত পক্ষে সন্তানকে অগ্নি হতে রক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। সন্তান পরিচর্যার উল্লেখিত ক্ষেত্রদ্বয়ে কর্তব্য পালনে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মসজিদের ইমাম ও মা-বাবা সকলে সমভাবে জড়িত।

গ- বুদ্ধির পরিচর্যা :

[৬] . সূরা আত-তাহরীম : ০৬

সঠিক স্বপ্ন, নির্ভুল পরিকল্পনা, চিন্তা-গবেষণা, প্রমাণ উপস্থাপনের পদ্ধতি, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রাথমিক ভূমিকা থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল বের করার পদ্ধতি, জ্ঞানগত দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা, গবেষণাধর্মী তৎপরতায় অংশগ্রহণ এবং পার্থিব উপকারী তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ।

প্রতিপালনের স্তর বিন্যাস

পার্থিব জীবনে মানুষের বয়োঃস্তর দু'টো বিস্তৃত অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথমত. অদৃশ্য ও স্বভাবজাত স্তর : তা হচ্ছে- মাতৃগর্ভে অবস্থানকালীন স্তর- শুক্রবিন্দু থেকে জমাটবাঁধা রক্ত, সেখান থেকে মাংসপিণ্ড অতঃপর অস্থিমজ্জা এবং তা গোস্ত দ্বারা আবৃত করণ, অত:পর একটি পূর্ণাঙ্গ ভ্রুণ এবং তার জন্ম গ্রহণ।

দ্বিতীয়ত. দৃশ্যমান স্তর : তা হলো জন্ম গ্রহণের পরের স্তর। এটাকেও আবার বড় দু'টি স্তরে বিভক্ত করা সম্ভব।

ক- শৈশব স্তর : জন্ম থেকে বয়োপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত সময়।

খ- বয়োপ্রাপ্তি স্তর : যার সূচনা বয়সের পূর্ণতা প্রাপ্তি থেকে, এবং সমাপ্তি ঘটে মানব মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। যাতে সে পারলৌকিক জীবনের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে, কবর যার প্রথম মনযিল।

শৈশব এবং বয়োপ্রাপ্তি এ দু'স্তরের মধ্যে আরো একটি প্রকরণ লক্ষ করা যায়। মূল কথা একজন মানুষের পরকালের দিকের এই দীর্ঘ ভ্রমণে তাকে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উপনীত হতে হয়। এবং প্রত্যেকটি স্ত রেই তাকে বিশেষ প্রস্তুতি ও পরিচর্যার মুখোমুখী হতে হয়। সে কারণেই মানব বয়সের অগ্রগতির ধারা প্রবাহের সঙ্গে প্রতিপালন ও পরিচর্যার স্তর বিন্যাস ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।

শৈশব স্তরকে আরো সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা নেহায়েত প্রয়োজন। যেহেতু শৈশব স্তরেরই অন্ত র্ভুক্ত এমন আরো দ'ুটি স্তর রয়েছে যার একটি অন্যটি থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। যে দু'টি স্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে শরিয়তের অসংখ্য বিধান। আর এ জন্যেই শিশু পরিচর্যার স্তর বিন্যাসের মূল আলোচনা তিন ভাগে বিভক্ত।

ক- ভালোমন্দ পার্থক্য নির্ণয়-অযোগ্য শৈশবকাল : এটা সাধারণত জন্মের পর থেকে সাত বছর পূর্ণ হওয়া বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

খ- ভালোমন্দ পার্থক্য নির্ণয়যোগ্য শৈশবকাল : এটা সাধারণত সাত বছর থেকে বয়োপ্রাপ্তি অথবা পনের বছরের পূর্ব পর্যন্ত। প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত প্রথম এবং মধ্যম স্তরও এই স্তরেরেই অন্তর্ভুক্ত।

গ- বয়সের পূর্ণতাপ্রাপ্তি কাল : সেটা হল পুরুষ বা নারীত্বের চিহ্নসমূহ প্রকাশ ও শরিয়তের আদেশ ও নিষেধ বাধ্যতামূলক হওয়ার স্তর। এর সূচনা হয় বয়োপ্রাপ্তি হওয়ার জ্ঞাত নিদর্শনসমুহ প্রকাশ অথবা পনের বছরে উপনীত হওয়ার পর।

এ বয়স উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের বিপরীত। আলোচ্য প্রকারটি কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। যেখানে ভালোমন্দ নির্ণয় করতে পারে না এমন শৈশবকেই বুঝানো হয়েছে।

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء .(النور-31)

‘সেই বালক, যারা নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ....।’[৭] আয়াতখানা অবতীর্ণ হয়েছে মহিলাদের সৌন্দর্য্য অবলোকন ও প্রবেশাধিকার যাদের জন্য স্বীকৃত তাদের সম্পর্কে।

ইবনে কাসির রহ. বলেন, ‘তারা নেহায়েত ছোট বলে মহিলাদের অবস্থা, তাদের গোপনাঙ্গ, কোমল বাক্যালাপ, মৃদু পদচালনা এবং মেয়েলী আচার-আচরণ কিছুই বুঝতে পারে না। একটি শিশু খুব ছোট হওয়ার দরুণ যেহেতু কিছুই অনুভব করতে পারে না তাই মহিলাদের নিকট প্রবেশ করতে তার কোন বাধা নেই। পক্ষান্তরে সে যখন সাবালক বা এর নিকটবর্তী বয়সে উপণীত হবে, মহিলাদের মেয়ে-সুলভ আচার-আচরণ বুঝতে ও অনুভব করতে এবং সুন্দরী ও অসুন্দরির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে শিখবে তখন কোন অবস্থাতেই মহিলাদের নিকট তার প্রবেশাধিকার গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম বগভী রহ. মুজাহিদ রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেন- ‘ছোট হওয়ার দরুণ অন্যের গোপনীয় অঙ্গ সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল নয়।’

আবু বকর আল-জাস্‌সাস রহ. বলেন, ‘মুজাহিদ রহ. এর বক্তব্য একেবারে সুস্পষ্ট। যেহেতু আয়াতের অর্থই হচ্ছে- তারা অতিশয় ছোট্ট হওয়া ও জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে মেয়েলী আচরণ ও নারী-পুরুষের গোপনাঙ্গের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। তবে যে সব শিশু মেয়েদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাদেরকে মহিলাদের নিকট প্রবেশের ক্ষেত্রে তিন সময় অনুমতি গ্রহণ আল্লাহ তাআলা বিধি-বদ্ধ করে দিয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُم

(النور-58)

‘হে মুমিনগণ, তোমাদের দাস দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের নামাজের পুর্বে, দুপুরে যখন তোমরা পোশাক খুলে রাখ এবং এশার নামাজের পর।’[৮]

অন্য স্থানে আল্লাহ পাক প্রাপ্তবয়স্কদের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন -

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ.

(النور-59)

‘তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়োঃপ্রাপ্ত হয়, তারা যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি চায়।’[৯]

উপরোক্ত বয়োঃস্তরের বিন্যাস বাস্তবসম্মত ও সুপ্রমাণিত। অবিকল এই প্রকরণের কথাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

---

[৭]- সুরা আন-নুর : ৩১

[৮]-সুরা অন-নুর-৫৮

[৯]-আন-নুর-৫৯

علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر

'সাত বছর হলে সন্তানকে তোমরা নামাজের প্রশিক্ষণ দাও। এবং নামাজের জন্য প্রহার কর, যখন তার বয়স দশ বছরে উপনীত হয়!'[১০]

এই হাদীস থেকেও আমরা বুঝতে পারলাম যে, সাত বছরের নীচের বয়োঃস্তর ভালো-মন্দ নির্ণয়ের বয়স নয়। তবে পূর্ণ সাত বছর বা তার পরবর্তী বয়োঃস্তর অবশ্যই ভালোমন্দ নির্ণায়ক বয়স। এখানে উল্লেখিত স্তরসমূহে বর্ণিত বয়সসীমাই একান্ত এবং চূড়ান্ত সীমা নয়। কারণ ব্যক্তি ও পরিবেশের বিভিন্নতা ভেদে এটা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে হাদীসের দিক-নির্দেশনা সাধারণভাবে ও অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেটা সাধারণত ভালো-মন্দ অনির্ণায়ক বয়োঃস্তর তথা সাত বছরের নীচের বয়স। সাত বছর ও তার উপরের বয়স ভালো-মন্দ নির্ণায়ক বয়োঃস্তর। যখন একটি শিশুর বয়স এর চেয়েও বেশি হবে তখন সে আরো বেশী ভালোমন্দ নির্ণয় করতে পারবে। এমন কি তাকে নির্দেশ প্রদান ও নিষেধ করা হবে। তিরস্কার কিংবা শাস্তি পর্যন্ত দেয়া হবে যদি এর বিরুদ্ধাচরণ করে। এভাবে তার বয়োঃপ্রপ্তি পর্যন্ত চলতে থাকবে। বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে গেলে তো দস্তুরমত তার আমলনামা লিপিবদ্ধ হতে থাকবে।

প্রতিপালনের সার্বজনীন উদ্দেশ্য :

গোত্র ও জাতিসমূহ থেকে কতিপয় মানব ইউনিট নিয়ে গঠিত হয় একটি সমাজ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন -

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (الحجرات-13)

'এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও!'[১১]

এই একতা বিনির্মাণের ক্ষুদ্রতম ও সর্বপ্রথম শৃংখলাবদ্ধ ইউনিট হলো 'পরিবার'। যা মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে তথা সন্তান-সন্ততি নিয়ে গঠিত। এটা এমন ব্যক্তিগোষ্টির সমষ্টি যাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় ও অটুট বন্ধনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যক্তিসমূহের তথা একটি পরিবারের উৎকৃষ্ট ও উত্তম পরিচর্যার মাধ্যমে সমাজের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। সমাজের সভ্যতা-সংস্কৃতি অনুধাবন করতে সক্ষম ব্যক্তিকে সমাজের একটি যোগ্য অঙ্গ হিসেবে প্রস্তুত করতে হবে। এখান থেকে আমরা এ সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, সভ্যতা-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়ে যে হবে সমাজের জন্য আদর্শ।

বাস্তব কর্ম, চিন্তা ও গবেষণায় ভারসাম্য আনয়নের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে থাকবে সদা নিবেদিতপ্রাণ। এটাই হলো সার্বজনীন তরবিয়তের এর মূল লক্ষ্য।

ইসলামী সমাজের জন্য সার্বজনীন তরবিয়ত এর লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে প্রস্তুত করতে হবে ইসলামী সুউচ্চ ইমারতের একটি ইট হিসেবে– যিনি ইসলামের হাকিকত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও তার বাস্তব অনুশীলন, সমাজ উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং বিশ্ববাসীর কাছে আল্লাহর দীন পৌঁছানোর ব্রতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন। যাতে আল্লাহ প্রদত্ত সকল যোগ্যতা ও সর্বশক্তি ব্যয় করে তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সে বাস্তবায়িত করতে পারে।

বিশুদ্ধ প্রতিপালনের দাবী :

---

[১০]-সহিহ্ ইবনে খুযাইমাহ-২/১০২

[১১] -আর-হুজরাত-**১৩**

তরবিয়ত একটি চারিত্রিক কর্মতৎপরতা, শিষ্টাচারগত বাধ্যকতা ও দায়িত্ব। যা আদায় করবেন শিশুর পিতা বা অভিভাবক। অথবা তাদের নিযুক্ত কোন প্রতিনিধি। প্রয়োজন হলে সকলে মিলে পালন করতে পারেন শিশু পরিচর্যার এ মহান দায়িত্ব।

বয়োঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত সন্তানের লালন-পালন, তাদের যত্ন ও পরিচর্যা, শিষ্টাচার শিক্ষাদানের দায়িত্ব স্বাভবিকভাবে মা-বাবা ও অভিভাবকদের ওপর বর্তায়। এ মর্মে শরিয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التحريم-6)

'তোমরা নিজেদের এবং আপন পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর!.......।'[১২]

সাহাবী কাতাদাহ রা. বলেন, 'অভিভাবক তাদের রক্ষা করবে, তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ করবে, তার নাফরমানী থেকে নিবৃত করবে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব নিবে, আল্লাহর আদেশ পালনের নির্দেশ প্রদান ও তাতে সহযোগিতা করবে। যখনই আল্লাহর কোন নাফরমানী গোচরে আসবে তাদেরকে তা হতে ফিরিয়ে রাখবে।'[১৩]

ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখ আর তাদেরকে অযথা কাজে ছেড়ে দিও না। তাহলে কিয়ামত দিবসে অগ্নি তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে।'[১৪]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন -

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

'তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে।'[১৫]

এ হাদীসের দাবী মতে- 'একজন ব্যক্তি হবে তার পরিবারে দায়িত্বশীল কর্তা ও তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এমনিভাবে একজন মহিলা তার স্বামীর গৃহে দায়িত্বশীলা গৃহিণী এবং তাকেও নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতএব প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং তোমাদের সকলকেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'[১৬]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

علموالصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربواعليها ابن عشر

'সন্তানের বয়স সাত বছর হলে নামাজ শিক্ষা দাও! ও বয়স দশ বছর হলে নামাজের জন্য তাকে প্রহার কর।'

---

[১২] -আত্-তাহরীম-৬

[১৩] তাফসীরে ইবনে যারীর-১৫৩/১২

[১৪] তাফসীরে ইবনে কাছির-১৬৯/৩

[১৫] মুত্তাফাক্ব আলাইহ্ , বুখারী-৮৪৪,মুসলিম-৩৪০৮

[১৬] মুত্তাফক্ব আলাইহি

এখানে নির্দেশমূলক পদবাচ্যটি আবশ্যিক অর্থে ব্যবহৃত।[১৭] এ প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসের আরো অনেক উদ্ধৃতি রয়েছে। সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজনে এখানে তা পরিহার করা হল।

সারকথা হলো, তরবিয়ত একজন মানুষকে ধর্মীয় জ্ঞান ও তদানুযায়ী আমলে সমৃদ্ধ করত তাকে বেঁধে রাখে ধর্মের আদেশ-নিষেধের সঙ্গে। সাথে সাথে জাগতিক জীবনে নিজ কর্তব্য পালনে তাকে যোগ্য ও সচেতন করে তোলে। যাতে সে কারো মুখাপেক্ষী বা অন্যের ওপর বোঝা হয়ে না থাকতে পারে। আর একটি শিশুকে (সন্তান) এভাবে গড়ে তোলার এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটা হলো অভিভাবকের।

প্রথম পরিচ্ছেদ : ভালো-মন্দ নির্ণয় করতে পারে না এমন শৈশব কাল :

অধ্যায়-১: বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি

অধ্যায়-২: সমস্যা ও অন্তরায়সমূহ

অধ্যায়-৩: পদ্ধতি ও উপকরণসমূহ

অধ্যায়-৪: পুরস্কার ও শাস্তি

অধ্যায়-৫: নির্দেশনা ও উপদেশাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ : অবুঝ শৈশবকাল

সাধারণত এটা একটি শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তিপূর্ব বয়োয়ঃস্তর। এটা শিশুর জন্মের পর থেকে পাঁচ/ছয় বছর বয়স পর্যন্ত প্রলম্বিত হতে পারে। তবে অবশ্যই তা সাত বছরের বেশি হতে পারবে না। এ বয়স স্তরটা মানবজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। যেহেতু পরবর্তী

বয়োঃস্তরের জন্য এটা হচ্ছে ভিত্তি স্তম্ভ, এর ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়াতে শিখবে জীবনের অনুজ স্তরসমুহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাণীতে এর সুস্পষ্ট বর্ণনা করেছেন-

كل مولود يولد عليالفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأباه يهودانه أوينصرانه.

'প্রতিটি নবজাতক স্বভাবজাত ধর্ম ইসলামের ওপর ভূমিষ্ট হয় ও তার কথা ফোটা পর্যন্ত এ অবস্থার ওপর সে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অতঃপর তার মা-বাবা তাকে ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান বানায়।'[১৮]

যখন সে কথা বলতে ও মনের ভাব ব্যক্ত করতে শেখে, তখন তার মা-বাবা তাকে নিজেদের ধর্মে দাখিল করে ফেলে যদি তারা অমুসলিম হয়। এখান থেকেই বয়সের এই স্তরের গুরুত্ব, এবং কিভাবে তাকে প্রতিপালন, বিকাশ ও প্রস্তুত করণের মধ্য দিয়ে একটি ছোট্ট শিশুর ওপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব তা

[১৭] সহিহ ইবনে খুজাইমাহ

১ মুসরিম শিশু সংকৃতি-৫৭-৬৩

স্পষ্ট হয়ে যায়। এমনিভাবে একটি শিশুর পিতা তাকে যে বিষয়ে অভ্যস্ত করবে তার ওপরই সে গড়ে উঠবে।

শৈশব অধ্যায়টা যেহেতু একজন মানুষের বয়স পনের কিংবা তার চেয়ে বেশি সময় পর্যন্ত প্রলম্বিত, সে কারণে এই শৈশব স্তরের গুরুত্বও অপরিসীম। শিশুর বিকাশ ও বেড়ে ওঠা অনুযায়ী এখানে তাকে বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার প্রয়োজন, যাতে সে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি ও দিকনির্দেশনা গ্রহণে সক্ষম হয়।

মানব বয়সের প্রাথমিক বছরগুলোতে তরবিয়ত তথা প্রতিপালন ও পরিচর্যার তাৎপর্যের ওপর আধুনিক বিজ্ঞান দিয়েছে সবিশেষ গুরুত্ব। সেহেতু ব্যক্তিত্বের বিকাশ চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সর্বোপরি তার জীবনের লক্ষ্য বিনির্মাণে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ এ সময় সে পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ করতে পারে যা তার জীবনের প্রতিটি বাঁকে সঠিক বিকাশে সহায়তা করবে।[১৯]

প্রথম অধ্যায়

বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি

পরবর্তী বয়োঃস্তরের তুলনায় শিশুর বয়সের এই অধ্যায়ের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও নান্দনিক গুণাবলি রয়েছে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি তাৎপর্যপূর্ণ গুণগুলো নিম্নরূপ –

১- প্রতিপালনের দিকটা অধিকাংশ সময় এককভাবে প্রতিপাদ্য :

এখানে প্রতিপালন ও পরিচর্যা মৌলিকভাবে মা-বাবার ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু একটি শিশুর বেড়ে উঠা, আহার্য যোগান, তার জ্ঞান ও অনূভূতির বিকাশ এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তার আচার-আচরণ ও পদক্ষেপ সংরক্ষণে তারা উভয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন। এ সময় অন্যান্য বয়োঃস্তরের তুলনায় শিশুর প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বহিরাগত মানুষের প্রভাব খুবই নগণ্য। কাজেই প্রতিটি মা-বাবার জন্য তাদের সন্তানকে এককভাবে পরিচর্যা ও প্রতিপালনের বিশাল ও পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে এ সময়ে। সুতরাং এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা তাদের একান্ত কর্তব্য। কারণ সুযোগ বার বার আসে না। এ সময়টা মা-বাবার জন্য সবচেয়ে উপযোগী ও অনুকূল বয়স। কারণ, এখানে তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বহিরাগত কোন প্রকার ঝামেলা ও কু-প্রভাব অনুপ্রবেশ ব্যতিরেকে আপন সন্তানকে প্রতিপালন করতে পারে অনায়াসে। পক্ষান্তরে এতবড় সুযোগ পেয়েও যদি পিতা-মাতা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করে ও নিজের শিশু-সন্তানের প্রতিপালনের দায়িত্বটা ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, গৃহপরিচারিকা, গাড়ির চালক অথবা চরিত্র বিধ্বংসী প্রচার মাধ্যমের ওপর ছেড়ে দেয়। তাহলে এর অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ পরিণতি সহজেই অনুমেয়।

২- মা-বাবার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক :

মা-বাবার সঙ্গে একটি শিশুর নিবিড় সম্পর্ক থাকে। কারণ, তারা হলো সন্তানের নিকট নিরাপদ আশ্রয়, শক্তির উৎস এবং বিশুদ্ধতার প্রতীক। অতএব একটি শিশু কখনো কোন বিপদের আশঙ্কা করলে তার মা-বাবার নিকট আশ্রয় নেয়। সে বিশ্বাস করে, যে কোন কাজ সম্পাদন করার শক্তি ও সামর্থ্য তাদের রয়েছে। তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত, তাদের কথা ও কর্মসমূহ বিশুদ্ধতার মাপকাঠি। সুতরাং মা-বাবার, বিশেষ করে বাবার কখনোই কঠিন মুহূর্তে কোন ভয় কিংবা দুর্বলতা প্রকাশ করা উচিত নয়। যেমনিভাবে কোন

[১৯] উসুলুত-তারবিয়াহ-৬৫

পদক্ষেপ গ্রহণে তার বিস্ময় ও ইতস্ততা করা উচিত নয়। কারণ, এগুলো শিশুর ব্যক্তিত্বে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এ পর্যায়ে মা-বাবা তাদের ইচ্ছানুযায়ী একটি শিশুকে সুন্দর আচার-ব্যবহারে সুশোভিত করে গড়ে তুলতে প্রয়াস পাবেন। বাসস্থান, বস্ত্র ও পানাহরের প্রাচুর্য্য অথবা হৃদয়, আত্মা ও বুদ্ধিকে উপেক্ষা করে শুধু স্বাস্থ্য, শরীর ও পরিচ্ছন্নতার মধ্যে তাদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। কারণ, পর্যাপ্ত পানীয় ও আহার্য যোগানের দায়িত্ব সংক্ষিপ্তভাবে সমস্ত সৃষ্টিই করে থাকে। সমগ্র সৃষ্টিকুলের ওপর মানবজাতির স্বাতন্ত্র ও অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত।

৩- আনুগত্য ও অনুসরণ :

একটি শিশু তার বয়সের এ স্তরে এসে মা-বাবার আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে সবচেয়ে বেশি। তবে প্রত্যেকেই তার লিঙ্গ ও জাতের আনুকূল্য বজায় রাখে। সুতরাং স্বভাবত ছেলেকে তার বাবার ও মেয়েকে তার মায়ের আনুগত্য করতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই বয়সে একটি শিশু-সন্তানের জন্যে তার মা-বাবার সঙ্গে গভীর সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ বিষয়ে গভীর মনোযোগ প্রদান শিশুর প্রতিপালন ও তার নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ভালো কাজ- যার পেছনে কোন বিপদাশঙ্কা নেই তাতে আনুগত্য করায় শিশুর প্রতি কোন নিষেধাজ্ঞাও নেই। এমন কি শিশু নিজে সেটাকে ভালো মনে না করলেও। একটি অবুঝ শিশু যখন তার মাকে ঘরের মধ্যে নামাজ পড়তে দেখে, তখন সে তার অনুকরণ করেতে চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে তাকে বারণ করা অনুচিত, যদিও এতে তার নামাজের একাগ্রতা বিঘ্নিত হয়ে থাকে অথবা সে এমন কিছু করে ফেলে যা উচিত নয়। বস্তুতঃ এসব করতে ছেড়ে দেয়াই তাকে নামাজে অভ্যস্ত করার অন্যতম উপায়। উপরন্তু সম্ভব হলে তার জন্য একটি ছোট্ট জায়নামাজের ব্যবস্থা করা উত্তম। যাতে নামাজের সময় হলে সে তার মায়ের সঙ্গে নামাজ পড়তে ও নামাজে তার অনুকরণ করতে প্রাণিত হয়।

এমনিভাবে মা-বাবা বা যে কোন একজনের পক্ষ থেকেও মন্দ কাজ অথবা নিন্দিত আচরণ শিশুর সম্মুখে প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়। মা-বাবা যে কোন একজনের যদি এ জাতীয় কর্মের অভ্যাস থেকে থাকে। যেমন : ধূমপান করা, তাহলে তাৎক্ষণিক আল্লাহ তা'আলার নিকট তওবা করা এবং কোন অবস্থাতেই যেন শিশুটি তার এ কাজ দেখতে না পায় সে ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যেমন : বিপদজনক কার্যসমূহ; যদিও তা কোন ত্রুটিযুক্ত বা নিষিদ্ধ কাজ নয়, তদুপরি তা একটি শিশুর সম্মুখে করা অনুচিত। কারণ মা-বাবা ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর নির্জনে সে তাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করে থাকে। অথচ সে তো এই মুহূর্তেই তার নিরাপদ ব্যবহার-বিধি উত্তমরূপে জেনে নিতে সক্ষম হয়নি। যথা- চুলা ধরানো। পক্ষান্তরে নান্দনিক ও উত্তম আচরণসমূহ শিশুর সম্মুখে বেশি বেশি প্রকাশ করা দরকার। যথা- মা-বাবাকে সম্মান করা, মানবিক প্রয়োজনে যে স্থানটা অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায় তা পরিষ্কার করা, গৃহস্থালীর মালামাল পরিষ্কার করা অথবা তার নির্দ্ধারিত স্থানে সেটা রেখে দেওয়া, খাবার গ্রহণের পূর্বে ময়লাযুক্ত হাত পরিষ্কার করা কিংবা খাবারের পূর্বে বিসমিল্লাহ এবং খাবারের শেষে আলহামদু লিল্লাহ পাঠ করা ইত্যাদি।

শিশুর এ বয়োঃস্তরে ভাষাগত দিক থেকে শিশুর বিকাশ সাধনে অভিভাবকের যত্নবান হওয়া উচিত। যা আকর্ষণীয় ঘটনাবলী ও উদ্দীপক গল্পসম্ভার হলেও হতে পারে। যেগুলো একটি শিশু পরম আগ্রহভরে চুপ করে শুনতে থাকে। অতঃপর আশা করা যেতে পারে ; অভিভাবক যে ভূমিকাটা পালন করলেন শিশু নিজেও সে দায়িত্বটা পালন করবে এবং তা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এভাবে কথা বলার ধারাবাহিকতায় ক্রমান্বয়ে সে অগ্রসর হতে থাকবে।

এ সময় শিশুকে ‘করো’ এবং ‘করিও না’ কিংবা আদেশ-নিষেধের পদ্ধতির ওপর তৃপ্ত না থেকে বরং ‘নিজেই আদর্শ’ এই পদ্ধতিতে শিশু প্রতিপালন করা অধিকতর শ্রেয়। কারণ মডেল বা আদর্শ তার মননে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। বাধ্য-বাধকতা ও বিধি-বিধান -যা একটু কষ্টসাধ্য মনে করলে ছেড়ে দেবে- আরোপের চেয়ে অনুকরণের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।

আমরা অনেক সময় লক্ষ করি, কন্যা শিশু মাকে দেখে তার অনুকরণ করতে অভ্যস্ত। মা খাবারের পর রান্নাঘরে থালা-বাসন পরিষ্কার করতে ব্যস্ত ; তখন দেখি শিশুটিও অনাহুত ভাবেই রান্নাঘরে গিয়ে থালা-বাসন ধৌত করতে উদ্যত হয়।

উল্লেখ্য যে, শিশুর অনুসরণের একটি নেতিবাচক ও বিপদজনক দিকও আছে। বিশেষত শিশু টেলিভিশনের পর্দায় যা দেখে তাৎক্ষণিকভাবে তার অনুশীলনের দিকে সে ঝুঁকে পড়ে।

শিশুদের জন্য নির্মিত বাজে ফিল্ম দেখলে তখন বিপদটা প্রকট হয়ে উঠে। যেখানে সে দেখতে পায় মানুষ বাতাসে উড়ছে। তখন এটার অনুশীলন করতে গিয়ে তো নিজেকে নির্ঘাত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে। এমনিভাবে কোন কোন দৃশ্যের ভয়াবহতা, নারী-পুরুষ সম্পর্কের কু-রুচিপূর্ণ ও অবাঞ্ছিত আচরণ তো রয়েছেই। যা দেখে সে তার সমবয়সী বোনের সঙ্গে বা ভাইয়ের সাথে অনুরূপ আচরণ করতে প্রয়াস পাবে। অথচ এর ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে একজন অভিভাবকের পূর্ব থেকেই খুব সতর্ক থাকতে হবে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য অবসর কিংবা কিছুটা সময় বিশ্রামের প্রতি তাকে উৎসাহিত করতে হবে। সাথে সাথে টিভির পর্দায় দৃশ্যমান অনুষ্ঠানমালা দেখার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণও গ্রহণ করতে হবে। এ আশায় যে, এক পর্যায় এর প্রতি নিরুৎসাহিত হয়ে টিভি দেখার প্রতি আকর্ষণ শেষ হয়ে যাবে।

৪- অনুধাবনযোগ্য বিষয়ের ওপর অধিক নির্ভরশীলতা :

একটি শিশু এ বয়সে শুধুমাত্র বাস্তব এবং উপলব্ধিযোগ্য বস্তুর ওপর বেশি নির্ভর করে থাকে। নিছক কথামালা এবং পরোক্ষ ও অদৃশ্য বিষয়ে কোন আগ্রহ সে দেখাতে চায় না। যেহেতু পরোক্ষ বিষয়ে ইতিপূর্বে তার স্মৃতিতে কোন বাস্তব নমুনা অথবা তদসংশ্লিষ্ট কোন কার্যকর অভিজ্ঞতা তার নেই। সুতরাং একটি শিশুর এই বয়োঃস্তরে যদি তার অভিভাবক বলে, ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি’ তাহলে এটা তার কাছে কোন অর্থবহ বিষয় হবে না। যতক্ষণ না সে তাকে নিজের বুকে টানবে, কোলে নিবে , চুমো খাবে ও তার পছন্দসই কোন কিছু তাকে দিবে অথবা কোন আবদার করলে সেটা পূরণ করবে। তখন সে পূর্বাপেক্ষা অধিক তীব্রভাবে অনুভব করবে যে, সত্যিকার অর্থেই তার অভিভাবক তাকে ভালোবাসে।

কখনোবা একটি শিশু আগুনের লেলিহান শিখা অবলোকন করে আগুনের রং ও প্রজ্জ্বলন ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হয়ে যায়। আগুন স্পর্শ করার ভয়াবহ পরিণাম ও ক্ষতির ব্যাপারে আলোচনা করলে সে কথায় সে কর্ণপাত করে না অথবা তার বোধগম্য হয় না। যতক্ষণ না সে নিজের হাতে তা স্পর্শ করে নেয় ও আগুনের তাপ আস্বাদন করে। অতঃপর তার এমন অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়ে যাবে যা বলে দিবে এরপর আগুনের সঙ্গে তার কিরূপ আচরণ করতে হবে।

৫- পরিবেশ পরিচিতি ও কৌতূহলপ্রবণতা :

একটি শিশুর এ বয়োঃস্তরে এক দিকে গবেষণা ও শব্দভাণ্ডার অন্যদিকে বাস্তব অভিজ্ঞতা– এ দু’য়ের যোগসূত্র আবিষ্কারে অসামর্থতা ও দুর্বলতার দরুণ তার চতুর্পার্শে অবস্থিত মৌলিক বস্তুসমূহ সম্পর্কে সে বেশ প্রশ্ন করে থাকে। কারণ তার কাছে এটাই একটা অপরিচিত পৃথিবী। তার এ কৌতূহল ও প্রশ্ন করার আগ্রহটা প্রকৃতপক্ষে তার প্রচ্ছন্ন বুদ্ধিমত্তা ও বেঁচে থাকার পরিচায়ক। এ ক্ষেত্রে একজন অভিভাবকের

অবশ্য কর্তব্য হলো, এটাকে একটা সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে তাকে পর্যাপ্ত তথ্য সম্পর্কে জ্ঞাত করে তোলা। তবে প্রশ্নাধিক্যের কারণে তাকে মন্দ বলা বা কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করা যাবে না। বরং প্রতিটি প্রশ্নের স্পষ্ট অথচ সংক্ষিপ্ত ও স্মৃতিসহজ উত্তর দানে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। শিশুর পরিবেশ থেকে তথ্যসমৃদ্ধ হওয়া, গবেষণা ও শব্দের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধনের এটা এক পরিক্ষিত উপায়। এতে এক দিকে যেমন তার ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে অন্য দিকে বিশুদ্ধ অর্থবোধক বাক্য গঠনেও সে সক্ষম হয়ে উঠবে। সুতরাং একজন অভিভাবকের যথাসাধ্য সঠিক উত্তর দানে সচেষ্ট হওয়া উচিত। শিশুর প্রশ্নের যেনতেন উত্তর দিয়ে দায়সাড়া কর্তব্য সম্পাদন ঠিক নয়।

শিশুর এ বয়োঃস্তরে একজন অভিভাবকের উচিত শিশুকে পৃথকী ও বিন্যস্ত করণ উপযোগী খেলারসামগ্রী কিনে দিবে যাতে সে তা পৃথক করার পর পুনর্বিন্যাস করে তা পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ফলে তাতে সে মনের আনন্দ পাবে ও হাতের মাংস পেশীর অনুশীলন বা ব্যায়াম হবে। সাথে সাথে একটি খেলার সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও পরিচিতি লাভ হবে।

৬- তালকীন বা দীক্ষা :

একটি শিশুকে তার এ বয়োঃস্তরে মৌলিক জ্ঞান শিখানো সহজ। কারণ তাকে যা শিক্ষা দেয়া হবে তা-ই সে স্মরণ রাখতে পারবে। আর যখন কোন বিদ্যা উত্তমরূপে শিখানো হবে সেটা তার মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়ে থাকবে। বহুকাল অতিক্রম হলেও তা আর সে ভুলতে পারবে না। বিশেষত সে বিষয়টি অন্যটার সঙ্গে পুনরাবৃত্তির সময়। অতএব এ সময় শিশুকে কুরআনুল কারীম পাঠ দানের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া উচিত। ছোট সূরাগুলো হেফ্জ করার মাধ্যমে সূচনা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আধুনিক উপকরণের সাহায্য নেয়া যায়। যেমন : ক্যাসেট ও কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে। এ সময় শিশুকে আকীদা-বিশ্বাস, দোয়া ও আদাব বিষয়ক অনতিদীর্ঘ হাদীসগুলোও শিক্ষা দিতে হবে।

সমাজে এমন অনেক পরিবার দেখা যায়, যারা লেখা পড়া অথবা অন্য কোন বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিশুকে একেবারে ছোট্টবয়সে তথাকথিত কিন্ডারগার্টেনে নিয়ে যায়। যদিও এক্ষেত্রে দু-একটা উপকারিতা যে কখনো পরিলক্ষিত হয় না; তা নয়। তবে এখানে ক্ষতির পরিমাণটা এত বড় যে, উপকারিতার সাথে তার কোন তুলনা চলে না। কারণ এতে একটি শিশুকে তার ভিত্তিমূল প্রতিপালন আলয় থেকে টেনে আনা হয়। ফলশ্রুতিতে শিশু একেবারে অল্প বয়সে সাধারত ৩ বছর বয়সে তার স্বভাবজাত প্রকৃতি, মা ও তার স্নেহসুলভ পরিচর্যা থেকে দূরে সরে যায়। তখন শিশুর পরিচর্যা নিজ গৃহে পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বহিরাগত প্রভাব তার পরিচর্যার ক্ষেত্রে ত্বরান্বিত হয়। ফলশ্রুতিতে কিন্ডারগার্টেনের পরিবেশ এবং গৃহে শিশুর প্রতিপালনের মধ্যে একটা সাংঘর্ষিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিশেষত পাশ্চাত্য শিক্ষার দূষিত বায়ু প্রবাহের পর। যদ্বারা এমন অপসংস্কৃতির সয়লাব ও সামাজিক অবক্ষয়ের প্রসার ঘটে- যা অনেক দিক থেকে বিশেষ করে শিক্ষা কারিকুলামের দিক থেকে আমাদের ইসলামী সমাজের বিরোধী। তবে কখনো বা নেহায়েত প্রয়োজনে পরিস্থিতির শিকার হয়ে একটি পরিবার বাধ্য হয়ে এমনটি করে থাকে। যেমন :মা ঘরের বাইরে চাকুরী করেন। সাংসারিক প্রয়োজন মেটাতে হলে তার এছাড়া অন্য কোন উপায়ও নেই। এহেন পরিস্থিতে অভিভাবকের কর্তব্য হবে, এমন একটি কিন্ডারগার্টেন খুঁজে নেওয়া যেখানে থাকবে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তার আশা-আকাংক্ষার বাস্তব প্রতিফলন। যদিও সে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষাগত মান সর্বোচ্চ পর্যায়ের বা উঁচু মানের না-ও হয়। এ অবস্থায়ও শিক্ষাগত দিকটাকে প্রতিপালনের বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেয়া উচিত হবে না।

৭- চঞ্চলতা ও জীবনী শক্তির বিকাশ :

শিশুর মধ্যে একটি প্রগলভ ও চঞ্চল মন রয়েছে। সে যতক্ষণ সজাগ থাকে সারাটা সময় জুড়ে চঞ্চলমুখর থাকে। এটা তার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতার আলামত। একটি শিশুর এই চঞ্চলমুখর শক্তিকে অভিভাবক যদি যথার্থ মূল্যায়ন করতে না পারে তাহলে এটাই অভিভাবকের অবাধ্যতা ও বিরক্তির অন্যতম কারণ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু শিশুকে তা হতে সম্পূর্ণররূপে নিষেধ করাও সমীচীন হবে না। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকের কর্তব্য শিশুটিকে এমন কিছুতে ব্যস্ত রাখা যা তার এ অপতৎপরতাকে নিঃশেষ করে দেবে এর মধ্যে ব্যাপৃত হওয়ার পূর্বেই। উদ্দীপনা ও চঞ্চলতার প্রকাশ শুধু একটি প্রকারেই সীমিত না রেখে বিভিন্ন প্রকরণে হওয়া উচিত। যেমন : ফুটবল খেলা, বাইসাইকেল চালানো ইত্যাদি।

উল্লেখ থাকে যে, শিশুর বিকাশের এ স্তরে এসে তাকে কোন কাজে ব্যস্ত না রেখে শুধুমাত্র আদেশ-নিষেধের নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভর করা অভিভাবকের কাছে কাম্য নয়। যেহেতু শিশুটি নির্দিষ্ট কিছু ধীর-স্থীরতা থেকে শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ও সে খুব দ্রুত নিজ দায়িত্বের দিকে ফিরে যাবে যেন কিছুই ঘটেনি। কখনো কখনো উক্ত অবস্থার পুনরাবৃত্তিও ঘটতে পারে যখন কোন অভিভাবক শিশুকে শাস্তি প্রদান কিংবা ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা করে, যার কু-প্রভাব সুদূর প্রসারী। যথা : ভূত-প্রেত বা জ্বীনের ভয় দেখানো। যা তার ব্যক্তিত্বকে বিশেষ করে অন্ধকার স্থানসমূহে কাপুরুষতা ও দুর্বলতায় কলুষিত করে দেয়। শিশুর চঞ্চলতা, উচ্ছাস যে তার বয়সের বৈশিষ্ট্য, একজন অভিভাবকের এটা বুঝতে হবে। তখন তার কর্তব্য হবে, এমন পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা যা একটি শিশুর জীবনে উত্তরোত্তর কল্যাণ বয়ে আনবে। যেমন : শিশুকে এমন কাজে ব্যাপৃত রাখা যেখানে সে তার শক্তির চর্চা করতে পারে। সাথে সাথে সে ওখান থেকে লাভবানও হবে। যথা : শারীরিক-মানসিক বিকাশে সহায়ক খেলাধুলা অথবা তার সাধ্য ও সামার্থ্য অনুযায়ী কোন হালকা কাজের দায়িত্ব দেওয়া।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অন্তরায় ও সমস্যাবলী

তরবিয়ত চাই তা যে স্তরেরেই হোক না কেন তার কিছু সমস্যা ও প্রতিকূলতা আছে, থাকবে। শিশুর বয়সের স্তরভেদে তা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে একটি অন্যটির সীমানার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ অঞ্চলসমুহ স্ত রকে স্পর্শ করে। এখানে যা আলোকপাত করবো তা-ই একমাত্র অভিমত নয় বরং তা হলো সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি। এ জাতীয় পাঠের এটাই প্রকৃত সত্য। শুধুমাত্র শিশুর সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্তরায় ও সমস্যাবলী যা অন্য দৃষ্টিতে শিশুর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বলে পরিগণিত হয়ে থাকে ও এর মাধ্যমে একটি শিশুকে অন্য শিশুর থেকে আলাদা করা যায়। কিন্তু এটা হতে হবে অবশ্যই নেতিবাচক। মানুষের স্বতসিদ্ধ অভ্যাস, উভয়টাই বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি হওয়া সত্যেও সে ইতিবাচক বিষয়কে গুণাবলি আর নেতিবাচক বিষয়কে সমস্যা ও অন্তরায় বলে অভিহিত করে থাকে।

শিশুর এ বয়োঃস্তরে একজন অভিভাবক যে সকল প্রতিকূলতা ও সমস্যার সম্মুখীন হয় তার মধ্য হতে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো –

১- মিথ্যাবলা :

একটি শিশু শুধুমাত্র তার সঙ্গে সম্পৃক্ত উদ্দেশ্যই বাস্তবায়ন করতে চায় অথবা সে কতিপয় অবাঞ্চিত কাজ ও আচরণের প্রতিক্রিয়া গোপন করতে চায়। অথচ তার কাজকে ভালোরূপে উপস্থাপন করার সামর্থ্য তার নেই। এক্ষেত্রে তার জন্য সর্বাপেক্ষা সহায়ক ও সহজসাধ্য বিষয় হলো মিথ্যাবলা। অভিভাবকের এ

ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা উচিত যে, শিশুটি যেন মিথ্যা বলার প্রয়োজন অনুভব না করে। অবশ্য তার মিথ্যা বলাটা কখনো একজন বয়স্ক ব্যক্তির মিথ্যা বলার মত নয়।

যেমন কোন শিশু সন্তান তার বাবার নিকট একটি বিষয়ের বিবরণ দিল। পরে দেখা গেল আরেকজন বয়স্ক ব্যক্তি তার উল্টো বিবরণ দিল। তখন শিশুটির বাবা মনে করে তার বাচ্চাটির কথাই সত্য হবে। কেননা শিশুরা মিথ্যা বলে না ও মিথ্যা চেনে না।

কিন্তু এটা ঠিক নয়। বরং মিথ্যা বলা শিশুর নিকট একটা মামূলী ব্যাপার ও খুবই সহজ। কারণ এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সে অজ্ঞ, সে আদিষ্ট (মুকাল্লফ) নয় যে, শরিয়তের নিষেধাজ্ঞা বাধ্যতামূলকভাবে তার থেকে ছাড়াতে হবে। শিশু-সন্তানটি সত্য বলল, না মিথ্যা? প্রমাণ ও আলামতের সাহায্যে তা নিশ্চিত হওয়া অভিভাবকের কর্তব্য। যেহেতু সাধারত সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে শিশুর মিথ্যা বলার সামর্থটা খুবই দুর্বল। সেহেতু তার মনগড়া মিথ্যা চিহ্নিত ও সনাক্ত করা খুব সহজ। অভিভাবকের নিকট মিথ্যা প্রমাণিত হলে শিশুটিকে এর ভয়াবহতা ও পরিণতি সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ দেওয়া অভিভাবকের কর্তব্য। তাকে বলা যেতে পারে, মিথ্যা বলা কখনোই কোন ভদ্রশিশুর চরিত্র হতে পারে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা মিথ্যাবাদীকে ভালবাসেন না। এমন কি খোদ আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুরুব্বীগণও মিথ্যাবাদীকে ভালবাসেন না। মিথ্যার ক্ষতি ও অপকার সম্বলিত সংক্ষিপ্ত গল্প উল্লেখ করা যেতে পারে শিশুটির কাছে। কৃতকর্মের জন্য তাকে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাইতে উদাত্ত আহ্বান জানাবেন ও সতর্ক করে দিবেন পুনরায় যেন কখনো এরকম কাজ সে না করে। আবারো তাকে সত্যের দিকে আহ্বান করবেন এবং বলবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা সত্যবাদীকে ভালোবাসেন। এমনিভাবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ও মুরুব্বীগণও সত্যবাদীকে ভালবাসেন। সত্যের প্রতি ভালোবাসার পুরস্কারও সে-ই ভোগ করবে। শিশুর পছন্দনীয় কোন জিনিস দেয়ার সময়ও তাকে সত্যের প্রতি অনুপ্রাণিত করবেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে কখনোই তার মিথ্যারত অবস্থায় তাকে কঠিন ভয় দেখানো যাবে না ; অথবা তাকে এমন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া যাবে না, যা তার বয়োঃস্তরের সঙ্গে সামাঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ বারবার শাস্তি তাকে মিথ্যাবলায় কালক্ষেপণ ও উক্ত শাস্তি থেকে পরিত্রাণের আশায় কথিত মিথ্যায় তাকে জেদী হতে উদ্যত করতে পারে। সবসময় তাকে লজ্জা দেয়া বা তিরস্কার করাও উচিত নয় । এতে তার মন ভেঙ্গে যাবে। ফলে কখনো বা উক্ত ধ্বংসাত্মক আচরণ তার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যেতে পারে।

তবে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যে, কখনো কখনো শিশুর এ বয়সে মিথ্যা বলাটা 'ইচ্ছাকৃত অসত্য সংবাদ প্রদান' এর পর্যায় পড়ে না। বরং এটা তার অনিচ্ছাকৃত ভুল, অথবা তার নিকট বিভিন্ন বিষয়ের সংমিশ্রনে সৃষ্ট ক্রটিও হতে পারে। বিশেষত এ বয়সে সংঘটিত ঘটনাপঞ্জি সে স্মৃতিতে উত্তমরূপে ধারণ করে রাখতে সক্ষম নয়। বিশদ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ঘটনাবলি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যেমন : সময়ের ব্যবধান ও তার অনুধাবন শিশুদের এতোটা স্পষ্ট নয়, যতটা স্পষ্ট বড়দের কাছে। এখানেই প্যাঁচ লেগে যাবে বর্তমান ও অতীত কালের মধ্যে। ফলে এর বিবরণই সে এমনভাবে দিবে যা বাহ্যত মিথ্যা। জাগ্রত অবস্থায় ও স্বপ্ন জগতে যা দেখতে পায় তার সাথেও অনেক সময় গুলিয়ে ফেলে। স্বপ্নে যা দেখেছে তার গল্প করে এমনভাবে যেন সেটা একটা সংঘটিত বাস্তবতা। এ নিয়ে কখনো অভিভাবকরাও বিপাকে পড়ে যান। বিশেষ করে শিশুটি যখন এমন বিষয়ের বিবরণ দেয় যা ধর্মীয় ও চারিত্রিক কোন দিক থেকেই গ্রহণযোগ্য নয়।

২- পণ্যসামগ্রী নিয়ে খেলা করা :

চতুর্পাশ্বস্থিত পরিবেশ পরিচিতির প্রতি টান, অপরিচিত বস্তুসম্ভারের রহস্য উদ্ঘাটনের আগ্রহ শিশুদের স্বভাবজাত প্রকৃতি। এটা তার পছন্দনীয় বিষয়। সুতরাং তাকে এদিকে অনুপ্রাণিত করা উচিত। কিন্তু সমস্যা তখন দেখা দেবে যখন উক্ত পণ্যসামগ্রী নষ্ট কিংবা ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে এই সুন্দর আচরণটি উল্টো দিকে প্রবাহিত হবে। তবে এক্ষেত্রে অভিভাবকের আনুগত্য ও অনুসরণ থেকে তাকে বিরত রাখার মধ্য দিয়ে এর প্রতিকার করা যেতে পারে। কারণ এই পণ্যসামগ্রী শিশুর হাতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে ; এমনকি তার বড় ধরনের কোন বিপদ ঘটতে পারে বা ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে শিশুরাতো এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে না ও এর ক্ষতি সম্পর্কে ধারণা রাখে না। অতএব শিশুকে কখনোই একাকি এমন স্থানে ছেড়ে আসা উচিত নয় ; যেখানে এ সকল জিনিস বিদ্যমান। কারণ শিশুর নির্জনতাই তাকে ঐ জিনিসপত্র নষ্ট করতে আহ্বান জানাবে। বিশষ করে ঘর যখন একেবারে খালী থাকে।

শিশুর সম্মুখে বিপদজনক পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করা কর্তব্য। যাতে অভিভাবকের অনুপস্থিতির সময় শিশুর পক্ষে তার নাগাল পাওয়া সম্ভব না হয়। সতর্কতার ব্যবস্থা প্রত্যেকেই তার অবস্থানুযায়ী করতে হবে। যথা : নিষেধবাক্য সম্বলিত কার্ড টানানো, তালাবদ্ধ করে রাখা ইত্যাদি– যা শিশু ও পণ্যসামগ্রীর মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। শুধু উপদেশ ও সতর্কবাণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। যেহেতু শিশু-সন্তানটি এখনো এর যথার্থ মূল্যায়ন করতে শিখে উঠতে পারেনি।

এক্ষেত্রে আর একটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। শিশুকে ব্যস্ত রাখতে সক্ষম এমন বস্তু শিশুর সম্মুখে রেখে দেয়া। যার ব্যবহার শিশুর জন্য কোন কষ্ট বা বিপদ ডেকে আনবে না এবং ঘরও ময়লা হবে না। যেমন :প্লাস্টিকের চতুর্কোণ বিশিষ্ট খেলনা সামগ্রী যা তাৎক্ষণিকভাবে বিন্যস্তকরণ কর্ম প্রশিক্ষণে তাকে উপকৃত করতে পারে ও তার চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ ঘটাতে সহায়ক হবে। তবে যে সকল পণ্য সহজে নষ্টযোগ্য বা ভেঙ্গে যেতে পারে সেগুলো এমন স্থানে রেখে দেয়া উচিত, যেখানে একটি শিশুর পক্ষে পৌঁছা সম্ভব নয়। সাথে সাথে ঐ উপকরণও দূরে সরিয়ে রাখতে হবে যা ব্যবহার করে সে দেয়ালের উপরে আরোহন করতে পারে এবং পণ্য সামগ্রীর কাছে পৌঁছতে পারে। কারণ এতে আরো বড় ধরনের বিপদাশঙ্কা রয়েছে।

৩- অবাধ্যতা :

কোন কোন শিশু-সন্তান মা-বাবার পক্ষ থেকে স্বভাবগত পরিমাণের চেয়ে একটু অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়ে থাকে। যেমন : সে অবিবাহিত ছেলে অথবা সে একমাত্র সন্তান অথবা সকল ভাই-বোনের মধ্যে সে একমাত্র ছেলে সন্তান। সুতরাং এটা তার মনে সকলের অপেক্ষা অনন্য মর্যাদাবোধ ও গুরুত্বানুভূতির জন্ম দেয় যা অনেক সময় তাকে মা-বাবার শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ ও তাদের অবাধ্য হতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলশ্রুতিতে তার দাবী পূরণের জন্য জিদ ধরে ও তার দাবী বাস্তবায়নের জন্য যে কোন পথের আশ্রয় নিয়ে থাকে। যথা : দীর্ঘক্ষণ কান্নাকাটি করা, সজোরে চিৎকার করা, দরোজায় পিটানো, মেঝেতে পদাঘাত করা অথবা গৃহস্থালীর মালামাল ভাংচুর করা। বিশেষ করে অতিথি অথবা অপরিচিত লোকদের উপস্থিতিতে। যাতে তার অভিভাবক একটা অসুবিধায় পড়ে তার দাবী পূরণ করে দেয়। এ অবস্থায় শিশুটি তার বাবা অথবা মা উভয়ের মধ্যে তার দাবী পূরণে অপেক্ষাকৃত যে বেশি দুর্বল তার আশ্রয় নেয়। এ প্রেক্ষাপটে মা-বাবার ঐকমত্য নেহায়েত প্রয়োজন। কখনো বা তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে দাদা-দাদীর কোন একজনের অথবা অন্য কোন আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয় নেয়। এরকম নাজুক পরিস্থিতিতে অভিভাবককে হতে হবে একজন প্রাজ্ঞ শাসক। তার চিকিৎসা বা প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই অবাধ্যতার কারণগুলো চিহ্নিত করতে হবে ।

অতএব তাকে তুচ্ছ কিংবা প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। অথবা তার সকল আবদার পূরণেও অভ্যস্ত করা উচিৎ হবে না। যেমন : তার প্রতি এমন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে না, যা অনুচিত। সকল নিষিদ্ধ বিষয়ে এক মাপকাঠিতে আচরণ করা যাবে না। কারণ কিছু নিষিদ্ধ বিষয় আছে যা শুধুমাত্র সদাচার ও চরিত্রের পূর্ণতা বিনষ্ট করে। আর কিছু নিষিদ্ধ বিষয় আছে যা চরিত্র ও সদাচার সমূলে ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং সকল নিষিদ্ধ বিষয়কে একভাবে মূল্যায়ন করলে চলবে না।

যখন এই মূলনীতিকে শক্তভাবে অবলম্বন করে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবেন, তখন আপনি সফল ও আপনার নিষেধাজ্ঞা হবে অব্যর্থ। শিশু কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা প্রভাবান্বিতকারী উপকরণ অবলম্বনের সামনে পরাস্ত হলে চলবে না। কারণ প্রতিটি নিষেজ্ঞার সময় তাকে সাড়া দেয়া তদসংশ্লিষ্ট কাজ করতে তাকে প্ররোচিত করবে এবং এই আচরণটা তার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে থাকবে একেবারে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত।

৪- কোন বিষয়কে যথার্থ মূল্যায়ন না করা :

এ বিষয়ে শিশুর গবেষণার ক্ষমতা খুবই সীমিত। উত্তমরূপে শুধুমাত্র অর্থ অনুধাবন করার সামর্থ্যও সে রাখে না। অথচ এটা এমন একটি বিষয় যার প্রাচুর্য্য তাকে এমন তথ্যসমৃদ্ধ হতে সাহায্য করবে, যার মাধ্যমে একজন অভিভাবক চিন্তা ও বুদ্ধির খোরাক যোগাতে চায়। সুতরাং অভিভাবকের কর্তব্য এ বয়সে তিনি শিশু ও উক্ত বিষয়ের মধ্যে এই পরিমাণ দূরত্ব সৃষ্টি করবেন যে, শিশুটি ঐ অর্থ থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়। তবে নেহায়েত প্রয়োজনের সময় কাছাকাছি অর্থের সহায়তা এবং শিশুর চতুপার্শ্বস্থ বাস্তব পরিবেশ থেকে উদাহরণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমন : দূরত্ব ও সীমানার ক্ষেত্রে শিশুর আচরণ- তার সন্দেহের কারণে- তার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন স্পষ্ট নয়। যেমন : সে কখনো বা পথে অথবা পথে আবর্তিত আন্দোলন বা স্পন্দন সম্পর্কে পরিচিত হতে চায়। তখন সে তার ঘরের জানালায় উঠে থাকে যা অনেক সময় ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে হয়ে থাকে ও সেখান থেকে পথের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে থাকে। অথচ এক্ষেত্রে আসন্ন বিপদাশঙ্কাও সে পরিমাপ করতে পারে না।

এহেন পরিস্থিতিতে একজন অভিভাবকের সবচেয়ে বড় যে ভুলটি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা হলো তাকে ধমক দিতে বা চিৎকার করতে উদ্যত হওয়া ; যা তাকে শাস্তির ভয়ে ঘর থেকে বের হতে বাধ্য করবে। অথচ সে এর সাক্ষাত বিপদের ভয়াবহ পরিণতির কথা পরিমাপ করতে পারবে না। ফলে এমন অনাহুত ঘটনা সংঘটিত হয়ে যেতে পারে যার আশঙ্কাই অভিভাবক করছিল। তবে এ পর্যায়ে একজন অভিভাবকের একান্ত কর্তব্য হলো-সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে পথ চলা যাতে সে তাকে দেখতে ও অনুভব করতেও না পারে-তাকে উক্ত অভ্যাস থেকে ফিরিয়ে আনা ও নিরস্ত্র করা। তবে হ্যাঁ যদি এরূপ সতর্কতা অবলম্বন সম্ভব না হয় বরং শিশুটি তাকে দেখে ফেলে এবং বুঝতে পারে। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি বা বিরক্তি প্রকাশ উচিত হবে না। বরং নীরব সমর্থন প্রকাশ করে যাবে। যাতে সে আস্বস্ত ও পরিতৃপ্ত হয়ে সেটা ছেড়ে দেয়।

এরপর তাকে শিক্ষাদানে মনোনিবেশ করবে অথবা পরিস্থিতির অনুকূল কোন শাস্তির ব্যবস্থা করবে। যেমন : একটি শিশুর এ বয়সে গৃহস্থালী সামগ্রী ঘরের বাইরে নিক্ষেপ করার প্রবণতা থাকে, যা পথচারীর বড় রকমের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জিনিসগুলো ভেঙ্গে কিংবা হারিয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে সম্ভব হলে জানালার ওপর লোহার গ্রীল দেয়া যেতে পারে। যেখান থেকে জিনিষপত্র বা শিশু যেন বের হতে না পারে। এটা শুধুমাত্র একটা সহজ উদাহরণ। অভিভাবক যার ওপর নির্ভর করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তবে কখনো এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

৫- আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থপরতা :

আধিপত্যের মোহ প্রাণীকুলের স্বভাবজাত প্রবণতা। মানব শিশু এ থেকে মুক্ত নয়। একটি শিশুর ক্ষেত্রে এ স্বভাবটির বিকাশ এভাবে হতে পারে, তার জন্য কিছু জিনিষ নির্দিষ্ট করে দেয়া যাতে অন্য কারো অংশীদারিত্ব থাকবে না। এটার যত্ন ও সংরক্ষণের দায়িত্বটাও তার থেকে আদায় করে নিতে হবে। তবে কখনোই তার এ স্বভাব সুলভ প্রবণতাকে পদদলিত করা ঠিক হবে না। পক্ষান্তরে সে যদি অন্যায়ভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে চায় তখন অবশ্যই এটাকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। কারণ একটি শিশু এ বয়সে কোন জিনিসটা নিজের জন্য নির্ধারিত আর কোনটা অন্যের এ পার্থক্য করতে পারে না। সে কারণে তার কাংক্ষিত বস্তুটি যে কোন উপায়ে পেতে চায়। চাই সেটা চুরি, ছিনতাই, কিংবা এ জাতীয় কোন অবাঞ্ছিত পদ্ধতিতেই অর্জিত হোক না কেন। এবং সেটা সে নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চায়।

এর অন্যতম কারণ মা-বাবার উদাসীনতা ও শিশুর ছেলেমানুষি। কারণ, সে নিজের দাবী বাস্তবায়নে ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম নয়। অথবা এ জাতীয় আচরণ যে করে শিশুটি তার অনুসরন করে। যেমন : তার আগ্রহ থাকে যে, সে তার সঙ্গীদের মত হবে, যা তাকে উদ্বুদ্ধ করে এমনটি করতে। কখনো কখনো শিশুকে নিরেট ধারণা শিখানোর সংকল্প করা হয় যা আদৌ ফলপ্রসু নয়। কাজেই অভিভাবকের কর্তব্য হবে উপদেশ দানের পাশাপাশি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে সচেষ্ট হওয়া। তার সংকল্পে পূর্ব দৃঢ়তা এ বিষয়ের কার্যরূপটাকে শক্তিশালী করবে। উদাহরণত অভিভাবক যদি শিশুর প্রিয় কোন বস্তু লুকিয়ে রাখে, অতঃপর শিশুটি সেটা তালাশ করার পরও না পায়, তাহলে নিশ্চয়ই এটা তার মনোকষ্টের কারণ হবে। এরপর তাকে যদি বলা হয়, যার প্রিয় বস্তু চুরি অথবা কোন মাল ছিনতাই হয়ে যায়, তার নিশ্চয়ই তোমার মত কষ্ট লাগে। এখান থেকেই সে চুরি ও ছিনতাই এর যন্ত্রণাটা নিজের ওপর দিয়ে অনুভব করে নিতে পারবে।

৬- বিদ্রোহ ও স্বেচ্ছাচারিতা :

নিজ ব্যক্তি সত্ত্বার দিকে শিশুর অত্যধিক ঝোঁক থাকে। বিভিন্ন হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে সে নিজের মতের ওপর একগুঁয়েমি, স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির অপেক্ষা অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার প্রথম কথা অথবা কোন নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে কোন তৎপরতা চালাতে থাকে। এগুলোর কোনটাই প্রকৃত সমস্যা নয়। বরং মূল সমস্যা তো তখনই দেখা দেবে যখন কতক শিশু নিজের ব্যক্তি সত্ত্বাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে সীমা লংঘনের পথে চলবে– যা কখনো বা অন্যের ওপর অবিচার আবার কখনো জিনিসপত্র বিনষ্টের নামান্তর হবে, যদিও সেটা তার নিজের মালিকানাধীনই হোক না কেন।

আবার কখনো তা অন্যের ওপর স্বেচ্ছাচার অবস্থার ক্রোধ অথবা জাত্যাভিমানের কারণে হয়ে থাকে। যেমন : জিনিসপত্র ভাংচুর বা নষ্ট করা, তার ব্যবহার না জানা কিংবা বুঝার অসমর্থতার কারণেও হয়ে থাকে। অবশ্য এতেও তার কষ্ট লাগে বটে। এটা বেশির ভাগ প্রকাশ পায়, যে খেলনাসামগ্রীর ব্যবহার সে বুঝে না বা তার থেকে উপকৃত হতে সমর্থ রাখে না সেক্ষেত্রে। সুতরাং আপনি দেখতে পাবেন কিছুক্ষণ পর সে ওটা নষ্ট করছে বা ফেলে দিচ্ছে।

কাজেই একজন অভিভাবককে জানতে হবে এ জাতীয় অনাকাংক্ষিত আচরণের সূচনা যদিও নাকি প্রথম পর্যায় শৈশবে শিশুর দৈহিক দুর্বলতার দরুণ হয়েছে। কিন্তু এখনই তার সার্বিক প্রতিকার করা না গেলে সাধারণত শিশুর বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এটা আরো প্রকট আকার ধারণ করতে থাকবে। এ প্রেক্ষিতে একজন অভিভাবকের প্রয়োজন হবে শিক্ষামূলক কর্মশালার।

সার সংক্ষেপ হলো, বাস্তবমুখী কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে শিশুকে স্বেচ্ছাচার ও সীমা লংঘনের অপকারিতা ও ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে গল্প-সম্ভার থেকেও সহায়তা নেয়া যেতে পারে। যেখানে সীমালংঘন ও অত্যাচারের পরিণতি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ের ওপর নির্মিত ভিডিও, ক্যাসেট অথবা কম্পিউটারের নির্বাচিত অনুষ্ঠানের সহায়তা নেয়াতেও কোন অসুবিধা নেই। যেখানে সীমালংঘনের ক্ষতি এবং তার অশুভ পরিণতি বাস্তব কর্মরূপে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

৭- বিরক্তি ও অধৈর্য :

এ বয়সে শিশুকে জাগ্রত করা ও তার অন্তরে কোন কিছু গেঁথে দেয়ার সময় যেন কোনভাবেই নির্ধারিত কয়েক মিনিটের বেশি অতিক্রম না করে। কারণ একটি শিশু এ বয়সে শিক্ষা কিংবা প্রশিক্ষণ কর্ম আরম্ভ করার কিছূ সময় পরই বিরক্তি অনুভব করে থাকে। এবং সহজেই তার অভিভাবকের আনুগত্য পরিত্যাগ করে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন : তার খেলনাসামগ্রী নিয়ে খেলা করা, সহপাঠীদের সঙ্গে কথা বলে ইত্যাদি।

অতএব অভিভাবকের দীর্ঘ কথার কারণেই শিশুর পক্ষ থেকে বেপরওয়া ভাব ও অমনোযোগী হওয়ার সমস্যা প্রকাশ পেল। সে কারণে উপযোগী হলো কোন বিষয় উপস্থাপনের সময় যেন নির্ধারিত কয়েক মিনিটের বেশী সময় অতিক্রম না করে যায়। এর সঙ্গে আলোচনার মাঝখানে এমন বিষয়ের অবতারণা করতে যত্নবান হতে হবে যা শিশুটিকে তার অভিভাবকের সঙ্গে অটুট বন্ধণে আবদ্ধ রাখতে এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হতে সহায়ক হয়। এক পর্যায়ে সে তার চেতনা জাগ্রত, মনোযোগ দেয়া ও সকল অহেতুক বস্তু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া অথবা খেলা করা ইত্যাদি ত্যাগ করতে যত্নবান হবে।

স্থবিরতা নিরসনের জন্য শিশুদের স্থান পরিবর্তন উপকারী হিসেবে প্রমাণিত। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী দাঁড়ানো, বসা ও চলা ফেরার স্থানসমূহ পরিবর্তন করে দেয়া। সম্ভব হলে অভিভাবক তার 'পাঠ'কে কয়েকটি প্রিয়ডে বিভক্ত করে নেবেন। যাতে আড়ষ্ট অবস্থা দূর করার জন্য প্রতিটি প্রিয়ড ও পরবর্তি প্রিয়ডের মাঝে শিশু নতুন করে উদ্দীপনা পায় ।

কোন সময় এমনও হয় যে, অভিভাবক শিশুর জন্য কোন বিষয়ের প্রতি বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করে অথবা তাকে নতুন কোন বিষয় শিক্ষা দিতে চায় ; তখন শিশুটি হঠাৎ করে এমন প্রশ্ন করে বসতে পারে, আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে অভিভাবক বা শিক্ষক ভীষণভাবে রেগে যান, অথচ তার এ প্রশ্নের কারণতো অজ্ঞতাও হতে পারে। যেহেতু সে শিশু সুলভ বুদ্ধিমত্তার সঞ্চয় থেকে এমন বিষয় বের করে তার ব্যাখ্যা করেছে, যার সঙ্গে তার বক্তব্য সম্পৃক্ত।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে যেখানে শিশু বেশ আলোচনা করে থাকে শিশুকে ধমকি প্রদান বা তিরস্কার করা অনুচিত। যেহেতু অভিভাবক ও শিক্ষকের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন অনেক দূরের বিষয় নিয়ে সে কথা বলছে। যেমন : তার প্রশ্ন কিংবা জিজ্ঞাসাকে অবজ্ঞা করা, উত্তরের অযোগ্য গৌণ বিষয় অথবা সময়ের অপচয় বলে মনে করা সমীচীন নয়। কারণ অভিভাবক ও শিক্ষক যদি এই দিক -যা তার কৌতূহলকে জাগ্রত করেছে- থেকে শিশুর আত্মাকে পরিতৃপ্ত করতে না পারে তাহলে সে পুরোটা সময় ধরে অভিভাবক বা শিক্ষক থেকে বিমুখ হয়ে শুধু ঐ বিষয়টা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করতে থাকবে। যদিও বাহ্যতঃ তাকে দেখতে 'অনুকরণ করছে' বলে মনে হবে। বরং এক্ষেত্রে প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার প্রতি তাকে উৎসাহ প্রদান এবং সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে যে জানে না, তাকে অজানা বিষয়ে প্রশ্ন করার ওপর ধন্যবাদ দেয়া উচিত। এ জাতীয় প্রেক্ষাপটে অভিভাবক ও শিক্ষককে দ্রুত কর্ম সম্পাদনে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ নেহায়েত জরুরি।

তৃতীয় অধ্যায়

পদ্ধতি ও উপকরণসমূহ

ইবাদতের মূল হচ্ছে নির্ভরশীলতা, শরিয়তের উৎসমূল থেকে গ্রহণ ঠিক যে পদ্ধতি এসেছে সেভাবেই তার আনুগত্য করা।

পক্ষান্তরে শরিয়তের অনুমতি সাপেক্ষে মানবিক ইচ্ছাশক্তিই হল অভ্যাসগত বিষয়ের মূল প্রতিপাদ্য। যার প্রতিটি কাজ ক্ষতিমুক্ত ও উপকারী হবে। অথবা ক্ষতিকারক বটে কিন্তু কোন একদিক থেকে উপকার অথবা বড় রকমের উপকার তার মধ্যে নিহিত থাকতে হবে।

এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদ্ধতিটাই প্রয়োগ করেছেন। তবে উপকরণগুলো স্থান, কাল, পাত্রভেদে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি, তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এর বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে পারে। সুতরাং যুগের প্রগতি, অগ্রগতি ও উন্নতির অনুকূল উপকরণকে অপর এক পদ্ধতির বাস্তবায়ন কিংবা আদর্শ বাস্তবায়নের মধ্যে প্রয়োগের ক্ষেত্রে এখন আর কোন নিষেধাজ্ঞা থাকলো না।

শিশুর এই বয়োঃস্তরে একজন শিক্ষক ও অভিভাবকের এমন কতিপয় পদ্ধতি ও উপকরণের প্রয়োজন পড়বে। শিশুর শিক্ষানবীশ কালে যা অবলম্বন করার সামর্থ্য তার রয়েছে। তবে যদি উপকরণ অথবা পদ্ধতি শিক্ষানির্ভর নিরেট অনুকরণ হয়, যার কোন বিকল্প নেই বা যেটা খুব কমই ফলপ্রসূ হয়। বিশেষ করে এই ছোট্ট বয়সে শিশুর চিন্তাশক্তি স্মরণ, মুখস্থকরণ ও পুনরাবৃত্তির ওপর সীমাবদ্ধ থাকে। যেহেতু সে গঠন, বিন্যাস ও উম্মোচণের মত উচ্চ পর্যায়ের চিন্তা করতে সামর্থ নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এখানে কতিপয় প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ ও পদ্ধতি উল্লেখ করলাম –

অর্থবহ সত্য গল্পের মাধ্যমে প্রতিপালন :

যে সব পদ্ধতির ওপর নির্ভর করা যায় চিত্তাকর্ষক গল্পপদ্ধতি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। অভিভাবক ও শিক্ষক একটি সত্য ও বাস্তবানুগ গল্প নির্বাচন করতে পারেন। অধিকাংশ সত্য ও বাস্তব গল্পের মাধ্যমে আমাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে পারি। গল্পের বিভিন্ন শিক্ষণীয় দিক সম্বলিত অংশ বিশেষ থেকে আমাদের সন্তানদের প্রতিপালন ও পরিচর্যা করতে পারি। যেমন : সততা, আমানতদারী, কর্তব্য-পরায়ণতা, সাহসিকতা, অভাবীর সাহায্য, গরীবের প্রতি দয়া ও বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি। সুতরাং অভিভাবক এক বা একাধিক এমন গল্প উপস্থাপন করবেন, যা তিনি শিশুকে যে আদবটির ওপর প্রতিপালন করতে চাচ্ছেন তা নিশ্চিত করবে। এর মধ্য দিয়েই তার অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়ে যাবে।

এক্ষেত্রে জীবনী বিষয়ক গ্রন্থাবলী থেকে সাহায্য নেয়া একজন অভিভাবকের নিকট অত্যন্ত উপকারী হিসেবে প্রমাণিত। কারণ, এখানে শিশুর পরিচর্যায় আমাদের প্রত্যশা ও প্রয়োজনের সমন্বয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ সত্য গল্পসম্ভার রয়েছে। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধাভিযানসমূহ, সাহাবায়ে কেরামের রা. জীবনালেখ্য, তাদের বীরত্ব-গাঁথা ও নেতৃত্ব। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছোট ও বড় যুদ্ধাভিযান থেকে তাদের সন্তানদের

প্রতিপালনের জন্য বড় ধরনের একটা উপাদান গ্রহণ করে থাকতেন। ইসমাঈল বিন মুহম্মদ বিন সা'দ রহ. বলেন, 'আমার পিতা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধ সম্পর্কিত ঘটনাবলীর বিবরণ শিক্ষা দিতেন। এবং গাযওয়াহ[২০] ও সারিয়াহ'র বর্ণনা দিতেন।' এবং বলতেন- 'হে বৎস, এ হলো তোমার বাপ-দাদার ঐতিহ্য; অতএব তোমরা এটা ভুলে যেও না।' আলী বিন সুহাইল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছোট বড় সকল যুদ্ধের ঘটনাবলী শিক্ষা করতাম যেভাবে আল-কুরআনের সুরাগুলো শিক্ষা করতাম।'[২১]

পক্ষান্তরে মনগড়া গল্পের মধ্যে কোন ক্রিয়া বা প্রভাব নেই। কারণ প্রথমটা হলো সূত্র নির্ভর, বাস্তবে যার সত্যতা সুপ্রমাণিত। এটাতো শুধু কল্পনা প্রসূত ঘটনা নয়। আল্লাহ তাআ'লাও পবিত্র কুরআনে সুন্দরতম গল্পের অবতারণা করেছেন।

যেমন তিনি বলেন -

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى

'তাদের কাহিনীতে রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষদের জন্য শিক্ষা, এটা মিথ্যা রচনা নয়।'[২২]

এ ধরনের কাহিনীতে শিক্ষামূলক অনেক বিষয় সান্নিবেশিত রয়েছে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর প্রিয় সাহাবীদেরকে রা. অসংখ্য গল্প বলেছেন। উম্মুল মুমিনীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী আয়েশা রা. আমাদের পূর্ববর্তী সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ক সম্বলিত সংবাদ গল্পের আকারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতেন। যেমন একবার তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আবু যর আর উম্মে যর নামের স্বামী-স্ত্রীর প্রেমকাহিনী শুনালেন। কাহিনী শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'আমি তোমার জন্য আবু যর, আর তুমি হলে আমার জন্য উম্মে যর।'[২৩]

এখানে শিক্ষাগত দিক থেকে গল্পের যে বিরাট গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে গেল। অতএব এটা শুধু মুখরোচক শ্রুতিমধুর গল্প বা সময়ের অপচয় করা নয়। বরং তা হচ্ছে আল্লাহর বাণী-

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى.

(يوسف-111)

'তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়। এটা কোন মনগড়া কথা নয়......।'[২৪]এর দ্বারা অভিভাবকদের এই পদ্ধতিতে উপকৃত হওয়ার গুরুত্ব নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হল।

---

[২০]. গাজওয়াহ : যে যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং উপস্থিত থেকে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। সারিয়াহ্ যে যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু তাঁর নির্দেশে কোন সাহাবীর রা. নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। অনুবাদক

[২১].আর-জামে' লি আখলাকির-রাবী-২/১৫৯

[২২] সূরা ইউসূফ, আয়াত **১১১**

[২৩] .বুখারী ,কিতাবুন-নিকাহ্-৪৭৯০

[২৪] .সুরা ইউসুফ-**১১১**

কখনো দেখা যায় কোন কোন অভিভাবক এক্ষেত্রে অবাস্তব কাহিনীর আশ্রয় নেন। কিন্তু এ জাতীয় কাহিনীর ক্ষেত্রে তার বাচনিক পদ্ধতিতে আমাদের ধর্মের প্রতিটি আহ্বান-বিশ্বাস, চরিত্র ও আচার-ব্যবহারের প্রতি পরোক্ষ উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। তবে যে সকল গল্প অনৈসলামী অভ্যাস ও আচরণকে উস্কে দেয় অথবা মুসলমানদের বিশ্বাসের পরিপন্থী বিশ্বাসের জন্ম দেয়, ঐ সকল কাহিনী পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য। যদিও সেটা কোন উৎসাহ ও উদ্দীপনার ধারক হোক না কেন। এ অবস্থায় 'আমরা এর থেকে শুধুমাত্র উপকারী অংশটুকু গ্রহণ করব, অতঃপর পরে সুযোগমত শিশুর ভুল শুধরিয়ে দেব' এমন কথা বলার অবকাশ নেই। কারণ এ বয়সে একটি শিশু যেন একটি 'সাদা পৃষ্ঠা' এর মত থাকে। সেখানে অশুদ্ধ কোন কিছু অংকন করা কি শুদ্ধ হবে? যেহেতু এটা তার মেধাকে বিক্ষিপ্ত করতঃ শুদ্ধ অশুদ্ধ সব বিষয় তার নিকট একাকার করে দেবে।

এমন কাল্পনিক কাহিনী বলা থেকেও বিরত থাকতে হবে যা কখনোই বাস্তবে সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। যথা : 'একলোক চড়ুই পাখির উদরে প্রবেশ করল। অতঃপর সে একস্থান থেকে অন্য স্থানে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করার উদ্দেশ্যে তাদের প্রাসাদ কিংবা ঘর ইত্যাদিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল, তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য।' এ গল্পটা একদিকে যেমন নিন্দিত চরিত্র গোয়েন্দাগিরির দিকে ইঙ্গিত করে, যা পৃথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত শৃঙ্খলার পরিপন্থী। সাথে সাথে তা একটি শিশুকে বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে ঠেলে দেয়। এবং এই বাস্তব পৃথিবীতে বাস্তবায়নের অযোগ্য বিষয়াদির সঙ্গে শিশুকে সম্পৃক্ত করে ফেলে। ফলে সে বাস্তব পৃথিবী রেখে অবাস্তব ও কাল্পনিক পৃথিবীতে হারিয়ে যায়। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও কু-প্রভাব শিশুর জীবনে অবশ্যই পড়বে।

পক্ষান্তরে যে সব আশ্চর্যজনক কাল্পনিক কাহিনী এখনো সংঘটিত হয়নি কিন্তু সংঘটন সম্ভব এবং আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক নিয়মেরও পরিপন্থী না হওয়ার দরুণ তা অসম্ভবও নয়। উপরন্তু তা ইসলামের অবকাঠামোকে শক্তিশালী করে। এ জাতীয় কাহিনী থেকে উপকৃত হওয়া যায়।

অনুমোদিত খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুর পরিচর্যা :

শিশুর অন্তকরণে আনন্দ সঞ্চার করা বা তার চিত্তবিনোদন নিঃসন্দেহে মুখ্য প্রতিপাদ্য। আর অর্থবহ খেলাধুলা হলো এর অন্যতম উপাদান। কিন্তু শুধুমাত্র বিনোদন ও আনন্দদানের মধ্যে খেলাধুলার ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ করলে চলবে না। বরং খেলাধুলার অসংখ্য শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যও রয়েছে যা অনেক দিক থেকে একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। তার দেহ সুগঠিত করে, চিন্তার বিকাশ ঘটায়, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে এবং সামাজিক কর্মসম্পাদনে অভ্যস্ত করে তোলে। সর্বোপরি তাকে কষ্টসহিু' হতে ও কতগুলো বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে শিখায়।

পূর্বেকার মুসলমানরা যখন তাদের সন্তানদের রোজায় অভ্যস্ত করতে সংকল্প করতেন তখন এই খেলাধুলার সাহায্যেই তাদের সন্তানদের ক্ষুধা-পিপাসায় ধৈর্য ধারণে অভ্যস্ত করে থাকতেন। রাবি' বিনতে মুআ'ওয়াজ রা. বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরা'র দিন সকাল বেলা আনসারদের এলাকায় এ সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন- 'যে সকালে কিছু খেয়েছে সে যেন দিনের অবশিষ্ট সময় না খায়, আর যে সকালে কিছু খায়নি সে যেন রোজা রাখে।' এরপর থেকে আমরা রোজা রেখেছিলাম এবং আমাদের সন্তানদিগকেও রোজা রাখিয়েছিলাম। তাদের জন্যে সুতোর তৈরী পুতুল খেলনা রেখে দিতাম। যখন কেউ খাবারের জন্য কান্নাকাটি করতো তখন তাদেরকে এটা দিতাম। এমনি করে ইফতারীর সময় হয়ে যেত।'[২৫] অন্য এক বর্ণনায় এভাবে এসেছে, 'তাদের জন্য সুতো দিয়ে খেলনা তৈরী

[২৫]. বুখারী-১৮২৪

করতাম এবং সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। যখনই তারা আমাদের নিকট খাবার চাইতো তখনই ঐ খেলনাটা তাদেরকে দিয়ে দিতাম, এর মাধ্যমে তাদেরকে ব্যস্ত রাখতাম। এভাবে রোজা পূর্ণ হয়ে যেত।'[২৬]

ছেলেদের অনুকরণে এমনিভাবে তারা খেলাধুলার সাহায্যে মেয়েদেরকেও শিক্ষা দিয়ে থাকতেন। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আসলেন যখন আমি খেলনা নিয়ে খেলা করছিলাম। অতঃপর তিনি পর্দা উঠালেন এবং বললেন- 'হে আয়েশা রা., এটা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এটা খেলনা।'[২৭]

ইবনে হাজার রহ. বলেন, 'এ হাদীস থেকে মেয়েদের জন্য ছবি আঁকা ও পুতুল জাতীয় খেলনার বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু মেয়েদের তা দিয়ে খেলার জন্য এটার অনুমতি আছে। এটা ছবি তোলার ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।' কাজী ইয়াজের রহ. এটাই অভিমত। এই মত তিনি জমহুর থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা শৈশব থেকেই সন্তান প্রতিপালন ও গৃহস্থালী কাজকর্ম প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য মেয়েদের নিকট পুতুল বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।'[২৮]

সালাফে সালেহীন কিন্তু ছেলেদের খেলাধুলাকে খাটো করে দেখেননি। কাজেই তারা ছেলেদের খেলাধুলায় বাধা দিতেন না। বরং যারা নিষেধ করতেন তাদেরকে বাধা দিতেন। হাসান রা. থেকে বর্ণিত, 'তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছেন যখন শিশুরা তাঁর ছাদের ওপর খেলা করছিল। তখন তার সঙ্গে তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ও ছিল, সে তাদেরকে নিষেধ করল। এটা দেখে হাসান রা. তাকে বললেন, 'ওদেরকে খেলতে দাও! খেলা-ধূলাই ওদের বিনোদন।'[২৯]

বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেলা-ধুলারত শিশুদের কাছে যেতেন, তাদেরকে সালাম করতেন। তাদের নিষেধ করতেন না। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেলাধুলারত বালকদের নিকট আসলেন। অত:পর তাদেরকে সালাম করলেন।'[৩০]

এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো, যে সকল খেলাধুলা ইসলামী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, ইসলামী ব্যক্তিত্ব অথবা তার কোন শাখাকে অকার্যকর কিংবা দুর্বল করে দিতে সক্ষম, ঐ জাতীয় খেলাধুলা কখনোই চর্চা কিংবা তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। তা যত আকর্ষণীয় ও সুন্দর হোক না কেন। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, খেলাধুলার ক্ষেত্রে অবশ্যই শিশুর শারীরিক নিরাপত্তার দিকে লক্ষ রাখা নেহায়েত প্রয়োজন। এমনিভাবে সময় অপচয় না করে সময়ের প্রতি যত্নবান হওয়া, শিশুর দৈনন্দিন অন্যান্য কাজের ওপর যেন প্রভাব না পড়ে সে দিকেও লক্ষ রাখা উচিত।

কম্পিউটার গেম্‌স খেলার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ তা শিশুর সিংহভাগ সময় খেয়ে ফেলে। মনিটরের সামনে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে শিশু স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে থাকে। এবং শিশু বয়সে তার মেরুদণ্ড বেঁকে যেতে পারে। এ বয়োঃস্তরে যে শিশুসুলভ চঞ্চলতা একান্ত কাম্য ছিল তাও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। উপরন্তু অনেক গেমস শরিয়ত বিরোধী বিশ্বাস, আচার, সংস্কৃতি ও চরিত্রে ভরা।

---

[২৬]. মুসলিম-১৯১৯

[২৭]. ইবনে হিব্বান-১৩/১৭৩

[২৮] .বুখারী-কিতাবুস-সাওম-১৮২৪

[২৯] . আল-ই'য়াল লি-ইবনি আবিদ্দুনিয়া-২/৭৯১

[৩০] .মুসলিম-৪৫৩৩

কিছু খেলাধুলা এমনও আছে যার জন্য প্রশস্ত জায়গার প্রয়োজন পড়ে। চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্থানে শিশুর পক্ষে তা চর্চা করা সম্ভব নয়। সকলের বাড়ীতে তো আর প্রশস্ত আঙ্গিনা থাকে না। এ প্রেক্ষিতে শিশুদের ঐ খেলাটা উপভোগের জন্য ঘরের বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। তবে এ জাতীয় খেলাধুলা একজন অভিভাবকের সরাসরি পর্যবেক্ষণে অনুষ্ঠিত হলে ভাল। যেহেতু অভিভাবকের অবর্তমানে যা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা আমরা জানি না। কুরআনুল কারীমে ইউসুফ আ. এর সঙ্গে তাঁর ভাইদের বর্ণিত ঘটনা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .(يوسف-12)

'আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন-তৃপ্তিসহ খাবে এবং খেলাধুলা করবে। আর আমরা তার সুরক্ষা করব।'[৩১]

এখানে তাদের মনের মধ্যে ষড়যন্ত্র ছিল। এখানে একটি বিষয়ের দিকে একেবারে ইঙ্গিত না করলেই নয়। আর তা হলো, কতক শিশু অক্ষরের উচ্চারণের স্থান সম্পর্কে সন্দিহান থাকে। ফলে এক অক্ষরের স্থানে অন্য অক্ষর উচ্চারণ করে ফেলে। এক্ষেত্রে অনেক অভিভাবককে দেখা যায়- খেলাধুলা অথবা কৌতূকচ্ছলে শিশুর সম্মুখে ঐ অক্ষরগুলোর বারবার পুনরাবৃত্তি করে থাকেন। এটা নিঃসন্দেহে একটি ভুল পদ্ধতি। বিশেষত যখন এটা বেশি করা হবে। কারণ এতে দিন যত যাবে সমস্যা ততই প্রকট হবে। শিশুর সঙ্গে হাসি-তামাশা করার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি মোটেও জরুরী নয়। বরং এ প্রেক্ষিতে একজন অভিভাবককে শিশুর সম্মুখে সঠিক পদ্ধতিতে অক্ষরটির বার বার উচ্চারণে তৎপর হওয়া উচিত। তাকে এমনিভাবে অভ্যস্ত করে নেবে যে, তার কথাবার্তা ঠিক হয়ে যায়। এ সকল পরিস্থিতিও কোন জটিল সমস্যা নয়, যদি তা একটি শিশুর মুষ্টিমেয় কয়েকটি অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ও শিশুর বয়স ৪/৫ বছর অতিক্রম না করে যায়। পক্ষান্তরে এ সমস্যা যদি বিপুল সংখ্যক অক্ষরের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং বয়সও উল্লেখিত সীমা অতিক্রম করে যায়। তখন তা শিশুর নিকট বড় সমস্যার সৃষ্টি করবে। এ অবস্থায় বিষয়টি নিয়ে উচ্চারণ ও বাক সমস্যা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরিচর্যা :

অনেকে মনে করেন, অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র কর্মক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তা শুধু জ্ঞানগত আমলযোগ্য বিষয়াদি প্রমাণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা অনুমান করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হওয়া যায় অপ্রকাশ্য বিষয়েও। আমাদের নিকট পূর্বেকার যুগের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। ঘটনার নায়ক সেখানে অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে সক্ষম হয়েছেন। তার সন্তানদের অন্তরে 'একতাই শক্তি' এই বিশ্বাস অংকুরিত ও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অভিজ্ঞ পিতা ও অভিভাবক কাষ্ঠের একটি আঁটি নিয়ে আসলেন ও সেখান থেকে প্রত্যেককে একটি একটি করে কাষ্ঠ প্রদান করে তাদেরকে তা ভাঙ্গতে বললেন। অত:পর তারা খুব সহজেই কর্মসম্পাদন করে ফেলল। সন্তানরা এ কাষ্ঠগুলো ভাঙ্গার পর পুনরায় আর এক আঁটি কাষ্ঠ আনালেন, যে আঁটিটা ভাঙ্গা হয়েছে হুবহু ওটার মতই। এবং সেটা ভালো করে বাঁধলেন ও আঁটিটা ভাঙ্গতে বললেন। সন্তানরা যখন এই নির্দেশ পালনে অপারগতা প্রকাশ করল। তখন অভিভাবক তাদেরকে কারণ নির্ণয়ের সুযোগ দিলেন। এই ফাঁকে মনে মনে দু'টো বিষয় নির্ধারণ করে ফেললেন –

[৩১] . ইউসুফ-১২

- তাদের অন্তরে ভ্রাতৃত্বের মূল্যবোধ গেঁথে দেয়া। আর তা হল 'একতাই শক্তি'। দুর্বল ব্যক্তিও তার ভাইদের সঙ্গে দলবদ্ধ থাকলে শক্তিশালী হয়ে যায়।
- তাদেরকে এ ঘটনাস সম্পর্কে গবেষণা করতে অভ্যস্ত করা।

অভিজ্ঞ অভিভাবক নিরবচ্ছিন্নভাবে তার কাংক্ষিত প্রতিপালনের অবকাঠামো এ জাতীয় পরিস্থিতিতে বদ্ধমূল করতে সক্ষম হয়ে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে বিপদজনক উপকরণসমূহ ব্যবহার বর্জন করা উচিত। কারণ অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে শিশুটি সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করতে চাইবে বৈকি। তখন ঘটে যেতে পারে যে কোন অনাকাংক্ষিত অঘটন।

অভ্যাস পদ্ধতিতে প্রতিপালন :

পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কোন কাজ করা বা কোন কথা বলার অভ্যাস মানুষকে তার ব্যক্তিগত গুণাবলির একটি অংশ। সাধারণত মানুষ কোন কাজে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর সেটা করতে তার আর কষ্ট হয় না। বাস্তবিকই তা অনেক কষ্টসাধ্য কাজ হোক না কেন। কথা আছে মানুষ অভ্যাসের দাস।

সে কারণে কাংক্ষিত আচরণকে অভ্যাসে রূপান্তরিত করা প্রতিপালনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কাংক্ষিত আচরণকে অভ্যাসে রূপান্তরিত করতে হলে একজন অভিভাবকের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বারবার তা পুনরাবত্তি এবং খুব কঠিনভাবে এর অনুশীলন করতে হবে। অত:পর কালক্রমে তা শিশুর অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। ফলে অভিভাবক থেকে ঐ কাজের কোনরূপ অনুরোধ ব্যতিরেকে উক্ত কাজের দাবী আসলেই সে তা সম্পন্ন করে ফেলবে। যেমন : কোন মুসলমান যদি হাঁচি দেয়ার পর 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে অভ্যস্ত থাকে, যদি সে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত থাকে বা খুব ব্যস্ত থাকে, তাহলেও সে হাঁচির পরই বলে উঠবে 'আল-হামদুলিল্লাহ।' কারণ, এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। এমনটিই হয়ে থাকে। সে কারণে হাদিসে এসছে–

الخير عادة والشر لجاجة من يرد الله به خيرا يفقهه فيالدين

'কল্যাণ ও মঙ্গল হলো অভ্যাস, অমঙ্গল ও অকল্যাণ হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদ। আল্লাহ তাআলা যার মঙ্গল চান তাকে দীনে ইসলামের সঠিক জ্ঞান দান করেন।'[৩২]

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, 'নামাজের ব্যাপারে তোমাদের সন্তানদের প্রতি যত্নবান হও! তাদেরকে কল্যাণ শিক্ষা দাও! অনন্তর কল্যাণই হচ্ছে অভ্যস।'[৩৩] মুয়াবিয়া রা. বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে কল্যাণের ওপর অভ্যস্ত করে নাও!'[৩৪] সুতরাং বাচ্চাদেরকে কল্যাণের ওপর অভ্যস্ত করতে অনুপ্রাণিত করাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভিপ্রায়। এক ভদ্র মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট একটি বাচ্চা উঁচিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল- 'এর জন্যে কি হজ্জ আছে ?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ আছে, তবে এর বিনিময় পাবে তুমি।'[৩৫] বাচ্চাটি ছোট, হজ্জের আহকাম সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উক্ত মহান ব্রতে অভ্যস্ত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর 'এ দায়িত্ব পালন

---

[৩২] .ইবনে হিব্বান-২/৮

[৩৩] .বাইহাক্বী-৩/৮৪

[৩৪] .মসনাদে শামিয়্যীন-৩/২৫০

[৩৫]. মুসলিম- ২৩৭৮

করলে তার জন্য পুরস্কার রয়েছে' বলে তার মাকেও উৎসাহিত করেছেন। যখন মুসলিম মহিলাগণ নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে যেতেন অথচ অনেক বাচ্চা কান্নাকাটি করতো। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসতে নিষেধ করেননি। বরং শিশুদের প্রতি লক্ষ রাখতেন এমনকি তাদের জন্য নামাজ সংক্ষিপ্ত করতেন। আমাদের দৃষ্টিতে এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মসজিদে আসতে অভ্যস্ত করার জন্যই করতেন।[৩৬]

নীতি ও আদর্শের মাধ্যমে প্রতিপালন :

উপদেশ, বক্তৃতা ও আলোচনার চেয়ে বাস্তবানুগ পদক্ষেপ শিক্ষার্থীর ওপর অপেক্ষাকৃত বেশি প্রভাব বিস্তার করে। কারণ সংঘটন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার সত্যায়নের প্রমাণ মেলে। অতএব অভিভাবককে প্রশিক্ষণের অবকাঠামো শক্তভাবে ধারণ করা- যার দিকে তিনি শিক্ষার্থীকে আহ্বান করবেন- বাস্তবে অনুশীলন ব্যতিরেকে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিষয়ক আলোচনা ও তার দিকে আহ্বানের চেয়ে বেশী কার্যকর। সুতরাং শিশুর সম্মুখে অভিভাবকের সকল কর্মকাণ্ডে কঠিনভাবে সততা অবলম্বন না করতে পারলেও শুধু সততার গুরুত্ব ও মূল্যায়ন বিষয়ক আলোচনার চেয়ে শিশুর জন্য ফলপ্রসু হতে পারে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. 'আদর্শ' হওয়ার গুরুত্বের ওপর সতর্ক করেছেন, যখন তিনি বাদশা হারুনুর রশিদের সন্তানদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানরত অবস্থায় আব্দুস সামাদের পিতার নিকট আগমন করলেন। তিনি বললেন, 'আমিরুল মু'মিনীনের সন্তানদের সংশোধনের সূচনা করার পূর্বে নিজের সংশোধন করে নেয়া উচিত।' যেহেতু তাদের চক্ষু তোমার চক্ষুর সঙ্গে আবদ্ধ। অতএব তাদের নিকট তা-ই সুন্দর যা তুমি সুন্দর মনে করে থাকবে আর মন্দ যা তুমি মন্দ মনে করে থাকবে।

ইবনে জাওযী রহ. 'অভিভাবকের কথা অনুযায়ী নিজের আমলের গুরুত্ব বিষয়ক' বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'জ্ঞানের স্তরের বিভিন্নতা ভেদে অসংখ্য মাশায়েখের সঙ্গে দেখা করেছি। তবে তাদের মধ্যে আমার নিকট তার সাহচর্য সর্বাপেক্ষা বেশি ফলপ্রসূ ও উপকারী প্রমাণিত হয়েছে, যিনি তার জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে থাকতেন। যদিও অন্যরা তার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান রাখেন। আমি একদল হাদীস বিশারদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছি যারা হাদীস সম্পর্কে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি রাখেন ও হাদীস সুসংহত করেন। কিন্তু হাদীসের সূত্র সমালোচনা ও পর্যালোচনা গবেষণার জায়গায় রেখে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন এবং হাদীস অধ্যায়নের ওপর বিনিময় গ্রহণ করে থাকতেন। তাদের মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সে জন্য উত্তরদান ত্বরান্বিত করতেন, যদিও তাতে ভুল হোক না কেন। আমি আব্দুল ওয়াহাব আনমাতি রহ. এর সঙ্গে সাক্ষাত করেছি, যিনি সালাফে সালেহীনদের আদর্শের ওপর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তার মজলিসে কখনো কোন পরনিন্দা শোনা যায় নি এবং হাদীস শ্রবণের জন্য কোন পারিশ্রমিক চাওয়া হয়নি। আমি যখন তার নিকট দাসত্ব বিষয়ক হাদীসসমূহ পাঠ করছিলাম তখন তিনি কেঁদে ফেললেন এবং ক্রমান্বয়ে কাঁদতে থাকলেন। আমি তখন খুব অল্প বয়সী থাকার দরুণ তার ক্রন্দন আমার অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে ও আমার হৃদয়ে সুদৃঢ় ভীত নির্মাণ করে। তিনি শায়েখদের পদাঙ্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যাদের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যগাঁথা বিভিন্ন বর্ণনায় পেয়েছি।

শায়খ আবুল মানসুর জাওলিক্বীর সঙ্গেও সাক্ষাত করেছি। তিনি ছিলেন অত্যাধিক নীরবতা পালনকারী, দৃঢ়তার সাথে নিশ্চিতভাবে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলতেন। কোন প্রকাশ্য মাসআলা সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হলে উত্তর দেয়ার জন্য তার ছাত্রগণই উদ্যত হতো, সেক্ষেত্রেও তিনি নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত

---

[৩৬]. এক্ষেত্রে অনেক লোক একটি হাদীস উল্লেখ করেন- 'তোমরা বাচ্চাদেরকে মসজিদ থেকে দূরে রেখ।' হাদীসটি দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণ একমত।

অপেক্ষা করতেন। তিনিও অত্যধিক নীরবতা অবলম্বন করতেন ও রোজা রাখতেন। আমি এই দুই মনীষীর নিকট থেকে অপরাপর সকলের চেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছি। অতএব আমি বুঝে নিয়েছি কথার চেয়ে কর্মের মাধ্যমে দিকনির্দেশনা বেশী কার্যকর ও টেকসই দিশারী।

একজন অভিভাবক যখন সর্বাবস্থায় কাজের মাধ্যমে তার সকল কথার সত্যায়ন করতে পারবেন তখন শিক্ষার্থীর জন্য এটা বেশ ফলপ্রসূ হতে বাধ্য। যদিও এটা কোন পার্থিব বিষয় সংক্রান্তই হোক না কেন। যেমন : আমাদের বর্তমানকালের লাল রঙের রোড সিগনালের নিকট এসে যদি অভিভাবক নিজে থেমে যায়। তাহলে শিশু সে আদর্শ অনুসরণ করবে। আর যদি অভিভাবক সেটা না করে রেড সিগনাল উপেক্ষা করেন তাহলে শিশু তা-ই করবে। এবং তাকে এটা না করতে সতর্ক করা হলেও সে বলবে আমি আব্বাকে দেখেছি তিনি এটা উপেক্ষা করতেন। অতএব বাস্তব কর্ম শিশুদের শিক্ষার জন্য অধিকতর কার্যকরী উপদেশ ও প্রশিক্ষণের চেয়ে। একটি শিশু তার অভিভাবককে যখন নিঃস্বদের প্রতি অনুগ্রহ ও দুর্বলদের প্রতি সাহায্য করতে দেখতে পাবে, তখন নিঃসন্দেহে এটা শিশুকে তার আনুগত্য ও অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। নিজের মধ্যে প্রতিফলন না ঘটিয়ে শুধু দানের তাৎপর্য ও গুরুত্বের ওপর আলোচনা করার চেয়ে এটা হবে অনেক বেশি ফলপ্রসূ। উপরন্তু এক্ষেত্রে শিশুকে যথাযথভাবে অনুপ্রাণিত করা অভিভাবকের একান্ত কর্তব্য। যেমন : সে অভাবীকে যে টাকাটা দিতে চায় তা পকেট থেকে বের করে নেবে, এরপর শিশুটিকে বলবে এটা নিয়ে অভাবীকে দিয়ে আস। তিনি এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিপালনের লক্ষ্য বেশ বাস্তবায়ন করতে পারবেন। সুতরাং ঐ লোকটিকে দান করার কারণ সে-ই শিশুটিকে বলে দেবে। আর তা হলো নিঃস্ব ও অসহায়কে সাহায্য করা। সে অভাবী নয় এমন লোকদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করতে ও দানশীলতায় নিজেকে অভ্যস্ত করতে সক্ষম হবে। ইবনুল ক্বায়্যিম রহ. বলেন, 'তাকে দান ও ব্যয় করতে অভ্যস্ত করাবে, অভিভাবক যদি কিছু দান করার পরিকল্পনা করেন। তাহলে নিজে না করে শিশুর হাত দিয়ে দান করাবেন যাতে সে দানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে।'[৩৭]

এমনিভাবে এই আচরণ তাকে সাহসিকতা ও অপরের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহারের শিক্ষা দেবে। আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. এর কর্মপদ্ধতিও ছিল এরকম। ইবনে উমার রা. এর নিকট জনৈক ভিক্ষুক আসলে তিনি তাঁর ছেলেকে বললেন: ওকে একটি দিনার দিয়ে দাও!'[৩৮] কখনো বা এমন ঘটনাও সংঘটিত হতে দেখা যায় যে, শিশু নিজেই তার বাবার কর্ম প্রত্যক্ষ করার পর বাবার নিকট চলে এসে অভাবীকে দান করার জন্য কিছু চায়। অভিভাবকের এ অবস্থায় তাকে বারণ করা উচিত হবে না। এমন কি অভিভাবক ভিক্ষুককে ঐ দানের উপযুক্ত মনে না করলেও। যেহেতু আমরা এখন শিশুটির জন্য এই চরিত্রটা বিনির্মাণের স্তরেই রয়েছি। এই ভিক্ষুক দান পাবার যোগ্য কি যোগ্য নয়, এই বিবেচনা এখানে সঙ্গত নয়।

অতএব শিশুর যত্ন ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- 'এমন অবকাঠামোর দ্বারা তার আচার-আচরণ গড়তে হবে যার সঙ্গে শিশুর চরিত্রবান হওয়া আমাদের কাম্য। কারণ এটা শূধুমাত্র গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, কার্যত বাস্তব আচরণ।

কুইজ প্রতিযোগিতা ও প্রশ্নকরণের মাধ্যমে প্রতিপালন :

এ বিষয়ে ব্যবহৃত সফল প্রণালীসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো প্রশ্নকরণ প্রণালী অথবা শিশুদের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতা যার উত্তর দানে তারা সক্ষম। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে কোন বিশ্বাসগত, বুদ্ধিগত অথবা কোন

[৩৭]. তুহ্ফাতুল মাওদুদ ফি আহ্কামিল মাওলুদ-২৪১

[৩৮]. আত-তামহীদ-৪/২৫৬

আচরণগত বিষয় ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু এ সকল কুইজ প্রতিযোগিতা ও প্রশ্নকরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই অভিভাবককে শিশুর বয়োঃস্তরের দিক লক্ষ রেখে সে অনুযায়ী কুইজ নির্ধারণ করতে হবে। তখন প্রশ্নগুলো তাদের বয়োঃস্তরের অনুকূল হবে এবং তাদের বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অনুযায়ী হবে। কারণ প্রশ্নমালা তাদের বয়োঃস্তর অতিক্রম করলে তাতে কোন উপকার নেই। বরং তাতে শিশুর তন্দ্রাচ্ছন্নতা ও এমন অনুভূতি সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে যা তার মন ও আচরণে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। উপরন্তু শিশুর নিকট এর বিপরীতে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে প্রশ্নগুলো যদি তার বয়োঃস্তর ও বুদ্ধির অনুকূল হয় তাহলে এর অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। কারণ তখন সে এর উত্তর দিতে পেরে সফলতার আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হবে। বুঝতে ও শিখতে পারা এবং তথ্য অর্জন তার মধ্যে এমন ক্রমবর্ধমান উদ্যম সৃষ্টি করবে যা তাকে আরো অসংখ্য বিজয় ও সফলতা পাইয়ে দিতে সাহায্য করবে। এটা অভিভাবকের প্রজ্ঞার পরিচয় হবে যে, তিনি নির্ধারিত আলোচনার পর প্রশ্ন উত্থাপন করবেন। এর মধ্যে একটি বুদ্ধিমান শিশুর জন্য ইঙ্গিত রয়েছে যে তার উত্তরটি হবে ঐ আলোচনা সংশ্লিষ্ট। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভূমিকা লক্ষ করুন ! আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. বলেন,'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকাশে অবস্থান করছিলাম, ইত্যবসরে যুম্মার আনা হলো (যুম্মার হচ্ছে খর্জুর বৃক্ষের নরম অংশ, এবং খর্জুর বৃক্ষের ভিতরের ভক্ষণযোগ্য যা কোমল হয়ে থাকে) অতঃপর তিনি বললেন, 'কিছু বৃক্ষ এমন রয়েছে যার উদাহরণ হচ্ছে মুসলমানের মত।' আমি (হাদীস বর্ণনাকারী) বলে দিতে চাচ্ছিলাম যে, সেটি হলো খর্জুর বৃক্ষ। তা সত্ত্বেও উপস্থিত সকলের মধ্যে বয়সে ছোট হওয়ার দরুণ চুপ থাকলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'সেটি হচ্ছে খর্জুর বৃক্ষ।'[৩৯] ইবনে হাজার রহ. বললেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যুম্মার উপস্থিত করার সময় মাসআলাটা উল্লেখ করলেন, তাহলে বুঝা গেল প্রশ্নকৃত বিষয়টি হলো খর্জুর বৃক্ষ।' সুতরাং বোধ-বুঝ হলো একটি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, যার মাধ্যমে তার বাহক আলোচনার সংশ্লিষ্ট কথা ও কাজ অনুধাবন করতে পারে।

তবে সে কুইজ প্রতিযোগিতা যদি শিক্ষার্থীর স্তরের উপযোগী না হয়, অথবা সেখানে সচেতন শিশুকে উত্তরের দিকে কোন ইঙ্গিতকারক না থাকে, সেক্ষেত্রে হীতে বিপরীত হতে পারে। কারণ তখন সন্তানরা তার থেকে দূরে সরে যাবে। অথবা প্রশ্নমালার সঙ্গে নিজেদের সামর্থহীনতার কারণে তাদের এক ধরনের স্থবিরতা স্পর্শ করে থাকবে। কখনো অভিভাবক বা শিক্ষকের এ জাতীয় কুইজ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সময় সংকীর্ণ হয়ে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে খাবারের জন্য অপেক্ষা করার ফাঁকে, গাড়িতে অথবা অন্য কোন সুযোগ বুঝে তা উপস্থাপন করা সম্ভব। অভিভাবকের কর্তব্য হলো, এই কাজের জন্য তার সময় থেকে একটা অংশ আলাদা করে নেবে। অপরের ওপর এ দায়িত্ব ছেড়ে দেবে না। কারণ, সে কখনোই তার মূল্যবান সময় এ কাজে ব্যয় করতে চায় না।

প্রতিটি অগ্রসরমান প্রক্রিয়া থেকে শিশুর যত্ন ও প্রতিপালন বিষয়ক ব্যবহারযোগ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে আধুনিক প্রযুক্তি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ উপকৃত হওয়া উচিত। সুতরাং আল কুরআনুল কারীম হেফজ ও উৎকৃষ্টমানের উচ্চারণের ক্যাসেট সামগ্রী কার্যকর সহায়তা করে থাকে। বিশেষ করে কোন ক্যাসেটতো এমনও আছে যেখানে উস্তাদের তেলাওয়াত শ্রবণ করার পর শিশুর কেরাআ'তও রেকর্ড করা হয়েছে। অতঃপর সে মনোযোগ দিয়ে নিজের তেলাওয়াত শুনবে। এমনিভাবে সে উভয়ের তেলাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

---

[৩৯]. বুখারী-৭০ , মুসলিম-৫০২৮

আর ভিডিও সামগ্রী যা কোন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্বলিত যা একটি শিশুর মধ্যে নান্দনিক আচরণ ও সুন্দর আচার-ব্যবহারের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম তা কাজে লাগানো যেতে পারে। এমনিভাবে কম্পিউটার প্রোগ্রামেরও নিজস্ব একটি ভূমিকা রয়েছে। এ প্রোগ্রামগুলো শিশুর বিশুদ্ধ ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও বিরাট অবদান রাখতে পারে, যদি তা সে আদলে তৈরী করা হয়ে থাকে। কারণ শিশুর দৃশ্যমান ব্যক্তিত্বের প্রতি একটা বিশেষ রকমের ঝোক থাকে। চাই তা শুধু তার কথা মালায় অথবা উচ্চারণ প্রক্রিয়ায়ই হোক না কেন।

অভিজ্ঞতা এটা সপ্রমাণ করেছে যে, শিশুরা উক্ত অনুষ্ঠানগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে তাদের ভাষা যারা এ অভিজ্ঞতার কাজে লাগায় না তাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানের হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনটি উত্তম তা নির্বাচন করতে হবে অভিভাবককেই। বিষয়টি শুধুমাত্র বাজারে সহজলভ্যতা ও শিশুর আগ্রহের ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না। কারণ এখানে শিশুদের অনুরাগে সাড়া দেয়া বা কালক্ষেপণ নয়, বরং পরিচর্যা ও প্রতিপালনই হলো আসল লক্ষ্য। এ প্রেক্ষিতে এ জাতীয় ক্যাসেট, সিডি অথবা অনুষ্ঠানমালা প্রোডাক্টের জন্য সম্মিলিতভাবে কোন একক ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং তা এমন কোন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না যেখানে প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য থাকবে কেবল বাণিজ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

পুরস্কার ও শাস্তি

ভীতিপ্রদর্শন ও উৎসাহ প্রদান এমন একটি অধ্যায় যার মাধ্যমে শরিয়তের অবশ্য পালনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে একজন মুসলিমকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়। এবং শরিয়তের বর্জনীয়, নিষিদ্ধ ও অবাঞ্চিত বিষয়াদি থেকে তাকে বিরত ও নিষেধ করা যায়। আর পুরস্কার ও শাস্তি হলো ভীতিপ্রদর্শন ও অনুপ্রেরণা দানের মাধ্যম। সেটা প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণের অন্যতম একটি উপকরণও বটে। যেহেতু পুরস্কার ও শাস্তির সূত্র ধরেই শিক্ষার্থীদের কাংক্ষিত প্রতিপালন সাধিত হয়। অত্যধিক গুরুত্বের কারণে বিষয়টি সম্পর্কে নিম্নে এককভাবে আলোকপাত করছি –

পুরস্কার :

একটি শিশু থেকে কাম্য কোন কথা বা কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য নিঃসন্দেহে একটি কার্যকর মাধ্যম ছোট শিশুর পুরস্কারের আয়োজন। অনুপ্রেরণা দানকারীর সম্মুখে তার ইচ্ছাশক্তি ও ধারণ ক্ষমতার দুর্বলতার কারণে অনুশীলন, পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবয়নের জন্য শিশুর কোন উদ্বুদ্ধকারীর প্রয়োজন হয়ে থাকে।

পুরস্কার দানের পদ্ধতিসমূহের মধ্যেও প্রকারভেদ রয়েছে। একটা পরোক্ষ ও অন্যটা বৈষয়িক পুরস্কার, তবে উভয়টাই কাম্য। একটা গ্রহণ করে অন্যটা উপেক্ষা করার সুযোগ নেই ; বিশেষ করে শিশুর এই বয়োঃস্তরে।

অভিভাবক কখনো কোন প্রতিদান বা পুরস্কারের অঙ্গীকার করলে তার কর্তব্য হলো পুরস্কার সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করা। কারণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে শিশুটি অভিভাবকের অঙ্গীকারের ওপর আর কোন আস্থা রাখবে না। ফলে এ দিক থেকে শিশুর বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। অন্য দিকে তার আনুগত্যের ওপরও বিরূপ প্রভাব পড়বে। সুতরাং যা বাস্তবে পূরণ সম্ভব নয় বা যার বাস্তবায়ন কঠিন এমন বিষয়ের অঙ্গীকার না করাই তার অঙ্গীকার পূরণের জন্য সহায়ক। যেমনিভাবে এমন কোন অঙ্গীকার

করবে না যা চাহিদার সঙ্গে সামাঞ্জস্যশীল নয়। যেমন : বিপুল সম্পদ প্রদান অথবা বিমান ভ্রমণের অঙ্গীকার যা পূরণ করা কম লোকের পক্ষেই সহজ।

কোন কোন অভিভাবক শিশুকে এ বয়সে মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে থাকেন। যেমন : তাদের ওয়াদানুযায়ী কোন কাজ করা বা ছেড়ে দিতে উদ্যত হওয়া। কিন্তু এটা অভিভাবকের নিশ্চিত ভুল ; কারণ এর দ্বারা তার ওপর মিথ্যা অবধারিত হয়ে যায়। সে মিথ্যা বলা যায় বলে শিক্ষা পায় এবং শিক্ষার্থী তার অভিভাবকের ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন আমের রা. বর্ণনা করেন- 'একদা আমার মা আমাকে ডাক দিলেন অথচ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ঘরে উপবিষ্ট ছিলেন। অতঃপর ভদ্রমহিলা বলল, 'এই বৎস, আস তোমাকে একটা জিনিস দেব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি তাকে কি দিতে চাও? সে বলল, 'আমি তাকে খেজুর দিতে চাই।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'তুমি যদি তাকে কোন কিছুই না দিতে তাহলে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা লিখা হতো।'[৪০] তিনি এও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন শিশুকে বলবে এই দিকে এসো, আমি তোমাকে কিছু দেব, অতঃপর তাকে কিছু দেয় না তাহলে এটা হবে মিথ্যা।'[৪১]

কোন কোন অভিভাবক মিথ্যা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের প্যাঁচ থেকে বেরিয়ে যেতে চায় এভাবে যে, যে কোন অবস্থায় সে মিথ্যা ব্যবহার করে কোন কাজ করা বা পরিত্যাগে শিশুকে অনুপ্রাণিত করবে। অতঃপর আলোচনার শেষে একথা বলে দিবে, ইনশা আল্লাহর (যদি আল্লাহ চাহে তো) এই ভিত্তিতে যে, তেমনটি যদি সে নাও করে থাকে তাহলে সে মিথ্যাবাদী অথবা ওয়াদাভঙ্গকারী হচ্ছে না। কিন্তু শিশুর ওপর এরও একটি বিরূপ প্রভাব রয়েছে। কারণ তার স্মৃতিতে প্রত্যাশা বাস্তবায়ন না হওয়ার এই সুন্দর কথাটি বদ্ধমূল হয়ে থাকবে। এমনকি কিছুদিন পর যখন আপনি তার সঙ্গে কোন অঙ্গীকার করে বলবেন, ইনশা আল্লাহ। তখন উত্তরে সে বলবে, ইনশা আল্লাহ ছাড়া কথা বলুন।

অভিভাবকের মনের মধ্যে যখন কোন কাজ করার দৃঢ় সংকল্প থাকবে শুধুমাত্র তখনই এই বাক্যটি বলা উচিত। এরপর উক্ত কাজ সম্পন্ন করা যদি সম্ভব নাও হয়, তাহলেও তার কোন অসুবিধা নেই। সে ওয়াদাভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে না। সুতরাং এটা কোন ঝুলন্ত বিষয়ে নয়, নিশ্চিত বিষয়ের ক্ষেত্রে বলবে। আর এই অভিমতের ওপর ভিত্তি করে যে, বাক্যটি সম্পর্কে শিশুর মনে কোন অসঙ্গত ধারণা আসবে না। বরং সে জানতে পারবে ইনশা আল্লাহ বাক্যটি শুধুমাত্র ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য বিষয়াবলী সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে। কারণ আল্লাহ তাআ'লাই হলেন সকল কর্মের একচ্ছত্র বিধাতা ও নিয়ামক। কোন কিছুই তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে সংঘটিত হয় না, হতে পারে না।

এ বয়োঃস্তরে শিশুর নিকট বৈষয়িক বস্তুর পর্যাপ্ততা অধিকাংশ সময় পরোক্ষ ও অদৃশ্য বস্তুর পর্যাপ্ততা থেকে শ্রেয় হয়ে থাকে। যদিও এটা পরোক্ষ বিষয়াদির প্রতি গুরুত্বারোপের পরিপন্থী নয়। কিন্তু দৃশ্যমান বা বৈষয়িক পুরস্কারকে অদৃশ্য পুরস্কারের ওপর প্রাধান্য দেয়া উত্তম। কারণ একটি শিশু প্রকাশ্য বিষয়ের সঙ্গেই থাকে বেশি ঘনিষ্ট। প্রতিদানের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন উচিত নয় ; তাহলে শিশু কর্মসম্পাদন বা আহ্বানে সাড়া দিতে কোন শর্ত জুড়ে দেয়ার সুযোগ পেতে পারে।

---

[৪০]. আবু দাউদ-৪৩৩৯, মুসনাদে আহমদ-১৫১৪৭

[৪১]. মুসনাদে আহমদ-৯৪৬০

শাস্তিপ্রদান :

মানুষ চাই সে ছোট হোক বা বড়, অবাঞ্চিত কাজ করা থেকে কেউই মুক্ত নয়। যেমনিভাবে ‘শিশু শরিয়ত কর্তৃক আদিষ্ট নয়’ যুক্তিতে তাদের সকল ভুলক্রটি ও অন্যায় কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে তাদের ভালোভাবে শিক্ষা-দীক্ষা সম্ভব হবে না। এমনিভাবে তার থেকে সংঘটিত প্রতিটি ভুলের জন্য শাস্তি দেয়া অথবা ভুল-ক্রটির মাঝে বিদ্যমান নিশ্চিত পার্থক্য ও প্রকরণ উপেক্ষা করে সকল ভুলক্রটিকে একই মাপকাঠিতে বিচার করা অথবা একই দৃষ্টিতে দেখা এবং শাস্তি প্রদান অভিভাবকের প্রথম টার্গেট বানানো উচিত নয়। যখন শিশুকে শাস্তি প্রদান তথা শারীরিক শাস্তি প্রদানই উত্তম বলে সিদ্ধান্ত হবে, তখন তাকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে। যাই হোক ছোট্ট বয়সে শিশুর শারীরিক শাস্তি কাম্য নয়। তাছাড়া এর অনেক ক্ষতিও রয়েছে।

ইবনে খালদুন রহ. তার আল-মুকাদ্দিমা-তে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন- ‘ছাত্রদের ওপর কঠোরতা আরোপ তাদের জন্য ক্ষতিকারক। কারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদানে সীমালংঘন শিক্ষার্থীর জন্য ভীষণ ক্ষতিকারক। বিশেষ করে ছোট ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে। কারণ এটা হলো মন্দ প্রবণতা। যে অভিভাবক প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কঠোরতা ও রুক্ষভাব প্রদর্শন করে থাকেন তার ছাত্র, অধীনস্থ ও গৃহ পরিচারিকাদের প্রতি। তাহলে সে কঠোরতা শিশুকে আক্রান্ত করবে ও তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে বসবে। ফলশ্রুতিতে শিশুর মন সংকীর্ণ হয়ে যাবে ও উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। কাপুরুষতা ও অলসতার দিকে তাকে ধাবিত করবে, মিথ্যা ও দুষ্টামির দিকে তাকে উদ্যত করবে।

ফলে তার প্রতি কঠোরতার হাত সম্প্রসারিত হতে পারে এই আশঙ্কায় অন্তরে যা আছে তার বিপরীত সে প্রকাশ করে থাকবে। এটা তাকে প্রহসন ও প্রতারণা শিক্ষা দেবে। এক পর্যায় গিয়ে এটা তার অভ্যাস ও চরিত্রে পরিণত হয়ে যাবে। ফলে মানবতার মর্মবাণী ধ্বংস প্রাপ্ত হবে; যার জন্য একটি সমাজ ও সভ্যতা গড়ে উঠে।

পরিবার হল তার প্রাণ ও গৃহের প্রতিরক্ষা। এক্ষেত্রে সে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। বরং উত্তম গুণাবলি ও নান্দনিক চরিত্র অর্জনে সে হবে ব্যর্থ এবং মানবতার দাবী পূরণে অসমর্থ। অতঃপর সে এত নীচে নেমে যাবের যে, সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণী থেকেও অনেক নীচে চলে যাবে।

এমনটি ঘটেছে প্রতিটি জাতির বেলায় যারা আধিপত্যবাদের কবলে চলে গেছে। ফলে সেখান থেকে শুধু অত্যাচার-অবিচার ও নিপীড়নই চলেছে অব্যাহতভাবে। একে আপনি পরাধীন গণ্য করতে পারেন। শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষকের ও সন্তানের ক্ষেত্রে পিতার কর্তব্য হলো তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী বা কঠোর না হওয়া।’[৪২]

শিশুকে শাস্তিদানের ক্ষেত্রে ধীরতা অবলম্বন করা উচিত। তাহলে বিভিন্ন প্রকার শাস্তির দ্বারসমূহ অভিভবাকের নিকট উম্মোচিত হবে। তখন কঠোরতা আরোপ একই প্রক্রিয়ায় হবে না। বরং প্রতিটি জায়গায় তার উপযোগী শাস্তির ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

শাস্তির একটি প্রকরণ শুধুমাত্র শারীরিক শাস্তির ওপর নির্ভরতা, দৈহিক শাস্তি ভিন্ন অন্য অসংখ্য শাস্তির প্রকরণ সম্পর্কে অভিভাবকের অজ্ঞতা অথবা তার ফলাফল সম্পর্কে অতৃপ্তি থাকা উচিত নয়। সে কারণেই

[৪২]. মুকাদ্দামা ইবনে খালদুন-৫০৮

শাস্তি, তার অসংখ্য পদ্ধতি আয়ত্ব করা ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যক অবগতি অর্জন করা দরকার। মনে রাখতে হবে দৈহিক যাতনা শাস্তির কোন নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিই হতে পারে না।

ঐ ব্যাপারে অসতর্কতাকে ভাল মনে করা ঠিক নয়। কখনো কখনো এ জাতীয় ভুলও হয়ে থাকে। কখনো শুধুমাত্র চোখের দৃষ্টি নিক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে থাকে অথবা এক প্রকারের অসন্তুষ্টি বা অগ্রাহ্যের প্রকাশ করা যেতে পারে। অনেকে তো এ ক্ষেত্রেও একটি মার্জিত বাক্য অথবা সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের ওপরই তৃপ্ত থাকেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে শিশু সন্তানকে তার পছন্দনীয় বস্তু থেকে বঞ্চিত রাখারও প্রয়োজন পড়ে।

এই বয়োঃস্তরে যে সকল শাস্তি প্রয়োগ করা সম্ভব তা অবশ্যই শিশুর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী। চেহারার প্রফুল্লতা না রাখা অথবা তার সঙ্গে হাসি-আনন্দ পরিহার করা। তাকে উপেক্ষা করা ও তার অপর ভাই-বোনদের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা, তার সঙ্গে কথাবার্তা ও গল্প বলা বন্ধ করে দেয়া।

এ বয়োঃস্তরে এটা তাকে দৈহিক শাস্তি থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হবে। তবে শাস্তি প্রদান নিতান্ত প্রয়োজন হলে শাস্তির উপকরণ প্রকাশের সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়। যথা-লাঠি, চাবুক ও এ দ্বারা ভীতি প্রদর্শন, অতঃপর কানমলা। পক্ষান্তরে দৈহিক শাস্তির সীমা এখান থেকে অতিক্রম করে গেলে তা পরবর্তী বয়োঃস্তরের জন্য বিলম্ব করা উচিত। আর একজন অভিভাবকের কাজ হচ্ছে এগুলোর মধ্যে তাৎপর্য নির্ণয় করা ও সবগুলোর মধ্য হতে সংঘটিতব্য ভুলের জন্য উপযুক্তটা নির্বাচন করা।

একজন অভিভাবকের অসতর্কতার আশঙ্কা করে ভুলের জন্য শিশুর জবাবদিহিতা স্থগিত করা কখনোই উচিত নয়। যখন তার সকল কর্মকাণ্ড অভিভাবককে পর্যবেক্ষণ ও দেখাশুনা করতে হবে এবং শিশুটিও তা উপলব্ধি করতে পারবে। তখন এ পথ শিশুকে একটি বিপদজনক পরিণতি উপহার দেবে। কারণ শিশুর এ জাতীয় আচরণের মধ্যে দোষারোপ করার মত অথবা শাস্তিযোগ্য তেমন কিছুই নেই। অথবা ভুল সংঘটিত হলে অভিভাবক কর্তৃক স্নেহ-বাৎসল্য ও বয়সের স্বল্পতা অথবা অনুধাবন করতে পারে না দাবী করে কোন দুর্বলতা কিংবা শিথিলতা প্রদর্শনও উচিত নয়। কারণ শাস্তির উদ্দেশ্য দণ্ডবিধি কার্যকর করা নয়। বরং শিশুকে অভিযোগের ভিত্তিতে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে এক প্রকারের দিক-নির্দেশনা। কারণ এর দ্বারাই তার মন্দ কর্ম ও কথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করতে হবে। এমনকি যদি সেই দিক-নির্দেশনা কোনরূপ দৈহিক শাস্তি ব্যতীত শুধু আলোচনাই হোক না কেন।

এরূপ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ও সংঘটিত হয়েছিল। একদা হাসান বিন আলী রা. এর মুখে (যখন সে একটি ছোট শিশু) তার মা ফাতিমা রা. সাদকার একটি খেজুর দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'ছি! ছি! (যাতে সে ওটা ফেলে দেয়) তুমি কি জানো না যে, আমরা সদকার বস্তু আহার করি না?'[৪৩] অপর এক বর্ণনায় এসছে- হাসান রা. ছোট একটি শিশু যার ওপর এখনো আদেশ নিষেধের সম্বোধন আবর্তিত হয়নি ; তা সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখ থেকে খেজুরটা বের করে ফেললেন।'

ইবনে হাজার রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এখানে 'কাখ' (ছি! ছি!) শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে, যা শিশুকে কোন অবাঞ্চিত বস্তু আহার থেকে বিরত রাখতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইমাম আহ্মদ রহ. বর্ণনা করেন- 'অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসানের রা. দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, সে একটি খেজুর চিবুচ্ছে। তখন তার গাল ধরে টান দিলেন এবং বললেন- বৎস, ওটা ফেলে দাও, হে বৎস, ওটা ফেলে দাও।'

---

[৪৩] .বুখারী-১৩৯৬ , মুসলিম-১৭৭৮

এ হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় ; শিশুদেরকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া, তাদেরকে উপকারী বিষয় শিক্ষা দেয়া, ক্ষতিকারক বস্তু এবং নিষিদ্ধ বস্তু আহার হতে সংযত থাকার প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে বিরত রাখা সংগত। যদিও তারা শরিয়ত কর্তৃক আদিষ্ট নয়। এখানে নিষেধাজ্ঞার কারণও জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা ভালোমন্দ নির্ণয় করতে পারে তাদেরকে শুনানোর উদ্দেশ্যে যারা ভালোমন্দ নির্ণয় করতে পারে না তাদেরকে সম্মোধন করা। যেহেতু হাসান রা. তখন শিশু ছিলেন।

এই হাদীসটির মধ্যে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য, আর তা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান রা. কে কেবলমাত্র তার বুদ্ধিগত সামর্থের ওপর ছেড়ে দেননি। বরং তার সঙ্গে বড়দের মত সম্বোধন করে কথা বলেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তুমি কি জানো না যে, আমরা সদকার বস্তু আহার করি না?' এই পদ্ধতি একটি শিশুকে তার আত্ম-মর্যাদাবোধ উজ্জীবিত করে দেয় ও তার আত্ম-বিশ্বাসকে করে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধাজ্ঞার বিবরণ দিতে গিয়ে তাকে আহ্বান করেছেন তাঁর বাণী- 'হে বৎস,' এর দ্বারা ; আর তা হলো স্নেহ ও অনুকম্পা।

পঞ্চম অধ্যায় :

দিকনির্দেশনা ও উপদেশ

শিশুর যত্ন ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে উপস্থাপনযোগ্য অসংখ্য দিকনির্দেশনা ও উপদেশ রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের ব্যাখ্যা

শিশুর নিকট ছোট বেলা থেকেই তাওহীদের বৃহত্তর অর্থ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকা অভিভাবকের কর্তব্য। শিশুর বয়োঃপ্রাপ্তি বা বড় হওয়ার সময়ের জন্য এ বিষয়গুলো রেখে দেবে না। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তার কর্ণকুহরে এ কথার পুনরাবৃত্তি করতে হবে : 'আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আবার আমাদের জন্য আহার্যের যোগান দিয়েছেন, তার কোন অংশীদার নেই। নিশ্চয়ই তিনি মহামহিমান্বিত, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তবে সৃষ্টিকুল সকলেই তার মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তাআ'লা প্রজ্ঞাময় ন্যায়পরায়ণ, তিনি মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করেন না। ইত্যাদি বিষয়গুলো শিশুর অন্তরে গেঁথে দিতে হবে। আল্লাহ তাআ'লা'র নান্দনিক ও বিমূর্ত গুণাবলি যেমন : মহত্ব, বড়ত্ব, ক্ষমতা, শক্তি, শ্রবণ ও দৃষ্টি ইত্যাদিকে আমরা তার জন্য নিশ্চিত করি। এক্ষেত্রে তার কর্ণকুহরে কালামুল্লাহর পুনরাবৃত্তির চেয়ে অতিরিক্ত অন্য কিছুর দরকার নেই। যেখানে সান্নিবেশিত রয়েছে তার নান্দনিক গুণাবলি ও তাওহীদের ব্যাপক অর্থ। এ বিষয়ে কোন বিশ্লেষণে যাবো না, যেহেতু এগুলো হলো এমন বিষয় যার ওপর সাধারণ মানুষের স্বভাবজাত সত্তা গড়ে উঠেছে। সুতরাং এটা শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়া। এর বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই। ব্যাখ্যা অনেক পরের বিষয়। সময়ের পূর্বে ব্যাখ্যা শ্রোতাকে কখনো কখনো ভুলত্রুটির মধ্যে নিমজ্জিত করে ফেলে থাকে।

এই গুরুত্ববোধের কারণে হাদীস শরীফে এসেছে, শিশুর ভূমিষ্ট হওয়ার পর তার কানে সর্বপ্রথম তাওহীদের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করবে; যদিও সে তখন এর অর্থ বুঝতে পারবে না। উবায়দুল্লাহ বিন আবু রাফে' তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'ফাতেমা রা. যখন হযরত হাসান রা. কে প্রসব

করলেন ; তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তার কানে নামাজের আযান দিতে আমি নিজে দেখেছি।'[৪৪] আযানের সকল শব্দই তাওহীদ ও কল্যাণের দিকে উদাত্ত আহ্বান।

বর্ণিত আছে, উমার বিন আব্দুল আজিজের রহ. এর একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে তাকে একটি কাপড়ের টুকরায় ধরে ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত দিলেন এবং সেই স্থানেই তার নাম রাখলেন।'[৪৫] এটা একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে একত্ববাদের বাণী ও কল্যাণের আহ্বান শোনানোর প্রশিক্ষণ। যদি সে তার অর্থ বুঝতে নাও পারে। এটা তার-ই মত যে তার অবুঝ শিশুকে বিদেশী ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করে এ উদ্দেশ্যে যে, যদিও তার পড়াশুনার বয়স হয়নি তবুও সে ঐ স্কুলে আসা-যাওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার পরিবেশের সাথে পরিচিত হবে।

সাহসিকতায় অভ্যস্ত করা

সাহসিকতা একটি বড় গুণ। সাহসিকতার বদৌলতে অনেক দুঃসাধ্য সাধন করা সম্ভব। সে কারণে শিশুদেরকে এই বিষয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদেরকে এর প্রতি অভ্যস্ত করা উচিত। পিতা কর্তৃক তার সন্ত ানদের মধ্যে খেলাচ্ছলে পরস্পর কুস্তি লড়াইয়ের আয়োজন করতে পারেন তাদেরকে সাহসিকতায় অভ্যস্ত করার জন্য। এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে, বিষয়টা এর মধ্য দিয়ে যেন কাংক্ষিত লক্ষ্যের বাহিরে চলে না যায়।

মুহম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হাসান রা. ও হুসাইন রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মুখে কুস্তি ধরে ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে লাগলেন, 'এটা হাসান (ভাল)।' তখন ফাতেমা রা. তাঁকে বললেন- 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি হাসানের পক্ষ নিচ্ছেন? সে যেন আপনার নিকট হুসাইনের চেয়ে বেশি প্রিয়। উত্তরে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'জিব্রীল হুসাইনের রা. পক্ষ নিয়েছেন সুতরাং আমি হাসানের পক্ষ নেয়াকে পছন্দ করেছি।[৪৬]

সেই বীরত্বের প্রতিফলন যা হুসাইন রা. বর্ণনা করেন- 'একদিনের ঘটনা, যা ঘটেছিল আমিরুল মু'মিনীন উমার বিন খাত্তাবের রা. সঙ্গে যখন তিনি মুসলিম জাহানের খলিফা তখন সে ছিল বয়সে খুব ছোট। হুসাইন বিন আলী রা. বলেন, 'আমি উমরের রা. নিকট উপস্থিত হলাম তিনি তখন মিম্বরের উপরে ভাষণ দিচ্ছিলেন। অতঃপর আমি উঠে তার নিকট গিয়ে বললাম, আমার বাবার মিম্বর থেকে নেমে আপনার বাবার মিম্বরে গিয়ে বসুন!' উত্তরে উমার রা. বললেন, 'আমার বাবারতো কোন মিম্বর নেই।' এরপর আমাকে নিয়ে তার সঙ্গে বসালেন অথচ আমি তখনোও হাতের মধ্যে পাথরের টুকরা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। অতঃপর তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করে আমাকে নিয়ে তার গৃহে চলে গেলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, 'তোমাকে এটা কে শিখিয়েছে ?' আমি তাকে বললাম, 'আল্লাহর শপথ আমাকে কেউ শেখায়নি।' তিনি বললেন, 'আমার পিতা উৎসর্গ হোক! তুমি চাইলে আমাকে ঢেকে ফেলতে পারতে।' হাসান রা. আরো বলেন, 'আমি উমার বিন খাত্তাব রা. এর নিকট এসেছি, যখন তিনি মুয়া'বিয়া ও ইবনে উমার -কে নিয়ে দরজায় নির্জনে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর ইবনে উমার রা. তথা হতে প্রত্যাগমন করলেন আমিও তার সঙ্গে ফিরে গেলাম। এর কিছুদিন পর তাঁর (উমার রা.) সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলে তিনি আমাকে বললেন, 'তোমাকে দেখিনা কেন?' আমি বললাম, 'হে আমিরুল মু'মিনীন,

---

[৪৪]. সুনানে আবি দাউদ-৪/৩২৮

[৪৫] .মুসান্নাআফে আব্দুর রাজ্জাক-৩/৩৩৬

[৪৬] .মুসনাদে হারেছ, যাওয়ায়েদুল হাইছামি-২/৯১০

আমি তো আপনার কাছে এসেই দেখি আপনি মুআ’বিয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে আছেন। সে কারণে আমি ইবনে উমরের রা. সঙ্গে ফিরে যাই। অতঃপর তিনি বললেন, ‘ইবনে উমার রা. অপেক্ষা তোমার প্রবেশাধিকার অগ্রগণ্য। তুমি আমাদের মস্তিষ্কে যা দেখছো তা রোপন করেছে আল্লাহ তাআ’লা, এরপর তোমরা।[৪৭]

অভিভাবকের প্রতি শিশুর ভালোবাসাকে তার সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খবরদারী করা ও তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণের ধারক হিসেবে গণ্য করা ঠিক হবে না। তাকে এমন বিষয় ভীতি প্রদর্শন করা যা তাকে হত্যা করে ফেলবে অথবা এই চরিত্রটি তার মধ্যে আসার পর খুব তাড়াতাড়ি মানসিকভাবে তাকে দুর্বল করে ফেলবে। অতঃপর কোন উদ্ভূত পরিস্থিতির মুখোমুখী হলে সে আর শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে না। অথবা কোন বিশুদ্ধ বস্তু দিয়ে তাকে ভীতি প্রদর্শন করা, যাতে প্রকৃতপক্ষে কোন ভীতি বা আশঙ্কার উদ্রেক না হয়। তাহলে এর বিপরীতে তার নিকট নেতিবাচক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হবে।

অতএব কখনোই শিক্ষক, চিকিৎসক ও পুলিশের লোক ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুকে ভীতি প্রদর্শন করা উচিত নয়। কারণ এটা তাকে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গকে অপছন্দ ও তাদের কর্মসমূহকে ঘৃণা করতে উদ্যত করবে। যেমনিভাবে তাকে উদাহরণ স্বরূপ; বিপদ-মৃত্যু, ভূত-প্রেত অথবা চোর-ডাকাতের ভয় দেখানো উচিত নয় যা তার মধ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলে থাকবে। ফলে সে অপরিচিত স্থান অনুসন্ধান করার সাহস হারাবে, অথবা অন্ধকারের ভয় দেখানো হলে অন্ধকার স্থান অতিক্রম করার শক্তি পাবে না ইত্যাদি। আমার এ কথার অর্থ এই নয় যে, বাস্তবিকই যেখানে বিপদাশঙ্কা রয়েছে সেক্ষেত্রেও শিশুকে সতর্ক করা যাবে না অথবা বিপদের সকল উপকরণ উপস্থিত হওয়ার পরও তা হতে তাকে বিরত রাখা যাবে না। কেবলমাত্র ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন যা তাকে মিথ্যা বলতে প্ররোচিত করবে অথবা কোন বিষয় সম্পর্কে ভীতিপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে স্পষ্ট মিথ্যা বলা- বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই- নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘যখন রাতের আঁধার নামে অথবা রজনী ডানা মেলে দেয়, তোমাদের বাচ্চাদেরকে তোমরা প্রত্যাহার করে নাও! কারণ শয়তানের দল তখন ছড়িয়ে পড়ে। এরপর যখন রাতের একটা অংশ অতিবাহিত হয় তখন তাদেরকে ছেড়ে দাও!’[৪৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বানী- ‘যখন রাতের অন্ধকার নামে বা রাত ডানা মেলে দেয়।’ অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর রাতের আগমন। তাঁর বাণী-‘তোমাদের বাচ্চাদের প্রত্যহার করে নাও!’ অর্থাৎ এ সময়টায় তাদের বের হতে বারণ কর।

ইবনে হাজার রহ. বলেন, ‘ইবনুল জাওযী রহ. বলেছেন, ‘ঐ সময়টায় শিশুদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। কারণ শয়তানের দল যে অপবিত্রতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে সাধারতঃ ঐ সময় তা তাদের সঙ্গে বিদ্যমান থাকে। যে সকল যিকির আযকার এর থেকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম তা সাধারণত শিশুদের জানা থাকে না। আর শয়তানের দলতো ছড়িয়ে পড়ার সময় যাকে পায় তার সঙ্গেই সম্পর্ক গড়ে নেয়। সে কারণে ঐ সময়ে বাচ্চাদের ব্যাপারে ভয় করা হয়েছে।’[৪৯]

মনের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় বপণ করা :

শিশুর কর্মসম্পাদনের সুপ্তসামর্থ ও নির্বাচন ক্ষমতার উপলব্ধি প্রয়োজন। এটা শিশুর লুক্কায়িত ভালো বিষয়সমূহের অন্যতম। সুতরাং এ বিষয়ে অভিভাবকের কোনরূপ দুশ্চিন্তা অনুভব করার প্রয়োজন নেই।

[৪৭]. আল-এসাবাহ-২/৭৮

[৪৮]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ্ , বুখারী-৩০৩৭, মুসলিম-৩৭৫৬

[৪৯].ফাতহুল বারী-৬/৪৩১

বরং শিশুর শক্তি ও সামর্থের অন্তর্ভুক্ত কাজগুলোর দায়িত্ব যদি তাকে প্রদান করে এর জন্য যদি সময়ও নির্ধারণ করে দেয়া হয় তাহলে দেখা যাবে এর মধ্য দিয়ে তার প্রতি অভিভাবক বা শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে ও নিজের সম্পর্কে একটা ইতিবাচক চিত্র তার হৃদয়ে ফুটে উঠবে। কিন্তু শিশু অধিকাংশ সময় নিজে নিজেই কার্যকর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়। যেমন : সে কখনো এমন পণ্য সামগ্রী নিয়ে খেলাধুলা করে যার মধ্যে কখনো বা বিপদাশঙ্কাও থাকতে পারে। কাজেই সার্বক্ষণিক তাকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

বিপদের ধরনটা এমনও হতে পারে যে সম্পর্কে পূর্ব থেকে তাকে সতর্ক করা অথবা কোন রকম সমস্যা সৃষ্টি না করে যার ক্ষয়-ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া সম্ভব। এ জাতীয় প্রেক্ষাপটে তাকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে ছেড়ে দিন। কারণ এটা 'এ জাতীয় কর্ম সম্পাদনের সামর্থ তার রয়েছে' নিজের প্রতি এই আস্থা স্থাপন ও তাকে আত্মপ্রত্যয়ী হতে সাহায্য করবে। মূলকথা তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল অভিভাবক কর্তৃক প্রদত্ত অসংখ্য আলোচনা ও দিকনির্দেশনা থেকে শ্রেয়।

উদাহরণ স্বরূপ : কখনোবা শিশু গর্ত থেকে কাঠ উঠিয়ে নিয়ে তা প্রজ্জ্বলিত করার সংকল্প করে বসে। কখনো বা তাকে আপনার প্রতিরোধ করার প্রয়াস তাকে ঐ কাজের প্রতি আরো বেশি উৎসাহ সৃষ্টি করে থাকবে। অতএব আপনি যদি তাকে ছেড়ে দেন এবং সে যা করতে চায় তা আপনার তত্ত্বাবধানে করতে থাকে। এক্ষেত্রে যদি সে সফল হয় তাহলে তার মনের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হবে। তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে নতুন বিষয় সংযোজিত হবে। যদি উক্ত কাঠটি প্রজ্জলিত করার সময় তাকে ঝলসে দেয় অথবা দগ্ধ করে ফেলে, তথাপি তার এ কর্ম সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে নতুন এক অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে যা তাকে অদূর ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর সফলতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করবে। অথবা এটা অভিভাবকের অবর্তমানেও উক্ত অভিজ্ঞতা দ্বিতীয়বার বাস্তবায়ন করা হতে তাকে নিরুৎসাহিত করতে সহায়ক হবে।

এটা ও পূর্বেরটার মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, আপনি হলেন দাবী উত্থাপনকারী- হে অভিভাবক, আপনি এমন কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করবেন না যাতে সে আপনার অনুসরণ করতে না পারে। আর দ্বিতীয়টি হলো সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সেটা সম্পন্ন করার চেষ্টা করবে। সে কারণে উভয় অবস্থার বিচিত্রতার দরুণ দিক-নির্দেশনাও বিভিন্ন রকম হয়েছে। ঝলসে যাওয়ার কারণে যে সকল প্রতিক্রিয়া আবর্তিত হয় যা শিশুর জন্য অপূরণীয় ক্ষতির কারণ। সুতরাং শিশুকে এক্ষেত্রে ছাড় দেয়া যাবে না।

প্রতিপালনের অনুকূল সময় নির্বাচন ও ধীরতা অবলম্বন :

শিশুকে অনেক বিষয় শিক্ষাদান অভিভাবকের কর্তব্য; তাদেরকে শিক্ষা দিবেন কয়েকটি নান্দনিক চরিত্র ও সুন্দরতম শিষ্টাচার। কিন্তু সেটা যেন তাকে কোনভাবেই তালীম তরবিয়তের মধ্যে বিদ্যমান যোগসূত্রকে অবমূল্যায়ন অথবা এক্ষেত্রে একটার পর অন্যটা সম্পন্ন করতে হবে এরকম ক্রমানুবর্তিতা অবলম্বনে বাধ্য করা উচিত হবে না। তাহলে এর তুলনা হবে সেই ব্যক্তির সঙ্গে যে নিজের ওপর একটি গুরুদায়িত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছে অথচ তার কষ্ট থেকে সে একসঙ্গে পরিত্রাণ পেতে চায়। বরং এর জন্য উপযুক্ত সময় ও পাত্র মনোনীত করে পর্যায়ক্রমে এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনই হলো তার কর্তব্য।

ধরুন আপনি একটি শিশুকে আহারের শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে চান - অপরিচ্ছন্ন হাত ধোয়া, আহার্য গ্রহণের প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ বলা, ডান হাত দিয়ে ও তার নিকটস্থ খাদ্য হতে আহার্য গ্রহণ, পাত্রের মধ্যখান থেকে নয় একপার্শ্ব থেকে আহার করা, অপরের পূর্বে খাদ্যের প্রতি অগ্রসর না হওয়া, আহার্য ও ভক্ষণকারীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না তাকানো ; খাদ্য গ্রহণে তাড়াহুড়া না করা, আহার্য উত্তমরূপে চিবানো, বিরতিহীনভাবে খাবার গ্রহণ না করা, হাত ও কাপড়ে না লাগানো এবং পানাহারান্তে আহার্যদাতা আল্লাহ তাআ'লার প্রশংসা করা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে তার ও আপনার নিজের খাদ্য গ্রহণ শুরুর ঠিক পূর্ব

মুহূর্তে এ শিক্ষা প্রদান করা। এগুলো সব একসঙ্গে তার ওপর আরোপ করবেন না। খাদ্যে প্রতিটি প্রকরণে তার সঙ্গে এর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা, তাহলে সে বিরক্ত কিংবা ক্লান্ত হবে না। এমনি করে এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। শিশুকে আহার্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখবে যতক্ষণ সে এর অনুশীলন না করছে। যে বিসমিল্লাহ না বলে আহার করে শয়তান তার নিকট এসে তার সঙ্গে আহার করতে সক্ষম হয়।[৫০]

এমনিভাবে নিদ্রাগমনের শিষ্টাচার শিক্ষা দিবেন। ঘুমের ইচ্ছা অথবা নিদ্রাগমনের সময় নিকটবর্তী হলে তাদেরকে একটি মাত্র শিষ্টাচার শিক্ষাদানের মাধ্যমে আরম্ভ করবেন। যাতে তারা তৃপ্ত হয় একাধিক শিষ্টাচার থেকে যার ওপর তারা পরে অভ্যস্ত হয়ে থাকবে। তাদেরকে উক্ত শিষ্টাচারটি শিক্ষা দেয়ার পর অপর শিষ্টাচার শিক্ষাদানে পর্যায়ক্রমে মনোনিবেশ করবেন। এভাবে এই ধারা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে। একপর্যায়ে তার জ্ঞাত সকল শিষ্টাচার তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারবেন যা তারা অনুশীলন করবে। তবে কখনো ঐগুলোও সব তাদেরকে একবারে শিক্ষা দেয়ার প্রয়াস চালানো যাবে না। কারণ তাহলে তারা কখনো তা স্মরণ রাখতে ও ধারণ করতে পারবে না। আমলবিহীন ইলম নয়, অনুশীলনই হলো প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণের আসল উদ্দেশ্য। যদি তারা এর মধ্যে যে কোনভাবে একবারে গ্রহণ করেও থাকে, তাহলে আবার তা একবারে পরিত্যাগ করার আশঙ্কাও রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত দোয়াগুলো নির্বাচন করা যেতে পারে যা সহজে মুখস্ত করা যায়।

কৌতুক, রসিকতা ও বিনোদন :

ভালোবাসা ও মমতায় ভরা পারিবারিক পরিবেশের উপলব্ধি শিশুর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু কথায় নয়, বাস্তব কাজ-কর্মে, আচার-আচরণে এর প্রমাণ থাকতে হবে। কাজেই শিশুর সঙ্গে রসিকতা ও কৌতুক এবং তার নিকট বিনোদনমুখর পরিবেশ তৈরী করা অভিভাবকের কাছে একান্তভাবে কাম্য। তার অবস্থাবলি ও খেলাধুলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদও এর অন্তর্ভুক্ত। আপনি যেন একজন বড় মানুষের সঙ্গে আলোচনা করছেন, তাকে এভাবে সম্বোধন করা। যেমন- আপনি যেন তাকে বলছেন, 'হে অমুকের বাপ, তুমি কেমন আছো ?' অথবা হে অমুকের মা, ইত্যাদি।

আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে কৌতুকচ্ছলে আমার ছোট ভাইকে বললেন, 'হে আবু ওমায়ের, (নুগায়ের) কি করে ?'[৫১] আবু ওমায়ের রা. তখন সবেমাত্র দুগ্ধপান ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গে রসিকতা করলেন ও তাকে হাসালেন। যেমন অপর বর্ণনায় এসছে 'এবং তাকে নুগায়ের সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। ইবনে হাজার রহ. বলেন, 'এখানে কৌতুক ও রসিকতার পুনরাবৃত্তির অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ বৈধতা কোন ছাড় নয় বরং এটা সুন্নত। যে শিশু ভালোমন্দ নির্ণয় করতে পারে না তার সঙ্গেও রসিকতা বৈধ।[৫২]

উম্মে খালেদ বিনতে খালেদ রা. থেকে বর্ণিত, 'একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কিছু কাপড় আসল যার মধ্যে কালো রংয়ের ছোট একটি কাপড়ও ছিল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা কী বলো, এটা কাকে পরিধান করাবো? তখন সকলে চুপ থাকলো। 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উম্মে খালেদকে আমার নিকট নিয়ে এসো! তাকে

---

[৫০] .মুসলিম-৩৭৬১ , আবু দাউদ-৩২৭৪

[৫১] .বুখারী-৫৬৬৪ , نغير হচ্ছে ছোট্র পাখি , একবচন نغرة

[৫২] .ফাতহুল বারী-১০/৫৮৪

উঠিয়ে নিয়ে আসা হলো। এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত কাপড়ের টুকরোটি হাতে নিয়ে তাকে পড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা তুমি ব্যবহার করে পুরাতন করে ফেল।' সেই কাপড়টির মধ্যে হলুদ অথবা সবুজ চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'হে খালেদের মা, এটা হলো ইথিওপিয়ানদের জাতীয় প্রতীক, আর তাদের প্রতীক সুন্দর।'[৫৩] অতএব এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'খালেদের মা' বলে তাকে সম্মোধন করেছেন। অথচ সে ছিল তখন এক খুকী ; এবং তাকে ইথিওপিয়ার ভাষায় সম্মোধন করেছিলেন। যেহেতু ইথিওপিয়া থেকে হিজরত করে আগমনকারী মুহাজিরদের মধ্যে সেও ছিল।

ছোট শিশুর সঙ্গে রসিকতার ক্ষেত্র এর চেয়ে আরো অনেক দূরে চলে গেছে। আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ বিন হাদ রা. তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট দ্বিপ্রহরের কোন এক নামাজ যোহর অথবা আছরের জন্য তাঁর কোন এক নাতী হাসান অথবা হুসাইনকে কোলে নিয়ে বের হলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমামতির জন্য আগে চলে গেলেন ও তাকে তাঁর ডান পায়ের নিকট রাখলেন; এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লম্বা সিজদাহ করলেন। আমার পিতা (শাদ্দাদ) বলেন, 'মুসল্লীদের মধ্য হতে শুধুমাত্র আমি মাথা উত্তোলন করে দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখনো সিজদারত আছেন এবং বাচ্চাটি তাঁর পিঠের ওপর চড়ে আছে। তিনি গুনে গুনে আরো কয়েকটি সিজদা করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ সমাপ্ত করলে লোকজন বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আজ নামাজে একটি এমন সিজদা করলেন যা

ইতিপূর্বে আর কখনো করেননি। আপনাকে কি কোন নতুন বিষয়ের নির্দেশ কিংবা আপনাকে প্রত্যদেশ করা হয়েছে ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এর কোনটাই হয়নি, কিন্তু আমার নাতী আমার ওপর আরোহন করেছে, তাই আমি তার প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তাড়াহুড়া পছন্দ করিনি।'[৫৪]

তিনি বললেন, আমাকে যেন একটি বাহন বানিয়ে আমার পিঠে সে আরোহন করেছে। আয়েশা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বিবাহের শুভলগ্নে তার একটি থলে সাথে করে রেখে দিয়ে তা নিয়ে খেলা করছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর বান্ধবীরাও ছিল।[৫৫] আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আর একটি হাদীসে তিনি বলেন, 'একদা আমার ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবেশ করলেন, তখন আমি খেলনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্দা উঠালেন। বললেন, 'হে আয়েশা, এটা কি ?' তখন আমি বললাম, 'এটা খেলনা হে আল্লাহর রাসূল, আবার তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে আমি ওটা কি দেখছি ?' উত্তরে আমি বললাম, ঘোড়া হে আল্লাহর রাসূল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'কাপড়ের একটি ঘোড়া তার আবার ডানাও আছে। আয়েশা রা. বলেন, 'আমি এর উত্তরে বললাম, 'নবী সুলাইমান বিন দাউদের ঘোড়ার কি অসংখ্য ডানা ছিলো না? উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে দিলেন।'[৫৬] সে কারণে সাইয়্যেদা আয়েশা রা. বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ চাদর দ্বারা আমাকে

---

[৫৩] . বুখারী-৫৩৭৫

[৫৪] . মুস্তাদরেকে হাকেম-৩/১৮১

[৫৫] .বুখারী-৩৬০৫, মুসলিম-২৫৪৭

[৫৬].ইবনে হিব্বান-১৩/১৭৪

আড়াল করে রাখতেন আর আমি মসজিদের মধ্যে কাফ্রিদের খেলাধুলা উপভোগ করতাম। দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত হয়ে যেতাম। কাজেই তোমরা ক্রীড়ামোদী কিশোরীদের খেলাধুলার প্রতি দৃষ্টি দেবে।'[৫৭]

অতএব শিশুর সঙ্গে এ জাতীয় খেলাধুলা ও কৌতুক রসিকতা করা অভিভাবকের কর্তব্য। এক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই সমান। শিশুর জন্য একটি অবসর রেখে দেয়া যেখানে সে নিজে খেলাধুলা ও শরীর চর্চা করতে পারে, যাতে তার বিষণ্নতা দূর হয়। ফিরে আসে উদ্যম। মুসলমানদের জাতীয় উৎসবগুলোতে বিষয়টা নিশ্চিতভাবে ফুটে উঠে। তবে খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ রাখতে হবে, এ খেলাধুলার মধ্যে যেন শরিয়ত পরিপন্থী কোন বিষয় লুকিয়ে না থাকে। মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'প্রতিটি জুয়া সুদ, এমনকি বাচ্চাদের আখরোট নিয়ে খেলা করাটাও।'[৫৮]

ইবনু আবি শাইবাহ রহ. হাম্মাদ বিন নুযাইদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন, 'আমি ইবনে সিরীন রহ. কে দেখেছি ঈদের দিন মারবাদ নামক স্থানে একদল বালকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যারা তখন বাদাম নিয়ে জুয়া খেলায় নিমগ্ন ছিলো। অতঃপর তিনি বললেন, হে বালকগণ, তোমরা জুয়া খেলো না, কারণ জুয়া হচ্ছে সুদ।'[৫৯] শিশু ও বালকদের ওপর এই বয়সে কলম চালু হয়নি সত্য কথা। কিন্তু এর অর্থ কখনোই এটা নয় যে, তাদেরকে শরিয়ত পরিপন্থী বিষয় থেকেও নিষেধ করা যাবে না। সেটা এ জন্যে যে, যাতে তারা উক্ত কাজে অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে ও পরিণত বয়সে তা পরিত্যাগ করতে তাদের জন্য অনেক কষ্ট না হয়। ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, 'শিশু যদিও আদিষ্ট নয়, কিন্তু তার অভিভাবকতো অবশ্যই আদিষ্ট। তার জন্য শিশুকে নিষিদ্ধ কাজের সুযোগ দেয়া বৈধ নয়, কারণ সে তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে ফলে পরে তার থেকে তা ছাড়ানো কঠিন হয়ে যাবে। এটা হলো জ্ঞানীদের সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ মত।[৬০]

শিশুর পছন্দনীয় খেলার প্রতি তার আগ্রহেরও মূল্যায়ন করতে হবে। সুতরাং তার ওপর এমন খেলা চাপিয়ে দেবেন না যা সে পছন্দ করে না। এমনিভাবে তার পছন্দনীয় খেলা থেকে তাকে নিষেধ করা যাবে না ; বিশেষ করে যদি সেটা খেলাধুলার জন্য নির্ধারিত করা হয়।

শিশুর প্রয়োজনে সাড়া দেয়া :

শিশুর রকমফের প্রত্যাশা থাকে যা সে অর্জন করতে চায়। সেখান থেকে কয়েকটা বিষয় এমনও রয়েছে যা গ্রহণযোগ্য প্রয়োজন হিসেবে বিবেচিত। যেমন : তার খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, তাকে গুরুত্ব প্রদান ও মূল্যায়নের অনুভূতি, তার প্রতি অনুগ্রহ ও পারিবারিক ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ ইত্যাদির সংস্থান। শিশুর এ সকল প্রয়োজনে সাড়া দেয়া ও তা পূরণে সচেষ্ট হওয়া উচিত। অনেক বিষয় এমন আছে যা গ্রহণযোগ্য নয়, যেমন : পূর্বে উল্লেখিত বিষয়ে অতিরঞ্জন যা ভারসাম্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। আর কিছু বিষয় আছে যা শুধু উত্তমের পরিপন্থী অথবা অশোভন এর পর্যায় পড়ে। অতএব অভিভাবককে সকল প্রয়োজনের সঙ্গে একই ধরনের আচরণ করা অথবা সেটা গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে একই পথে চলা উচিত হবে না। বরং প্রত্যেকটাকে তার উপযুক্ত স্থানে রাখতে হবে।

---

[৫৭] .বুখারী-৪৮৩৫ ,মুসলিম-১৪৮১

[৫৮] . তাফসীরে তাবারী-২/৩৫৭

[৫৯] .মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ-৫/২৮৮

[৬০] .তুহফাতুল মওদুদ ফি আহকামিল মওলুদ-২৪৩

উক্ত প্রয়োজনাবলির বিভিন্ন রকমের সাড়া শিশুর নিকট বিষয়গুলোর শুদ্ধাশুদ্ধের ইঙ্গিতবাহী হবে ; যার কিছু হবে প্রশংসনীয় আর কিছু হবে দোষণীয়। তার প্রতিটি আবেদনে সাড়া দেয়াও উচিত হবে না। বিশেষ করে যেটা শরিয়তের দৃষ্টিতে ত্রুটিযুক্ত যার মধ্যে শিশুর ক্ষতি নিহিত আছে ও পার্থিব দিক থেকে শিশুর কাঁধকে ভারী করে দেবে। এ প্রেক্ষিতে শিশুকে কোন রকমের ক্রোধ প্রদর্শন, গালি ও প্রহার ইত্যাদি (যা অধিকাংশ অভিভাবক করে থাকেন বিশেষ করে শিশুর কঠিন জিদের সময়) না করে তাকে সঠিক পথের দিশা দিতে হবে।

একাধিক সন্তান থাকলে তাদের মধ্যে সমতা বিধান করা :

লিঙ্গের কারণে শিশুদের মধ্যে পার্থক্য না করা প্রতিপালনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আচার-ব্যবহার অথবা দানের ক্ষেত্রে ছেলেকে মেয়ের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়, এটা ঠিক নয়। অথবা মেয়ের তুলনায় ছেলের যত্ন ও বিকাশের দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ এসবই অবিচার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেছিলেন যে তার এক সন্তানকে বিশেষভাবে সম্পদ দান করেছিল, 'তোমার প্রত্যেকটি সন্তানকে কি তার মত দান করেছো ?' সে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তাহলে এটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও!'[৬১] অন্য বর্ণনায় এসছে– 'এ ছাড়া তোমার কি আর কোন সন্তান আছে ?' সে বলল, হ্যাঁ ; অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন- 'তাদের প্রত্যেককে কি তুমি এর মত দান করেছো ?' সে বলল- না। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে আমাকে সাক্ষী বানিও না। কারণ আমি অন্যায়ের সাক্ষ্য দেই না।'[৬২] সন্তান-সন্ততির মধ্যে সমতা বিধানের ক্ষেত্রে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান কর! তোমরা তোমাদের সন্তানদের প্রতি ন্যায়বিচার কর!'[৬৩]

একই লিঙ্গের সকল ব্যক্তির মধ্যে সমতা বিধানের ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া উচিত, যেমনিভাবে এক সন্তানকে অপর সন্তানের চেয়ে অতি বেশি গুরুত্ব না দেয়া উচিত। অথবা অতিরিক্ত ভালবাসা প্রকাশ করা উচিত নয়। যেমন সায়্যেদুনা হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা। তাঁকে অন্য সন্তানদের তুলনায় তার পিতা অপেক্ষাকৃত বেশি ভালোবাসার কারণে অন্য ভাইয়েরা তার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছিলেন। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন-

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا......(يوسف-8)

'ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয়.......।'[৬৪]

অতঃপর তাদের বাবাকেই তারা একথা বলে অপবাদ দিলো-

إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. (يوسف-8)

'নিশ্চয়ই আমাদের পিতা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করছেন।'[৬৫]

---

[৬১] .বুখারী-২৩৯৭

[৬২]. মুসলিম : ৩০৫৬

[৬৩]. আবু দাউদ : ৩০৭৭ , সন্তান বলতে ছেলে মেয়ে উভয়কে বুঝায়।

[৬৪]. সুরা ইউসুফ : ৮

[৬৫]. সুরা ইউসুফ : ৮

এরপর তারা সমস্যার সমাধান চেয়েছেন একথা বলে –

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِين. (يوسف-9)

'তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোন স্থানে ফেলে আস, ফলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হবে এবং তার পর তোমরা ভালো লোক হয়ে যাবে।'[৬৬] সুতরাং সকলকে রেখে বিশেষ কোন সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ও গুরুত্বারোপ হিংসা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয় যা তাদের কাউকে সেই প্রাধান্যপ্রাপ্ত সন্তানের বিরুদ্ধে চক্রান্তকরতে পর্যন্তউদ্যত করে থাকে। যাতে হিংসার যন্ত্রনা থেকে তারা পরিত্রাণ পেতে পারে। তবে কখনো কখনো এই প্রাধান্যদানের ক্ষেত্রে বাবার পক্ষ থেকে সত্যিকারার্থে অসংখ্য বৈধ কারণও থাকতে পারে। কিন্তু সন্তানরা সাধারণত তা ঝুঝতে পারে না। কাংক্ষিত সমতাবিধান পার্থিব বিষয়াদিতে অসম্ভব নয়, কিন্তু বিষয়টা হলো অপার্থিব বিষয়গুলোর মধ্যে তা সীমা অতিক্রম করে যায়। যেমন : চেহারার প্রফুল্লতা, স্নেহেরদৃষ্টি ও স্মিতহাসি এমনকি তার আদিষ্ট কর্মসমূহ ও শিশুদের পার্থিব অপার্থিব সকল চাহিদার সুষম বণ্টন। অভিভাবক কর্তৃক শিশুদের মধ্যে সমতা বিধান তাদেরকে পরস্পরে এই নান্দনিক চরিত্র মাধুর্য বিতরণে উদ্বুদ্ধ করবে।

শিশুদের মাঝে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান :

এমন কোন স্থান বা ঘর নেই যেখানে শিশুদের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি হয় না। কখনো দুই বা ততোধিক ভাই একে অপরের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে, যেমনিভাবে ভাই ও বোনের সঙ্গে বিরোধ হয়ে থাকে ইত্যাদি। অনেক অভিভাবক আছেন এক্ষেত্রে প্রথম বারেই আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা, কঠোরতা ও অবয়ব বিকৃত করে চিৎকার করার দ্বারা ত্বরিত হস্তক্ষেপ করতে তৎপর হয়ে থাকেন। কারণ দ্রুত সন্দেহ নিরসনের বাসনা তার মধ্যে তখন জেঁকে বসে। এখন তার একটাই চিন্তা হয়ে গেছে, তাহলো সকল আওয়াজ নিস্তব্ধ করে দেয়া। যদিও এর একটা ভাল দিকও আছে, কিন্তু তারপরও সমস্যার পূর্ণ সমাধানে তা সহায়ক নয়। বরং অভিভাবক তাদের পর্যবেক্ষণ থেকে অনুপস্থিত থাকে তখন যে কোন সময় পুনরায় সেই লেজকাটা সমস্যাটি মাথাচারা দিয়ে উঠার আশঙ্কা রয়েই যায়। সুতরাং মূল সমস্যা ও তা মূলোৎপাটনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত না হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা সমাধানে অভিভাবকের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তবে তিনি যদি সামান্য সুযোগ দিতে পারেন ও যখন অপেক্ষা করলে কোন বিপদাশঙ্কাও না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কোন হস্তক্ষেপ না করে বরং দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকবেন। ফলে তিনি দেখতে পারবেন, কিভাবে শিশুরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করে থাকে ও এ পর্যায়ে তাদের সামর্থ সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন। ফলে অভিভাবকের জন্য এ জাতীয় সতর্ক পদক্ষেপ হবে যেন একটি খোলা জানালা ; যেখান থেকে তিনি শিশুর চরিত্র, আচরণ ও সামর্থসমূহ দেখতে পারবেন। কিন্তু বিষয়টি যখন হস্তক্ষেপের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে, সেখানে অপেক্ষা করার কোন সুযোগ নেই, তখন তাৎক্ষণিকভাবে হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য।

কিন্তু কখনো ঘটনা এমনও ঘটে যেতে পারে যে, একপক্ষ এসে আপনার নিকট অপর পক্ষের বিরুদ্ধে আপনার সাহায্য ও সমর্থন চাইবে। তখন যদি সে অত্যাচারিত না হয়ে থাকে তাহলে তাকে সহায়তা প্রদান আপনার উচিত হবে না। এতটুকু বিবেচনা ব্যতিরেকে তাকে সাহায্য করলে অন্যরা মনে করবে আপনি একজন অত্যাচারী। আপনি সন্তানদের মধ্যে একজনের তুলনায় অন্যজনকে বেশি ভালোবাসেন।

---

৩. সুরা ইউসুফ , আয়াত-৯

পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে, আপনি একজনকে সাহায্য করলেন, আর অপরজন মনে করল আপনি তার প্রতি অবিচার করেছেন। তাহলে সে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়ে আপনাকে বলবে, 'আপনি আমার প্রতি অবিচার করেছেন।' এহেন পরিস্থিতিতে শুধু ঐ কথাটার জন্য এই ভিত্তিতে শাস্তি দেয়া যাবে না যে, সে বেয়াদবী করেছে। বরং এক্ষেত্রে হৃদয়ের উ'তা দিয়ে কথাটা গ্রহণ করা অভিভাবকের কর্তব্য ও তাকে স্পষ্ট করে দিতে হবে যে, আপনি তার প্রতি কোন অবিচার করেননি। আর এটাই হলো মার্জিত সমাধান। এ প্রসঙ্গে আপনার নিকট বিদ্যমান প্রমাণগুলো পেশ করতে পারেন। শিশুকে প্রহার করা বা শাস্তি দেয়া অভিভাবকের কর্মের ওপর তার সিদ্ধান্ত টলাতে পারবে না। পক্ষান্তরে তথ্য প্রমাণসহ বিবরণ সত্যটাকে ফুটিয়ে তুলতে ও অভিভাবকের পদক্ষেপে তাকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হবে। উপরন্তু তার অন্তরে 'অত্যাচারিতকে সাহায্য করা উচিত' এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিতে পারে।

সুন্দরতম শব্দাবলীর ব্যবহার :

শিশুরাতো অবাঞ্ছিত কর্মকাণ্ড করতেই পারে। তাদের এই প্রবণতা কখনো বা অভিভাবকদের বিশ্রী শব্দাবলী প্রয়োগে শিশুদের গালি দিতে উদ্যত করে থাকে। যেমন : অভিসম্পাত করা অথবা কোন ইতর প্রাণীর নামে তাকে অভিষিক্ত করা ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে এ আচরণটি নিঃসন্দেহে শিশুর মনের মধ্যে অবিলম্বে স্থান করে নেবে। এর ফলে সে তার ভাই-বোন ও সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করতে প্রয়াস পাবে।

'এটা বলো না ! এটা বলো না!' একথা শতবার বলার চেয়ে আমাদের জন্য উত্তম ও কর্তব্য হলো এই শব্দগুলো যা থেকে আমরা শিশুদেরকে নিষেধ করি, সেগুলোকে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ না করা। অভিভাবক শিশুর ওপর ক্রোধান্বিত হলে তাকে গালি বা অভিশাপ দেয়ার স্থলে বলতে পারেন- আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে সংশোধন করুন অথবা আল্লাহ তাআ'লা তোমার প্রতি দয়া করুন ইত্যাদি।

উম্মুল ফজল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি একদিন স্বপ্নে দেখলাম আমার গৃহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীরের একটি অংশ পড়ে আছে। আমি এ দেখে অস্থির হয়ে গেলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে স্বপ্নের বিবরণ দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'ভাল! শীঘ্রই ফাতেমা'র একটি নবজাতক জন্ম নেবে, তোমার ছেলে 'কুছুম' এর সঙ্গে তার দুগ্ধপানের দায়িত্ব তোমার ওপর থাকবে।' তিনি(উম্মুল ফজল) বলেন, 'অবশেষে হাসান রা. জন্ম গ্রহণ করলো ও কথামত তার দুগ্ধপানের দায়িত্ব আমাকেই দেয়া হলো। এরপর তাকে আমি দুগ্ধ পান করালাম হাঁটা-চলা করা অথবা দুধ ছাড়া পর্যন্ত। অতঃপর হাসান রা. কে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হই এবং তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোলে বসিয়ে দেই। তখন সে প্রশ্রাব করে দেয়; তখন আমি তার দুই কাঁধের মাঝখানে আঘাত করি। এবার তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে ছেলে, দয়াশীল হও, আল্লাহ তাআ'লা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন অথবা তোমাকে সংশোধন করে দিন।' এরপর আমাকে বললেন, 'তুমি আমার নাতীকে ব্যথা দিতে পারলে !' তিনি (উম্মুল ফজল) বলেন, 'তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার এই কাপড়টি খুলে অন্য একটি কাপড় পরিধান করে নিন যাতে আমি এটা ধুইয়ে দিতে পারি।' এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'কন্যা শিশুদের প্রশ্রাব ধৌত করতে হয় আর ছেলে শিশুদের প্রশ্রাবে শুধু পানির ছিটা দিলেই যথেষ্ট।'[৬৭] মোদ্দা কথা অভিভাবকের এই দোয়া কখনো বা আল্লাহ তাআ'লা কবুল করে নিলে তা

---

[৬৭]. মুসনাদে আহমদ : ২৫৬৪১

সন্তানের জন্য মঙ্গলই হবে। আর ছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে তো শিশু নিজে এটা শিখতে পারবে যে, এজাতীয় পরিস্থিতিতে তাকে কি করতে হবে।

এমনিভাবে তাকে অভ্যস্ত করতে হবে, কিভাবে নান্দনিক শব্দাবলি প্রয়োগে তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড়দের সঙ্গে কথা বলতে ও সম্মান জনক উপাধিতে তাদেরকে ডাকতে হয়। যেমন : জনাব, উস্তাদ, শায়খ ও কাকা ইত্যাদি। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, অনেক ছোট শিশু কোন বড় ব্যক্তিকে তার নাম ধরে ডাক দিয়ে বলছে : হে অমুক, একটি শিশু এর গুরুত্ব কি করে বুঝতে পারবে? এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দোষ অভিভাবকের, শিশুর নয়। কারণ তিনিই সময়মত তাকে এ বিষয়ে দিকনির্শেনা দেননি।

শিশুর চরিত্র সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন :

শিশুর মধ্যে কখনো অমার্জিত চরিত্র ও অবাঞ্চিত আচরণ লক্ষ্য করা যায়। তা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবককে কালবিলম্ব না করে তা হতে শিশুকে উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কারণ যত দিন যাবে শিশুর মনের মধ্যে তা বদ্ধমূল ও স্থায়ী আসন গাড়তে থাকবে। এরপর তার মূলোৎপাটন অথবা পরিবর্তন একেবারে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, 'শিশুর জন্য তার চরিত্রের বিষয়ে গুরুত্বারোপ সর্বাপেক্ষা জরুরি। শৈশবে তার অভিভাবক যে চরিত্রের ওপর শিশুকে অভ্যস্ত করেছে সেই আদলেই তো সে গড়ে উঠবে। যেমন : অনুরাগ ও ক্রোধ, অস্থিরতা ও ত্বরা, প্রবৃত্তির সঙ্গে নমনীয়তা, দ্রুততা ও তীক্ষ্ণতা এবং লোভ ইত্যাদি। অতঃপর পরিণত বয়সে গিয়ে এর সংশোধন দুরুহ ও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। ফলে এই মন্দ চরিত্রগুলো তার গুণাবলি ও ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে যাবে। সে যদি কোন ভাবে তা হতে সম্পূর্ণ রূপে আত্মরক্ষা করতে না পারে তাহলে সে লাঞ্ছিত হবে অন্তত একদিনের জন্য হলেও। সে কারণেই আপনি সমাজে অনেক বিকৃত চরিত্রের লোক দেখতে পাবেন যারা তাদের শৈশবের প্রতিপালন ও পরিচর্যার ফসল ও যার ওপর তারা বিকশিত হয়েছে।'[৬৮] ঐ নিন্দিত চরিত্রসমূহ থেকে নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কতা প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করতে হবে। যেমন : সরাসরি নয় ইশারা ইঙ্গিতে, ধমকি নয়, নম্রতা ও অনুগ্রহের মাধ্যমে মন্দ চরিত্র থেকে তাকে বিরত রাখতে হবে। কারণ নিন্দিত চরিত্রে স্পষ্ট ঘোষণা তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের পর্দা ছিড়ে ফেলে। ফলশ্রুতিতে অসংখ্য বিরুদ্ধাচারণের প্রতি দুঃসাহসের জন্ম দেয় ও সর্বোপরি তাকে একগুঁয়েমি করতে প্রলুব্ধ করে।[৬৯] এ প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আপনার শিশুকে দুঃশ্চরিত্র শিশুদের সংশ্রব থেকে সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা করতে হবে, যদি তারা আত্মীয়ও হয়ে থাকে।

বেশভূষা, পরিচ্ছন্নতা ও শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি সযত্নদৃষ্টি রাখা :

শিশুরা এই ছোট বয়সে অন্যদের থেকে রোগব্যধিতে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। ওরা তাৎক্ষণিকভাবে সাধারণত নিজেদের স্বাস্থ্যগত বিষয়গুলো ও স্বাস্থ্যের প্রতি ভালোকরে যত্ন নিতে জানে না। সুতরাং অনুসন্ধান করে তাদের স্বাস্থ্যগত ক্রুটিগুলো খুঁজে বের করা অভিভাবকের কর্তব্য। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুটির শীর্ণকায়তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন ও তাদের ওপর বদ নজরের প্রতিক্রিয়া দূর করার জন্য ঝাড় ফুঁকের পরামর্শ দিলেন। যখন তিনি নিশ্চিতভাবে অবগত হতে পারলেন যে, তাদের এ দূরাবস্থা কুদৃষ্টির কারণেই হয়েছে। এমনিভাবে তাদের বেশভূষা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার কথাও বললেন।

---

[৬৮] . تحفة المودودفىأحكام المولود ص 240241

[৬৯].এহয়ায়ে উলুমিদ্দিন-১/৫৭

আব্দুল্লাহ বিন জাফর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাফর রা. পরিবারের তিন ব্যক্তিকে তাদের ওখানে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট আগমন করে বললেন, 'আজকের পর আমার ভাইয়ের ওপর কেউ ক্রন্দন করবে না।' অতঃপর বললেন, 'আমার ভাইয়ের সন্তানের জন্য তোমরা দোয়া কর!' এরপর আমাদেরকে আনা হলো যেন 'আমরা পাখির ছানা'। অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমরা আমার কাছে একজন নাপিত ডেকে পাঠাও!' এরপর তাঁর নির্দেশে তিনি আমাদের মাথা মুণ্ডন করে দিলেন।[৭০]

তাদেরকে পাখির ছানার সঙ্গে তুলনা করার কারণ, তাদের কেশগুচ্ছ ঠিক পাখির পালকের মত, তা হলো পাখির সর্বপ্রথম গজানো পালক। সে কারণে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাপিত আসার পর তাকে মাথামুণ্ডন করতে নির্দেশ করলেন। হজ ও উমারাহ ব্যতীত চুল রাখা উত্তম হওয়া সত্ত্বেও তাদের মাথা মুণ্ডন করিয়ে ছিলেন। তাদের মা আসমা বিনতে ওমাইস রা. এর স্বামী জা'ফর রা. যুদ্ধে নিহত হওয়ার কারণে তার অপূরনীয় ক্ষতি হয়ে ছিল, যার দরুন সে তাদের কেশগুচ্ছ চিরুণী করার প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল। বিষয়টা লক্ষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাথায় ময়লা ও উঁকুনের আশঙ্কা করে ছিলেন।[৭১]

শিশুর পোশাক ও শরীরের অবয়বের প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে। সুতরাং অভিভাবককে ভালো পরিচ্ছদ ও পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে দেখার সৌন্দর্য বর্ধনের প্রতিও সচেষ্ট হতে হবে। কারণ আল্লাহ তাআ'লা নিজে সুন্দর ও সুন্দরকে তিনি ভালোবাসেন, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে তিনি পছন্দ করেন। সুন্দর অভিব্যক্তি ও সৌন্দর্য অর্জনের প্রয়াস, দুর্বোধ্য ও অনভিপ্রেত কবিতা আবৃত্তি থেকে বিরত রাখবে। যা রুচির বিকৃতি ও অপরিচিত বিষয়বস্তু উপস্থাপনের দিকে ইঙ্গিত করে থাকে।

সেকালের একটি গল্প যার নাম 'ক্বযা'। আর তা হলো মাথার চুলের একাংশ কেটে অন্য অংশ রেখে দেয়া। এর একাধিক পদ্ধতি রয়েছে। চুল কাটার এই প্রক্রিয়া তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অব্যাহতভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা হতে নিষেধ করেছেন।

ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ক্বযা' হতে নিষেধ করেছেন।' ইবনে উমার রা. বলেন, 'আমি নাফে কে জিজ্ঞাসা করলাম-'ক্বযা' কি? তিনি রা. বললেন, 'শিশুর মাথার একাংশ মুণ্ডন করা আর অন্য অংশ রেখে দেয়া।'[৭২] শিশুর যত্ন ও প্রতিপালনের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির এ ধরনের চুল কাটার কাজে ছাড় দেয়া ঠিক হবে না এই যুক্তিতে যে, সে ছোট ও শরিয়ত কর্তৃক আদিষ্ট নয়।

শিশুর জন্য উৎকৃষ্ট মানের পোশাকের ব্যবস্থা করা উচিত। তবে কোন অবস্থাতেই রেশম ও স্বর্ণ পরিধান করানো যাবে না। কারণ অধিকাংশ সাহাবী ও আলেমগণ তা হতে নিষেধ করেছেন। যাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা তা বালকদের থেকে খুলে নিয়ে বালিকাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছি।'[৭৩] ইসমাঈল বিন আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুর রহমানের রা. এর সঙ্গে উমার

---

[৭০].আবু দাউদ-৩৬৬০ , নাসাঈ-৫১৩২ ,

[৭১] .আউনুল মা'বুদ-১১/১৬৪

[৭২].মুসলিম-৩৯৫৯

[৭৩]. আবু দাউদ : ৩৫৩৭ , এখানে ننزعه এর সর্বনাম الحرير এর দিকে এবং كنا এর সর্বনাম তার সঙ্গিদের দিকে ফিরেছে আর সঙ্গি হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম রা.।

রা. এর কাছে প্রবেশ করলেন। তখন তার গায়ে রেশমের জামা ও হাতে একজোড়া কংকন ছিল। উমার জামাটি ছিঁড়ে ফেললেন ও কংকন জোড়া খুলে ফেলে বললেন, 'তুমি তোমার মায়ের কাছে যাও!'[৭৪] ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত- 'তার ছেলে রেশমের জামা পরিধান করে তার কাছে আসল, অবশ্য বালকটি তার এই পোশাকে প্রফুল্লতা অনুভব করছিল। অতঃপর যখন তাঁর একেবারে নিকটবর্তী চলে আসল তখন জামাটি তিনি ছিঁড়ে ফেলে বললেন, 'তোমার মায়ের কাছে চলে যাও! এবং গিয়ে তাকে বলো তোমাকে যেন অন্য আর একটি জামা পরিয়ে দেয়।'[৭৫]

ইবনু আবি শাইবাহ্ রহ. বিষয়টিকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে এই শব্দে উল্লেখ করেছেন, 'ইবনে মাসউ'দ রা. যখন তার এক ছেলেকে রেশমের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা ছিঁড়ে ফেলে বললেন, 'এটা মেয়েদের জন্য নির্ধারিত।[৭৬]' সাঈদ বিন যুবায়ের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হুযাইফাহ ইবনুল য়ামান রা. দীর্ঘ ভ্রমণ থেকে নিজ গৃহে প্রত্যবর্তন করে তার সন্তানগণকে রেশমের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি সকল সন্তানের মধ্য হতে ছেলেদের গা হতে তা খুলে ফেলেন ও মেয়েদেরটা রেখে দেন।'[৭৭] অতএব চুল কাটার উল্লেখিত পদ্ধতি, রেশমের পোশাক পরিধান অথবা স্বর্ণ ব্যবহার একটি শিশুর বিকাশ ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। কারণ, সে তখন বাহ্যিক বেশভূষায় মেয়েদের কাছকাছি চলে যায়, যা তাকে অনাকাংক্ষিত পরিণতির দিকে ধাবিত করে।

---

[৭৪]. শরহে মাআ'নিল আছার : ৪/২৪৮,ইবনু আবি শাইবাহ্ : ৫/১৫২

[৭৫]. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ১১/৭৭, মু'জামুল কাবীর ; ৯/১৫৭

[৭৬]. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ্ : ৫/১৫২

[৭৭] .মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ্-৫/১৫২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :
শিশুর ভালোমন্দ নির্ণায়ক বয়োঃস্তর

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ভালোমন্দ নির্ণায়ক শৈশব

এটা হলো শিশুর ষষ্ঠ বা সপ্তম বছর থেকে শুরু করে বয়োঃপ্রাপ্তি অথবা তার বয়স পনের বছর হওয়া পর্যন্ত বয়োঃস্তর। শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এ দুই- দুইটি স্তরই এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যা সর্বসাকুল্যে অনধিক নয়টি বছর। এটা একটা দীর্ঘ সময়, যার শুরুটা সংযুক্ত থাকে অবুঝ শৈশব স্তরের সঙ্গে, আর শেষটা পৌরুষ স্তরের সঙ্গে। সুতরাং এ স্তরটা এখান থেকে কিছু এবং ওখান থেকেও কিছু গ্রহণ করে। অতএব সে প্রথমিক শৈশব জীবন ত্যাগ করেছে বটে কিন্তু এখনো পূর্ণাঙ্গ পৌরুষে পৌঁছতে পারেনি।

ইবনুল কাইয়িম রহ. শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের স্তরবিন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ‘শিশুর বেড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে তার বুদ্ধি ও বিবেচনারও বিকাশ সাধিত হয়ে তা ভালোমন্দ নির্ণায়ক বয়স পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তবে এর জন্য কোন নির্ধারিত বয়স নেই, বরং কোন মানুষতো পাঁচ বছর বয়সেও ভালোমন্দ নির্ণয় করতে শিখে ফেলে। মাহমুদ বিন রাবি’ র. বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পানির ছিটা দেয়ার মর্মার্থ বুঝতে সক্ষম হয়ে ছিলাম- যা তাদের কূপের কাছে রাখা বালতি থেকে তিনি আমার মুখে নিক্ষেপ করে ছিলেন। অথচ আমার বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। আর সে কারণেই শিশুর পাঁচ বছর বয়সকে শ্রবণের তীক্ষ্ণতার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। কেউ বা আবার এর চেয়ে কম বয়সেও ভালোমন্দ নির্ণয় করতে শিখে ফেলে। নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত অসংখ্য ঘটনা বহুদিন পর্যন্ত স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে ; অথচ সেগুলো সংঘটিত হয়েছে যখন তার বয়স পাঁচ বছরেরও নীচে। তবে যখন তার বয়স সাত বছর পূর্ণ হয়ে গেল তখনতো সে রীতিমত ভালোমন্দ নির্ণায়ক বয়সে অনুপ্রবেশ করল। নামাজের জন্য নির্দেশ প্রাপ্তির অন্তর্ভুক্ত হলো। সুতরাং এরপর যখন তার বয়স দশ বছর পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তার শক্তি-সামর্থ, বুদ্ধিমত্ত্বা ও এবাদত করার সামর্থও বৃদ্ধি পাবে। ফলে তাকে নামাজ পরিত্যাগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ অনুযায়ী প্রহার করতে বলা হয়েছে। তবে এই প্রহারটা হতে হবে কেবল শিষ্টাচার শিক্ষাদান ও নামাজের অনুশীলনের লক্ষ্যে। দশ বছর পূর্ণ হয়ে গেলে তো এক নতুন অবস্থার সূচনা হবে, তখন থেকে তার বিবেচনা ও জ্ঞান পরিপক্ক হতে থাকবে। সে কারণে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম এ অবস্থায়ই তার ওপর ঈমান গ্রহণ আবশ্যক করেছেন– যা পরিত্যগে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এটা আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ও অন্যদের পছন্দনীয় মত, এবং

তা খুবই শক্তিশালী অভিমত। যদিও বিস্তারিত অনুশাসনের ক্ষেত্রে শিশুর থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে। কারণ সৃষ্টিকর্তার পরিচিতি, তাঁর একত্ববাদের স্বীকৃতি ও তাঁর নবী-রাসূলদের প্রতি বিশ্বাসের হাতিয়ার তো তাকে প্রদান করা হয়েছেই। সে তার নিজের মতো করে দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রমাণ দিতে সক্ষম, যেমনিভাবে সে জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা ও পার্থিব উন্নতি বুঝতে সক্ষম। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে কুফরীর ক্ষেত্রে তার কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান স্থাপনের প্রমাণগুলো তার আহরিত সকল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে অনেক অনেক দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট। এছাড়া বয়োঃপ্রাপ্তির পূর্বে পৃথিবীতে তার ওপর অন্য কোন বিধান অবর্তিত হবে না। এর অর্থ এই নয় যে, পরকালেও তার ওপর কোন বিধান আরোপিত হবে না। এ অভিমতটি ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তাঁর সঙ্গিদের থেকে সংরক্ষিত, তবে এটা অত্যন্ত শক্তিশালী মত।[৭৮] এরপর দশ বছর থেকে বয়োঃসন্ধিক্ষণ পর্যন্ত তাকে বলা হবে কিশোর ও স্বপ্নদোষের নিকটবর্তী।[৭৯]

প্রথম অধ্যায় :

বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি

এই বয়সটা পূর্বের সকল বয়োঃস্তরের তুলনায় অসংখ্য অনন্য বৈশিষ্ট্য ও নান্দনিক গুণাবলির অধিকারী। যার মধ্য হতে কয়েকটি গুণাবলি সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো :

ভালোমন্দ নির্ণয়

এর অর্থ হলো শিশুর এক প্রকারের অনুভূতি ও বুদ্ধিমত্তা যার মাধ্যমে বস্তুসমষ্টির মধ্যে সে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। পার্থক্য করতে পারবে তার মধ্য হতে কোনটা তার জন্য ক্ষতিকর আর কোনটা উপকারী। সে ধীর-স্থীরভাবে নিজের আহার্য গ্রহণ করতে পারবে। যেমনিভাবে সে জানে কিভাবে একা পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। অন্যান্য সকল কর্মকাণ্ড ও তার ওপর আবর্তিত ফলাফল- এ সবই সে বুঝতে পারে।

---

[৭৮]. এই মতের বিশুদ্ধতার দিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী ইঙ্গিত করে : 'যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জনৈক খাদেম এক য়াহুদী বালক অসুস্থ হয়ে গেলে তিনি বালকটির নিকট এসে ইসলাম গ্রহণের অনুরোধ করে ও ইসলামে দীক্ষিত হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-'সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআ'লার জন্য যিনি তাকে আমার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করেছেন।' অতঃপর তিনি সাহাবাদেরকে রা. লক্ষ্য করে বলেন, 'যদি তোমাদের ভাই হত।' অর্থাৎ যাও তার দাফন কাফনের দায়িত্ব নাও! জানাযার নামাজের ব্যবস্থা কর। তাকে য়াহুদীদের জন্য রেখে দিও না। যেহেতু সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। হাদীসখানা ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও বর্ননা করেছেন। এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে- 'সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআ'লার জন্য যিনি আমার মাধ্যমে তাকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করেছেন।' এখান থেকে প্রমাণিত হয় যদি সে ইসলাম গ্রহণ না করতো তাহলে জাহান্নামবাসী হয়ে যেত। প্রকাশ থাকে যে, এরপর সে বয়োঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত আর যেতে পারেনি। ইবনে হাজার রহ. বলেন, '(হাদিসের মধ্যে বাচ্চাদের নিকট ইসলাম পেশ করার নির্দেশ পাওয়া যায়। যদি বাচ্চাদের থেকে ইসলাম শুদ্ধই না হত তাহলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট ইসলাম পেশ করতেন না। অতএব বুঝা গেল তার ইসলাম গ্রহণ সঠিক হয়েছে। এবং সে কুফরী অবলম্বন করে তার উপর মৃত্যু বরণ করলে তাকে শাস্তি দেয়া হতো।' ফাতহুল বারী-৩/২২১

[৭৯]. তুহফাতুল মওদুদ ফি আহকামিল মওলুদ : ২৯১-২৮৭

তবে তার এই বিবেচনা শক্তি প্রাপ্ত বয়স্কদের (যারা বিবেক-বুদ্ধিতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে) বিবেচনা শক্তির সমকক্ষ নয়। সে বক্তব্য অনুধাবন করে তার উত্তর দিতে পারে। যখন জ্ঞানীদের কাব্যগাঁথা আলোচনা করা হয় তখন সে ওটা বুঝতে পারে ও তার সুন্দর করে উত্তরও দিতে সক্ষম হয়ে থাকে।[৮০]

শিশুর বিবেচনা ও ভালোমন্দ নির্ণয়ের ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী ও পরিপক্ক ও তার অনুভূতি সম্প্রসারিত হতে থাকে বিবেচনার প্রথম স্তর থেকে মধ্যম স্তর ও সেখান থেকে শেষ স্তর পর্যন্ত। এমনি করে এক সময় শিশুর কাছে যুক্তিপূর্ণ গবেষণার দ্বার উম্মোচিত হয়ে যাবে। ঘটনা প্রবাহ ও তার কার্যকারণসমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যাবে। যেমনিভাবে বস্তুসমূহের মধ্যে লুক্কায়িত সম্পর্ক উদঘাটিত হওয়ার মাধ্যমে তার সামর্থের বিকাশ ও নতুন গবেষণা উপস্থাপনের সক্ষমতা সূচিত হয়। কিন্তু সেটাও আদিষ্ট ব্যক্তিদের তুলনায় অসম্পূর্ণ ; চাই সেটা বুদ্ধিগত ক্ষমতা বা অর্জিত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই হোক না কেন।

এই বিবেচনাসম্পন্ন শিশুর ওপর (সে একজন বিচক্ষণ শিশু হিসেবে) ফিকাহ শাস্ত্রে অনেক আদেশ নিষেধ আরোপিত হয়েছে। সকল মায্হাবের ফুক্বাহায়ে কেরাম ফেক্বাহ শাস্ত্রের অধিকাংশ অধ্যায়ে শধু বিবেচনাসম্পন্ন শিশুর হুকুম আহ্কাম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আপনি দেখতে পাবেন : বিবেচক শিশুর ইসলাম গ্রহণ, ধর্মান্তরিত হওয়া, তার নেতৃত্ব, তার ইমামতে জুমআ'র নামাজ অনুষ্ঠান, রমজান মাসের আগমন সম্পর্কে তার সাক্ষ্য গ্রহণ, শপথ ও অন্তিম উপদেশের (ওছিয়ত) কার্যকারিতা ও ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি; এ জাতীয় অসংখ্য হুকুম সম্পর্কে তারা জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। যা এই বয়োঃস্তরের অসামান্য গুরুত্বেরই পরিচায়ক। এটা পূর্ববর্তী সকল বয়োঃস্তর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এক্ষেত্রে আদিষ্ট হওয়ার দিক থেকে শিশুদের সংরক্ষণ ও পরিচর্যায় অত্যাধিক গুরুত্বারোপের দায়িত্বটা অভিভাবকদের ওপর গিয়ে বর্তায়। যেহেতু তার কর্মকাণ্ডের ওপর শরিয়তে হুকুম আবর্তিত হয়।

নির্দেশনা ও প্রতিপালনের উৎস সমূহের প্রকরণ

একটি শিশুর এই বয়োঃস্তরে এসে গৃহের বাহিরে যাওয়ার প্রবণতা বেশ বৃদ্ধি পায়। বহিরাগত প্রভাব বিস্তারকারীর ভূমিকা বিকাশ লাভ ও তার ওপর ক্রিয়াশীল হতে আরম্ভ করে। সুতরাং অভিভাবক বা শিক্ষকের ভূমিকা-প্রভাব শিশুর যত্ন ও প্রতিপালনে প্রতিফলিত হবে এটাতো নিয়মের কথা। যেমনিভাবে শিক্ষা কারিকুলামের প্রভাব তার প্রদত্ত তথ্যের মাধ্যমে শিশুদের ওপর পড়ে থাকে। আরো প্রতিফলিত হয় সহপাঠিদের সঙ্গে সংশ্রব, চলার পথ ও প্রতিবেশীর প্রভাব, যখন এই উৎসমূলগুলোর বিভিন্ন প্রকরণ হবে এবং তার তৎপরতা থাকবে পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিকোণ থেকে। সেক্ষেত্রে বাবা-মা ও শিক্ষকবৃন্দ সকলের কর্তব্য হলো সেই বিষয়গুলো খুঁজে বের করা ও উত্তমরূপে তাকে রক্ষার চেষ্টা করা। তাকে পরিষ্কার করে বলে দিতে হবে যে, সে অভিভাবককে না জানিয়ে সহপাঠী বা তার সমবয়সী কারো কথা বা কাজের কখনো যেন অনুসরণ না করে। সে যাকে চিনে না এমন লোকের অনুসরণ থেকেও তাকে সতর্ক করতে হবে। যদি তারা তাকে একথাও বলে, 'আমরা তোমার বাবার বন্ধু' অথবা এজাতীয় অন্য কোন কথা। অপরিচিত লোকের সঙ্গে প্রাইভেটকারে আরোহণ ও তাদের সঙ্গ দেয়া হতেও তাকে সতর্ক করতে হবে। এমন কি যদি তারা একথাও বলে, 'আমরা তোমাকে তোমার বাসায় পৌঁছে দেবো।'

যেমনিভাবে শিশুর থেকে প্রকাশিত প্রতিটি নতুন আচরণকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অভিভাবককে অনুসন্ধান করে জানতে হবে এটা কোত্থেকে আসতে পারে বা শিশু কোত্থেকে অর্জন করতে পারে।

---

[৮০].উমদাতুল কারী-২/৬৮

অতঃপর আচরণটা যদি সুন্দর হয় তাহলে তাকে ধন্যবাদ দেবে। আর যদি এর বিপরীত হয় তাহলে ধীর-স্থিরভাবে পথ চলবে ও তার সাথে বহিরাগত উৎসের প্রভাবও কমিয়ে দিতে হবে। এ প্রেক্ষিতে সময়োপযোগী পদক্ষেপ হলো; বাবাকে প্রথম থেকেই একটি এমন বিদ্যালয় সন্ধানে সচেষ্ট হতে হবে যেখান থেকে তার সন্তানের সুষ্ঠ ও সঠিক বিকাশ ঘটতে পারে। এমনিভাবে বসবাসের জন্য ভালো এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রচেষ্টা থাকতে হবে। কারণ এলাকার অধিবাসীই হবে তার প্রতিবেশী। তাদের সন্তানরা হবে তার সন্তানের বন্ধু-বান্ধব।

অনুভূতির উন্মেষ ও তার বিকাশ

একটি শিশু এই বয়সে পৌঁছলে তার অনুভূতি জাগ্রত হয় ও উপলব্ধি শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে সে সময়কেও অনুধাবন করতে সক্ষম হবে যেমনিভাবে পার্থক্য করতে পারবে ডান হাত ও বাম হাতের মধ্যে। মুয়ায বিন আব্দুল্লাহ বিন খুবাইব জুহানী রা. তার স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, 'শিশুরা কখন নামাজ পড়বে?' উত্তরে তিনি (স্ত্রী) বললেন, 'আমাদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি রয়েছেন যিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যদি শিশু ডান বাম চিনতে পারে তাহলে তাকে আদেশ কর!'[৮১] শিশুর উপলব্ধি একের পর এক বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে এই বয়োঃস্তরের মাঝখানে ও শেষের দিকে। উপরোক্ত শিশুর নিকট প্রমাণ পেশ ও তার প্রয়োগ বুঝা, কোন প্রমাণবিহীন বিষয় অগ্রাহ্য করা, এবং জ্ঞাত তথ্যসমূহের মধ্যে ভুলক্রটি ও বিরোধ উদ্ঘাটন করার মত সামর্থ সৃষ্টি হবে। সে কারণেই শিশুর সামর্থকে শুধুমাত্র গবেষণার ওপর ছেড়ে দিয়ে তার ব্যাপারে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা যে, 'সে এই স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে অসমর্থ' এটা উচিত নয়। কারণ কোন কোন শিশুতো এমনও আছে যাদের নিকট বহু পরিকল্পনা ও উদ্ভাবনী চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। বরং কখনো সে এমন প্রশ্নও করে বসে থাকবে, যা দেখে তার চেয়ে বয়সে যারা অনেক বড় তারা পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে যায় অথবা উত্তর দিতে অপারগতা প্রকাশ করে।

এ বয়সে শিশুর নিকট বহু প্রশ্ন দানা বাঁধতে থাকে যা ইতিপুর্বে কখনো তার মধ্যে উদয় হয়নি। কিন্তু অভিভাবকের নিকট যদি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর না থাকে তাহলে সে কি করবে?

এক্ষেত্রে কোন কোন অভিভাবককে দেখা যায় যে, দায়সারাভাবে একটা উত্তর দিয়ে দেয় অথচ সে জানে যে এটা অশুদ্ধ। আবার কোন অভিভাবক উত্তর দিয়ে থাকেন বটে অথচ সে নিজেও জানে না যে, তার উত্তরটি শুদ্ধ না অশুদ্ধ। আবার কেউ বা শিশু অথবা ঘরে অথবা শ্রেণী কক্ষের অন্য কারো সঙ্গে কোন সমস্যায় জড়িয়ে পড়েন ; যাতে শিশুটি প্রশ্ন করা থেকে বিরত ও নতুন তৎপরতা থেকে নিবৃত্ত থাকে। আবার কেউ বলেন, আমি ক্লান্ত, কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করো ! এই আশায় যে, পরে শিশু এটা ভুলে যাবে।

অথচ এ পরিস্থিতিতে অভিভাবকের যে পথ অবলম্বন করা উচিত তা হলো, এই উত্তরটি দিয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেন ; যেন তিনি বলবেন: 'এটা একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রশ্ন, আমি তোমার ভাইদের কাছে প্রশ্নটি উথাপন করে দেখতে চাই যে, কে এর সঠিক উত্তর দিতে পারে।' তখন যে কোন সন্তান বা শিক্ষার্থীর কথাই হয়ত বা বিশুদ্ধ উত্তরের পথ পরিষ্কার করে দিতে পারে। উপরোক্ত অভিভাবকের জন্য এরকম ঘোষণা দেয়াও সম্ভব হবে যে, তিনি তার সন্তানদের উত্তর খুঁজে বের করার জন্য একদিন অথবা সমপরিমাণ সুযোগ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি সঠিক উত্তর দাতার জন্য পুরস্কারও নির্ধারণ করে দিতে পারেন। এটা হলো একটি উৎকৃষ্ট পন্থা যা অভিভাবকের জন্য উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারে।

[৮১] আবু দাউদ, সালাত অধ্যায়, হাদীস নং ৪১৯

কখনো 'প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর একজন মহাজ্ঞানী রয়েছে' শিশুকে শিক্ষা দেয়ার এই সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টির সুদূরপ্রসারী বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হবে এই পন্থা। সাধারণত মানুষের জ্ঞান বিভিন্ন শ্রেণীর হয়ে থাকে। মানুষকে জ্ঞান দান করা হলেও তার পক্ষে সর্ববিষয়ে পূর্ণ মাত্রায় জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। না জেনে থাকলে 'আমি জানি না' এ কথা বলা তার কর্তব্য। তবে কখনোই ত্রুটিপূর্ণ উত্তর দেওয়া উচিত হবে না। সতরাং এর দ্বারা তারা উত্তম আচরণ অবলম্বনের প্রতি শিশুরা উৎসাহ পেয়ে থাকবে। এ জাতীয় বিষয়গুলো অভিভাবকের জন্য অবলম্বন করা কর্তব্য। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে 'আমি জানি না' বলা জ্ঞানের এক তৃতীয়াংশের সমান। কেনই বা হবে না মুসলিম বিদগ্ধ ওলামাগণ যে বিষয় জানতেন না সেক্ষেত্রে 'আমি জানি না' কথাটি বলতে কখনোই তাঁরা কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

এ বিষয়ের ওপর অসংখ্য প্রসিদ্ধ ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে অভিভাবক চাইলে সেখান থেকে তার ইচ্ছামত সংগ্রহ করতে পারেন। একজন হিতৈষী অভিভাবক হচ্ছেন তিনিই, যে এই বিকল্পসমূহ থেকে উপযুক্তটা নির্বাচন করতে সক্ষম যা শিক্ষার্থীর অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

কিন্তু যদি অভিভাবকের নিকট উত্তরটি জানা থাকে বটে কিন্তু বিষয়টি স্পর্শকাতর, এছাড়া উত্তর দানে অন্য কোন অন্তরায় নেই। যেমন : প্রশ্নটা এমন বিষয় নিয়ে যা নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট। এমতাবস্থায় একজন অভিভাবক কি করবেন? এক্ষেত্রে একাধিক দিক নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এখানে কয়েকটি বিষয় এমন রয়েছে যা অভিভাবক কোন ক্রমেই উপেক্ষা করতে পারবেন না। তা হলো-

- অভিভাবক কর্তৃক অশুদ্ধ উত্তরদান পরিহার করা।
- শিশুকে এ জাতীয় প্রশ্ন করার জন্য তিরস্কার করা হতে বিরত থাকা।
- উত্তর দানে কালক্ষেপণ পরিহার করা, বিশেষ করে যখন দেখবেন যে, প্রশ্নটা শিশুর চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করছে।

কারণ, সে তখন এর উত্তর খুঁজতে যে এর উত্তর দিতে সক্ষম তার নিকটই যাবে। তার অন্য পথ খুঁজে নেয়া যার শুদ্ধাশুদ্ধতা আপনার জানা নেই, তার চেয়ে বরং প্রশ্নের উত্তরটা আপনার নিজের পক্ষ থেকে দেয়াই উত্তম। এক্ষেত্রে অন্যতম উপকারী বিষয় হলো অভিভাবক ক্ষুদ্র অথচ অর্থবহ বাক্য দ্বারা উত্তর দানে ক্ষান্ত করবে। ব্যাখ্যা ব্যাতিরেকে তার বিষয় বস্তু থাকতে হবে সংক্ষিপ্ত। যেমনিভাবে ইঙ্গিত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যার উল্লেখ করা অশোভন মনে করা হয়েছে আল কুরআন ও হাদীস শরীফে, সেক্ষেত্রে অসংখ্য ইঙ্গিতসূচক বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা সঙ্গমকে مباشرة (সহবাস) শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন। যেমন : আল্লাহ তাআ'লার বাণী-

ولا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ . (البقرة-187)

'তোমরা মসজিদে ইতিক্বাফ অবস্থায় তাদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়ো না।'[৮২] আবার কখনো رفث শব্দ দ্বারা সঙ্গমের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তার বাণী-

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ . (البقرة-187)

[৮২]. সুরা আল-বাকারা : ১৮৭

'সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে।'[৮৩] হাদীস শরীফের মধ্যেও এ সংক্রান্ত অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। উল্লেখিত উপস্থাপনযোগ্য বিষয়ের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হলো আল-কুরআনুল কারীমের একটি আয়াত অথবা একটি হাদীস শরীফের মাধ্যমে উত্তর প্রদান।

সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন :

শিশুর ঘর থেকে বারংবার বেরিয়ে মসজিদ কিংবা বিদ্যালয় গমনের ফলে ঐ সকল স্থানসমূহে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সংশ্রব শিশুর সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের সূচনা করবে যা পূর্বের সম্পর্কের চেয়ে ব্যাপকতর (যা সীমাবদ্ধ ছিল তার ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে)। সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব স্থাপনের উৎসাহ, তদসংশ্লিষ্ট ফলাফল, তাদের দ্বারা অভিভূত হওয়া, তাদের প্রতি নিরঙ্কুশ ভালোবাসা ও ব্যক্তিগত মতামত অথবা সাক্ষাৎকার আদান প্রদানের প্রতিক্রিয়া শিশু থেকে প্রকাশ পাবে। এ জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে কখনোই বারণ করা উচিত নয়, বরং তাকে অনুপ্রেরণা ও সাহস যোগাবে। এমনিভাবে সে সমাজের মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহার শিখতে সক্ষম হবে। অদূর ভবিষ্যতে সে একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে যাবে। সুতরাং এ বিষয়ে তাকে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। কিন্তু অভিভাবককে শিশুর বন্ধুদের যত্ন ও পরিচর্য়ার ধরন সম্পর্কে অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ শিশুর এ বয়োঃস্ত রে এগুলোরও একটা ভূমিকা রয়েছে। যাতে তার বিচারিক অনুভূতি অথবা শিশুর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের সীমা অতিক্রম করে যেতে না পারে। কারণ সে কিছু সময় ধরে যে কথা/কর্মটি পর্যবেক্ষণ করছিল সে দিকেই সে ফিরে যাবে। বিশেষ করে যদি তার কোন সহপাঠি অথবা বন্ধু থেকে তা প্রকাশ পায়। এই জন্যই বিদগ্ধজনেরা বলেছেন: সঙ্গী হলো প্রবল আকর্ষণকারী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য এর থেকে আরো সুস্পষ্ট। 'মানুষ তার বন্ধুর আচার আচরণের ওপর গড়ে উঠে। অতএব তোমাদের কেউ বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চাইলে লক্ষ্য করতে হবে সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে?'[৮৪]

দ্বিতীয় অধ্যায় :

অন্তরায় ও সমস্যাবলী

এই বয়োঃস্তরে এসে অভিভাবক যে অন্তরায় ও সমস্যাবলীর সম্মুখীন হবে তার সিংহভাগই পূর্ব বয়োঃস্তরে সৃষ্ট সমস্যার অনুরূপ। অভিভাবক যদি একটু ভালো করে সমস্যাগুলো নিরসন ও পরাস্ত করার চেষ্টা করেন তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় শিশুর বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্যাও দূর হয়ে যাবে। কিন্তু এই বয়োঃস্তরে এসে ভিন্ন আঙ্গিকের কিছু অন্তরায় ও সমস্যাবলী পরিলক্ষিত হয়ে থাকবে যা ইতিপূর্বে প্রকাশ পায়নি ও যেগুলো বহিরাগত সমাজ সংশ্রবের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে সামগ্রিকভাবে সর্বাপেক্ষা বিপদজনক হলো, দুষ্ট সাহচর্য। যার ওপর ভর করে অনেক মন্দ আচরণ শিশুর ওপর আপতিত হতে পারে। যেমন : ধুমপান করা, পর্ণ ম্যাগাজিন, ভিডিও ক্যাসেট, চরিত্র বিধ্বংসী সিডি অথবা কাটপিস ফিল্ম ইত্যাদি হস্তগত হওয়া।

এ প্রেক্ষিতে একজন অভিভাবকের কর্তব্য, নিজ সন্তান অথবা যার পরিচর্যা ও প্রতিপালন তিনি করতে চান তাকে এমন একজন মানুষের সন্ধান দিতে হবে যার সাহচর্য শুধুমাত্র কল্যাণের দিকেই ধাবিত করে

---

[৮৩]. সুরা বাকারা-১৮৭

[৮৪]. মুস্তাদরেক আলাস্-সহিহাইন-৪/১৮৯

থাকে। তার নিকট স্পষ্ট করতে হবে যে এছাড়া অন্য সাহচর্যে কোন উপকারিতা নেই। বরং তা কেবল অকল্যাণ ও ব্যর্থতাই টেনে আনতে পারবে। এক্ষেত্রে তার সামনে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করবে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী উল্লেখ করবে- 'মুমিন ভিন্ন কারো সাহচর্য গ্রহণ করো না।'[৮৫] এরপর খুব কাছ থেকে তার ছেলের বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করবেন। ফলে তিনি এ বিষয় বিচক্ষণতা লাভ করতে সক্ষম হবেন। অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত শিশু যেন তার বন্ধুদের কাছ থেকে কোন বই, পত্রিকা অথবা ক্যাসেট ইত্যাদি ধার না নেয়। এ বিষয়টা তিনি খুব সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে থাকবেন।

শিশু যে স্কুলে বিদ্যা আহরণ করছে পিতার জন্য একাধিক বার সেই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও শিক্ষকবৃন্দের নিকট তার সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা উচিত। তখন শিশু সন্তানটি তাকে যেন স্কুলে দেখতে পায় সে ব্যাপারেও সচেষ্ট থাকতে হবে যাতে করে সে বুঝতে পারে তার বাবা তাকে পর্যবেক্ষণ ও তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। ফলশ্রুতিতে এটা তাকে সঠিক পথে চলতে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে শিশুর বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি অবশ্যই পরিহার করে চলতে হবে বরং কেবলমাত্র তার আচরণ সুসংহত ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে তার আচরণ অবগতির জন্যই এ প্রয়াস। কারণ গোয়েন্দাগিরি একটা নিন্দনীয় চরিত্র যা থেকে আল্লাহ তাআ'লা নিষেধ করেছেন। আর শরিয়ত যে বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তার মধ্যে কোন কল্যাণ অথবা উপকারিতা থাকতে পারে না। বরং তা মানব সমাজের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয়।

অতএব শিশুর অনুপস্থিতিতে তার স্কুল ব্যাগ খোলার পরিবর্তে গৃহে প্রত্যবর্তনের পর সে যখন তার ভাই-বোনদের থেকে দূরে থাকে, আপনি তাকে সরাসরি বলতে পারেন- 'তোমার স্কুল ব্যাগটি খোলো। এর মধ্যে কি আছে আমাকে দেখাও! এটা শুধু তখনই প্রয়োগ করবে যখন শিশুর পরিচর্যা ও প্রতিপালনের জন্য অগত্যা এর প্রয়োজন পড়বে। বরং আপনি যদি তার বন্ধুদের থেকে যে ম্যাগাজিন ও গল্পগুলো ধার এনেছে সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করেন; তাহলে অবশ্যই সে সত্যি করে উত্তর দেবে যদি পূর্ববর্তী বয়োঃস্ত রে সে সততার ওপর অভ্যস্ত হয়ে থাকে। উপরোক্ত যদি উপলব্ধি করতে পারে যে, আপনি তার প্রতি স্নেহপূর্ণ পরিচর্যায় তৎপর, তাহলে উক্ত গল্পসমূহ ও ম্যাগাজিন সম্পর্কে আপনার প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে সে অগ্রিম বলে দেবে, ঐটা কি তার জন্য সমীচীন? অথবা অগুলোর মালিকের কাছে তা ফিরিয়ে দিয়ে আসবে।

কিন্তু যদি তার নিকট অমার্জিত গল্পগুচ্ছ ও অবাঞ্ছিত ম্যাগাজিন পাওয়া যায়, অভিভাবক এক্ষেত্রে কি করবেন? তখন উত্তম হবে তাকে উপদেশ প্রদান ও উল্লেখিত বস্তুগুলোর মধ্যে নিহিত ক্ষতিকর দিকগুলো তার সামনে তুলে ধরা। সম্ভব হলে দ্বীন-দুনিয়ায় এর নিশ্চিত ক্ষতির দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা। তবে তাকে গালি দেয়া, লজ্জিত করা অথবা প্রহার করতে উদ্যত হওয়া ঠিক হবে না কোনক্রমেই। বিশেষ করে যখন এমন হবে যে, এই প্রথমবার সে এটা করেছে। এ প্রেক্ষিতে তার জন্য একটা উপযুক্ত বিকল্পের ব্যবস্থা করা অভিভাবকের কর্তব্য। কারণ শুধূমাত্র নিষেধাজ্ঞাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়।

---

[৮৫] .মুসনাদে আহমদ-১০৯০৯

তৃতীয় অধ্যায়

পদ্ধতি ও উপকরণ :

এটা প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখিত পদ্ধতি ও উপকরণসমূহের সম্পূরক আলোচনা। তথাপি বিষয়বস্তু স্তরসমূহের পার্থক্যের আলোকে সাজানো হয়েছে। কারণ, এই বয়োঃস্তরের উপযোগী পর্যাপ্ত বিষয় দ্বারা আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার পর পূর্বোল্লেখিত বিষয়ের মধ্যে সাযুজ্যও এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

সংঘটিত ঘটনাবলী দ্বারা শিক্ষা প্রদান :

ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে প্রতিপালন ইসলামী পরিচর্যা ও প্রতিপালনের মূল নির্দেশিকা। কারণ কাংক্ষিত অবকাঠামো বিনির্মাণে সংঘটিত ঘটনাবলীকে মহার্ঘ্য জ্ঞান করা হয়ে থাকে। যেহেতু তখন বাস্তব ঘটনা এবং প্রতিপালন-পরিচর্যার মধ্যে একটা ভারসাম্য ও সামাঞ্জস্য স্থাপিত হয়ে যায়। এর সংঘটনের মধ্য দিয়ে গভীর জ্ঞান ও বিরাট প্রতিক্রিয়া সূচিত হবে। এ পর্যায়ে কুরআনে কারীমের অসংখ্য আয়াত ঘটনার পেছনে এসেছে ; যেগুলো ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে শিশুর পরিচর্যা ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। أفك (অপবাদ) এর ঘটনা ও তার মধ্যে মুসলিম সমাজ প্রতিপালনের যে শিক্ষা উৎসারিত হয়েছে তার দিকে লক্ষ্য করুন। যে আদেশ ও নিষেধাবলী কোন ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় তা নিজে একা কোন ফল দিতে পারে না। সে কারণে মুসলমানদের ওপর এই ঘটনার মাধ্যমে সৃষ্ট জটিলতা দূর করার জন্য আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন-

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. (النور-11)

'এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না ; বরং এটা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর।'[৮৬]

এমনিভাবে আমরা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো তাঁর সিংহভাগেই এ জাতীয় পরিস্থিতিতে এই পদ্ধতির ব্যবহার প্রমাণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নশ্বর পৃথিবীর মর্যাদা ও পার্থিব বিষয়কে তুচ্ছ করে দেখাতে সংকল্প করলেন। তখন তিনি একথা বলেননি, 'পৃথিবী হলো নিকৃষ্ট যা কোন বস্তুরই সমকক্ষ হতে পারে না' এর ওপরই ক্ষান্ত করতে পারতেন যা তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংক্রান্ত বক্তব্যের জন্য যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের রা. মনের মধ্যে এই মর্মবাণী বদ্ধমূল করার জন্যে উপস্থিত ঘটনাকে মূল্যায়ন করার নীতি গ্রহণ করলেন।

যাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত- 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা এক বাজারের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় একটি বড় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। লোকজন তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। ইতিমধ্যে জনৈক ভদ্রলোক একটি মৃত জন্তু নিয়ে অতিক্রম করছিলো অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ জন্তুটার কান ধরে বললেন, 'এটাকে এক দিরহামের বিনিময় ক্রয় করতে কেউ পছন্দ করবে? আমরা বললাম, 'আমরা কেউই পছন্দ করি না, কারণ এটা আমাদের কোন উপকারে

---

[৮৬]. সুরা নুর-**১১**

আসবে না, আর তা ছাড়া এর দ্বারা আমরা করবোই বা কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা কি চাও এটা তোমাদের জন্য হোক? উত্তরে তারা বললেন, 'আল্লাহর শপথ ! যদি জন্তুটি জীবিতও থাকতো তাহলেও তো এর মধ্যে ত্রুটি ছিলো, কারণ সেটা হলো লিঙ্গবিহীন আর এখন তো তা মৃত; তাহলে কিভাবে হবে? অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমাদের জন্য পৃথিবীটা আল্লাহ তাআ'লার নিকট এর চেয়েও তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট।[৮৭] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নতের মধ্যে অনুরূপ অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। শিশুর সম্মুখে সংঘটিত ঘটনাবলীকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তা দিয়ে শিক্ষা দেয়া অভিভাবকের কর্তব্য। ফলে কাংক্ষিত পরিচর্যা ও প্রতিপালনের মাধ্যম হিসেবে অভিভাবক তা গ্রহণ করতে পারবেন।

পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা :

সাধারণত একটি শিশু এ বয়োঃস্তরে পৌঁছে পড়া ও লেখা শিখতে আরম্ভ করে থাকে। যত দিন যায় তার এ পড়া লেখার মান উত্তরোত্তর উন্নত ও সুন্দর হতে থাকে। শিশুর সামর্থ্য ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখে তার বয়োঃস্তরকে বিবেচনা করে সম্পূর্ণ নিজস্ব আঙ্গিকে ও অভিভাবকের আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী একটি উপযুক্ত পাঠাগার স্থাপন করা উচিত। সেখানে এমন গ্রন্থের সমাহার অবশ্যই থাকবে যা মৌলিকভাবে এই বয়োঃস্তরের জন্যই বিশেষভাবে রচিত। এ পর্যায় নির্বাচন ও চয়নের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কাউকে শেয়ার করতে পারেন। কোনরূপ পছন্দ ও খোঁজ খবর না নিয়ে বাজারে যা পাওয়া যায় সেগুলো সংগ্রহ করা ঠিক হবে না। পছন্দ ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিশুকে শেয়ার করতে কোন আপত্তি নেই। বরং এটা করা উচিত ; কারণ এর মধ্যে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিনির্মাণ, তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ ও নিজে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার অনুভূতি নিহিত রয়েছে। কিন্তু তা হতে হবে নির্ভুল পর্যবেক্ষণ ও সঠিক দিকনির্দেশনার সঙ্গে।

এরূপ একাধিক পাঠাগার থেকে উপকৃত হওয়া উচিত। এটা যেন নিরেট ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য না হয়। অতিথিগণ ঘরে প্রবেশ করেই যেটা দেখতে পারবে। উক্ত পাঠাগার এমনভাবে তালাবদ্ধ করে রাখাও উচিত নয় যে, নির্ধারিত সময় ছাড়া তা শিশুর জন্য খোলা হয় না। যেমন : সপ্তাহের শেষে। বরং উম্মুক্ত রাখবে যখন মন চায় অথবা উৎসাহ জাগে শিশু যেন সেখানে অনায়াসে যেতে পারে। সমৃদ্ধ পাঠাগারের গ্রন্থসম্ভার যেন তার পাঠ পুণঃআলোচনা, শিশুর থেকে কাংক্ষিত প্রশিক্ষণের সমাধান ও উত্তর দানে দিকনির্দেশনা প্রদান ও পর্যবেক্ষণে সহায়ক হয়ে থাকে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

পাঠাগারের পরিবেশ অবশ্যই পাঠের উপযুক্ত হওয়া উচিত, কোন রকমের সংকীর্ণতা ও হৈ চৈ মুক্তভাবে শিশু সেখানে বসতে স্বাচ্ছন্দবোধ করতে পারে। স্থানটিতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। সাম্প্রতিক কালের পাঠাগারগুলো শুধু কাগুজে পাঠাগার হিসেবে তৈরি করা হয় না, বরং তা অনেক উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। বরং তাতে একদিকে থাকে শ্রুতি নির্ভর পাঠাগার, অন্যটা দৃষ্টি নির্ভর ও তৃতীয়টা থাকে ইলেক্ট্রনিক্স। প্রত্যেকটাই কাম্য তবে তা হতে পারে পর্যাপ্ত আর্থিক স্বচ্ছলতার গণ্ডির মধ্যে থেকে।

শিশুকে গবেষণায় অভ্যস্ত করা :

পরিচর্যা ও প্রতিপালনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কাংক্ষিত জ্ঞান আহরণের লক্ষ্যে শিশুকে এই পাঠাগারে গবেষণা করতে অভ্যস্ত করা। শিশু যখন কোন প্রশ্ন করে ও তার উত্তর এই পাঠাগার থেকেই জানতে চায়, তখন তার ধারণা অনুযায়ী তাকে পথ দেখানো অভিভাবকের জন্য উত্তম। তিনি চাইবেন

[৮৭] .মুসলিম-৫২৫৭

শিশু নিজের থেকেই যেন উত্তর খুঁজে বের করতে পারে, অভিভাবক কেবল তা পর্যবেক্ষণ করবেন। এক্ষেত্রে অভিভাবক উত্তর দিতে যাবেন না। কারণ তাহলে সে জানতে পারবে কিভাবে গবেষণা করতে হয়। ফলে খুঁজে বের করার গুরুত্বও অনুধাবন করতে পারবে এবং আত্ম নির্ভরশীল হয়ে স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছে সফলতার স্বাদও উপলব্ধি করতে পারবে। এরপর অভিভাবকের কর্তব্য হলো শিশুটি তার কাংক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলো কি না এ ব্যপারে নিশ্চিত হবে। ফলশ্রুতিতে শিশুর মানসিক সুগঠন সূচীত হবে।

অনেক অভিভাবক আছেন যারা এ ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরতে না। তারা বিলম্বকে কালক্ষেপণ মনে করে তাদেরকে কোন পথনির্দেশ অথবা গবেষণার প্রতি উদ্বুদ্ধ না করেই নিজেদের পক্ষ থেকে শিশুর প্রশ্নের ত্বরিত উত্তর প্রদান পছন্দ করেন। এভাবে অবশ্যই তারা শিশুর অন্তস্থিত গবেষণার প্রাণটাকে গলাটিপে হত্যা করেন। যা ঐ শিশু ও তার সমাজের জন্য অকল্যাণকর সাব্যস্ত হয়।

এক্ষেত্রে একটি নিন্দনীয় বিষয় সংঘটিত হয় তা হলো, মা-বাবা অথবা অভিভাবকগণ মূলতঃ শিশুদের জন্য নিদৃষ্ট বিষয়ের কুইজ প্রতিযোগিতার প্রশ্নমালার সমাধান তাদের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতার পুরস্কার জেতার আশায় দিয়ে থাকেন। ফলে ক্ষণিকের জন্য যদি তারা সফলকাম হয়েও থাকে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তা শিশুর পরিচর্যা ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যায়। ব্যাহত হয় প্রতিযোগিতা আয়োজকদের উদ্দেশ্যও।

সাপ্তাহিক শিক্ষামূলক সেমিনারের আয়োজন করা :

শিশুর পরিচর্যা ও প্রতিপালনের অন্যতম উপায় হলো পারতপক্ষে সপ্তাহে পারিবারিক একটি সেমিনারের আয়োজন করা যার প্রতি অধিকাংশ অভিভাবক ভ্রুক্ষেপই করেন না। যেখানে মা-বাবার সঙ্গে সমবেত হবে ছেলে ও কন্যা শিশুরা; প্রশিক্ষণ ও প্রতিপালন, পরস্পর সহমর্মিতার প্রসার ও ভাই-বোনদের মাঝে অটুট বন্ধন প্রতিষ্ঠার জন্য। সাথে থাকবে সংস্কৃতিক অথবা শিক্ষামূলক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন যা সন্তানদের নিকট অর্জিত অভিজ্ঞতা ও তাদের স্মৃতিতে যে শিষ্টাচার ও জ্ঞান অঙ্কিত রয়েছে তা পরিমাপ করতে সক্ষম হবে।

এমনিভাবে এই বৈঠকের মাধ্যমে কুরআনে কারীম থেকে কিছু আয়াত পাঠ করতে হবে, উক্ত আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যখ্যাসহ তাজবীদের নিয়মাবলী জানার জন্য পেশ করবে। এরপর কোন বই থেকে নির্বাচিত পাঠ। পাঠের পর পাঠের সকল বিষয়বস্তু চিত্রায়িত করবে। তাদের সৃষ্ট কোন অস্পষ্টতা নিরসনের জন্য সন্তানদের পক্ষ থেকে কোন প্রশ্ন থাকলে তা উত্থাপনের সুযোগ দিতে হবে।

মা-বাবার পারিবারিক বৈঠকগুলো শুধুমাত্র শিক্ষামূলক বিষয়ের মধ্যে (যা শিশুটি স্কুলেই শিখে থাকে) সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। কারণ যদি কেবল শিশুর পাঠ-পর্যালোচনা করে অথবা তার থেকে কাংক্ষিত বিষয়ের সমাধান দেয় তাহলে শিশু মনে করবে অভিভাবক শুধুমাত্র ঐ দায়িত্বটাই পালন করেছেন যা তার একান্ত কর্তব্য ছিলো। অবশিষ্ট সময় শিশু যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াবে। যেমন : খেলাধুলা, নিদ্রা অথবা দুষ্টামি ইত্যাদি।

শত্রুতা সৃষ্টি হয় না এমন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা :

জ্ঞান আহরণ, শিষ্টাচার শিক্ষা অথবা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে অধ্যাবসায় ও অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাতে শিশুদের উদ্বুদ্ধ করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো; তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রাণ সঞ্চার করা। সালাফে সালেহীন থেকে এ প্রসঙ্গে বর্ণনা রয়েছে। সাঈদ বিন যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত : ইবনে আব্বাসের রা. নিকট জনৈক ভদ্রমহিলা তার দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর একটি চিঠি নিয়ে উপস্থিত হলো। তখন এটা তাঁর ছেলেকে পড়তে দিলে কোন রকম দায়সারাভাবে পাঠ করে তা শেষ করে ফেললো। অতঃপর আমাকে

দিলে আমি তা সুন্দরভাবে পাঠ করে শুনাই। অতঃপর তিনি নিজ সন্তানকে বললেন, 'তুমি মিশরী বালকের মত চিঠিটা এত দ্রুত কেন পড়লে ?

এই পদ্ধতিটা যে শুধুমাত্র শিশুর এ বয়সের সঙ্গে সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয়। বরং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এ দুই বয়োঃস্তরের জন্যও প্রয়োগযোগ্য। তবে এক্ষেত্রে কেবলমাত্র আলোচ্য বিষয়ের পার্থক্য হতে পারে। হাদীস শরীফের মধ্যে এ সংক্রান্ত অসংখ্য আলোচনা এসছে।

চতুর্থ অধ্যায়

পুরস্কারও শাস্তি

পুরস্কার :

পুরস্কার মানব আত্মাকে অনুপ্রাণিত করে ও তাকে দান দাক্ষিণ্য করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। চাই সেটা ছোট হোক বা বড়। সে মতে প্রতিদান ও পুরস্কার যেন ইসলামী প্রতিপালন বিষয়ক পরিচর্যা-প্রতিপালনে প্রকাশ্য শিক্ষকতুল্য। কথামালা, কর্মসমূহ ও অপরাপর সকল কর্মকাণ্ডের মধ্য হতে শিশুর প্রশংসনীয় বিষয়গুলোর ওপর শিশুর মূল্যায়ন করা ও এমন বিচিত্র পটভূমির বিপরীতে অভিভাবকের পুরস্কার প্রদান করা উচিত। কিন্তু শিশুর এই বয়োঃস্তরে পৌঁছার পর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো : এসব কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টি, বান্দার প্রতি তাঁর ভালোবাসা, প্রশংসা এবং তার সৃষ্টিকর্তার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। যাতে পুরস্কারকে নিরেট পার্থিব বৈষয়িক প্রতিদান দেয়ার দিকে রূপান্তরিত করা না যায়। তাহলে আল্লাহ পাকের সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়বে। ফলে সেটা বিশুদ্ধ সংকল্প বিনষ্টের কারণ হবে যা প্রতিটি আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত। যদিও এটা কখনো কখনো পার্থিব প্রতিদান ও পুরস্কার দেয়ার পরিপন্থী নয়।

ইমাম গাজ্জালী রহ. বলেন, 'শিশুর থেকে যখন কোন নান্দনিক চরিত্র ও প্রশংসনীয় কর্ম প্রকাশিত হবে তখন তাকে সম্মান করা ও সে যাতে আনন্দ পায় ও প্রকাশ্যে জনসাধারণের মাঝে প্রশংসা করা এমন কিছুর মাধ্যমে তাকে পুরস্কৃত করা উচিত।'[৮৮] প্রতিদানকে কর্ম সম্পাদনের জন্য কোন প্রকারের শর্তারোপ করা ঠিক হবে না। তাহলে শিশুকে তা না দিলে সে ঐ কাজটি করবে না। কারণ প্রতিদান যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিদান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার শিক্ষামূলক তৎপরতা অব্যাহত থাকবে। আর যখনই সেটা কোন শর্ত অথবা শিশুর কোন আবদারের সঙ্গে সংযুক্ত হবে, তখন অভিভাবকের পক্ষে এই পদ্ধতি প্রয়োগ ছাড়া শিশুর কাছ থেকে কোন কাজই আর আদায় করা সম্ভব হবে না। অতএব ফলাফল দাঁড়ালো এই যে, পুরস্কার শিক্ষা ও প্রতিপালনের আসল মূল্য হারিয়ে ফেলবে ও তার বিপরীতটা নিয়ে আসবে। সতরাং কোন কথা বা কর্মের বিনিময় পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে অভিভাবকের এ বিষয়টা বিবেচনায় রাখা একান্ত কর্তব্য।

শাস্তি :

শিশু স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর তার সহপাঠি ও বন্ধুদের সঙ্গে একাডেমিকাল অর্জনের ক্ষেত্রে উচ্চ অথবা সর্বোচ্চ স্থান দখল করার জন্য প্রতিযোগিতা করে থাকে। মা-বাবার নিকট তখন একটি নতুন বিষয়ের আবির্ভাব হয়। তখন অধিকাংশ মা-বাবার প্রতিপালনের ক্ষেত্রে একটাই টার্গেট হয়ে থাকে-শিশুকে নিরেট তথ্য শিক্ষা দেয়া ও সেটা সংরক্ষণ ও স্মরণ রাখা এবং পরীক্ষার সময় তার পুনরাবৃত্তি করা। কারণ তাদের

---

[৮৮] .এহইয়ায়ে উলুসুদ্দীন-৩/৭৩

নিকট পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অর্জন পরিচর্যা ও প্রতিপালনের কার্যকর সফলতার নিশ্চিত নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত। এমনকি শিশুর আচার আচরণে তার কোন প্রতিফলন যদি নাও ঘটে থাকে।

শাস্তি প্রদানের নিয়মাবলী

শাস্তি দানের কারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া :

এ বয়সে যে সকল কারণে মা-বাবা তাদের সন্তানদের শাস্তি দিয়ে থাকেন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান আহরণে শিক্ষার্থীর ধীরগতি। সর্বোচ্চ অথবা উচ্চ স্থান অর্জন এমন কর্মসমূহের অন্ত র্ভুক্ত– পরিচর্যা ও প্রতিপালনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর প্রতি কোন রকম শৈথিল্য প্রদর্শন ব্যতিরেকে যার ওপর শিক্ষার্থীকে প্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করা যায়। আমরা অনেক মা-বাবা অথবা অভিভাবককে দেখেছি শিক্ষাঙ্গনে কাঙ্ক্ষিত স্থান লাভ না করতে পারার কারণে শিশুর প্রতি যারা ভীষণ রাগান্বিত হন। আবার কখনো এ জন্য শিশুটিকে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তিও দিয়ে থাকেন। অথচ যথাসময় মসজিদে গিয়ে ইমামের সঙ্গে নামাজ, কথা বলায় সততা, দরিদ্রের প্রতি অনুগ্রহ, সহপাঠিদের সঙ্গে ভালো আচরণ এ সকল নান্দনিক গুণাবলীর প্রতি যত্নবান হওয়ার ব্যাপারে তারা কখনো শিশুর সাথে এতটুকু আলোচনা পর্যন্ত করেন না। যা শিশুর অন্তরে দ্বীনের অবশ্য পালনীয় বিষয়গুলোর প্রতি আগ্রহের চেয়ে শিক্ষাগত উন্নতির প্রতি উৎসাহের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও মর্যাবোধ সৃষ্টি করবে বেশি। উপরন্তু 'সন্তান পরীক্ষায় নকল করেছে' মর্মে অভিভাবকের নিকট কখনো সংবাদ আসলেও তাকে নিষেধ করার চেষ্টা করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অর্জন নিশ্চিত করতে থাকে। শিশু কোন কোন দিন ঘুম থেকে বিলম্ব করে জাগ্রত হয় তখন সকালের নামাজ না পড়িয়ে মা-বাবা তাকে দ্রুত স্কুলের জন্য বের হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে তৎপর হয়ে পড়েন। 'সঠিক হলো প্রথমে নামাজ আদায় করা যদিও তাতে স্কুলে যেতে বিলম্ব হয়' এ কথা জানা সত্ত্বেও ; বিশেষ করে তার বয়স যখন দশ বছরে পৌঁছবে ও এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার এমন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে, যার ফলে মানুষের বিকাশ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পছন্দনীয় বিষয়ের ওপর আবর্তিত হবে। যখন আমরা এই মহান লক্ষ্য থেকে সরে গিয়ে কেবলমাত্র একাডেমিক শিক্ষার দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি দিবো ; তখন কোন প্রকারের শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে আমাদেরকে অবশ্যই তার কারণ জেনে নিতে হবে। এই ধীরগতি কি কারণে সৃষ্টি হয়েছে। অমনোযোগিতা, অলসতা ও কালক্ষেপণের ফল না এটা শিশুর শিক্ষাগত স্তর যার বৈশিষ্ট্য বা সামর্থ্যই হলো এরকম ? তবে উভয় বিষয় যে এক সমান নয় এটা নিশ্চিত। যেমনিভাবে শিশুর বয়োঃস্তর ও তার জ্ঞানগত সামর্থ শাস্তি গ্রহণ ভালো মনে করে না। অতএব প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কিছু সামর্থ ও যোগ্যতা নিহীত রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ অভিমত হলো শিশুর সামর্থগুলোকে যথার্থ মূল্যায়ন করা। তার নিকট থেকে এমন কিছু কামনা না করা যার বাস্তবায়ন তার পক্ষে অসম্ভব। তাহলে আমরা অসম্ভব দায়িত্বপ্রদানকারী ব্যক্তির মত হবো।

মা-বাবা ও অভিভাবকের জানা কর্তব্য যে, সকল মানুষকে একই ছাঁচে রাখা সম্ভব নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগ্র মানুষের মধ্যে অনেক দিক থেকে পার্থক্য করেছেন। উচ্চতা, রং, পরিমাপ, গঠন, স্বচ্ছলতা, দারিদ্রতা, বুদ্ধিগত সামর্থ ও আভ্যন্তরীণ কর্ম তৎপরতা ইত্যাদি।

গা ও চামড়ার আগে বিবেককে আঘাত করা :

এই বয়োঃস্তরে শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে গা ও চামড়ার ওপর শাসন করার চেয়ে বেশি বিবেককে শাস্তির আশ্রয় নেয়া উচিত। কারণ তখন শিশুর নিকট এমন কতিপয় বুদ্ধিগত যোগ্যতার সৃষ্টি হয় যার দ্বারা সে বুঝতে, পরিতৃপ্ত হতে এবং নিজের পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনে সক্ষম হয়। সুতরাং দৈহিক শাস্তির আশ্রয়ের পূর্বে বিবেককে সম্মোধন করার পৃষ্ঠপোষকতা নেয়া অগ্রগণ্য। কারণ এ বয়সে বিশেষ করে এ স্ত রের শেষ বছরে দৈহিক শাস্তি কখনো বা অবাধ্যতা অথবা ঔদ্ধ্যত্যপনা সৃষ্টি করতে পারে- যার পর শিশুটি পুরোপুরি হাতছাড়া হয়ে যাবে। একেবারে বাইরে চলে শিশুটি মা-বাবা অথবা অভিভাবকের নিয়ন্ত্রনের।

শাস্তিদানে ধীরতা অবলম্বন :

দৈহিক শাস্তির আশ্রয় নেয়ার পূর্বে আরো কতগুলো স্তর রয়েছে শিশুর গঠনের ক্ষেত্রে অভিভাককে যা গ্রহণ করতে হবে। ইমাম গাজ্জালী র. বলেন, 'কোন অবস্থায় যদি নিয়মের একবার ব্যত্যয় ঘটে তাহলে এর থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়া উচিত। কখনোই তা জনসম্মুখে প্রকাশ করে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করবে না। কেউ অনুরূপ দুঃসাহস দেখাতে পারে বলে তিনি ধ্যান করছেন তার কাছে এটাও প্রকাশ করবে না। বিশেষ করে যখন শিশু নিজে তা ঢেকে রাখবে ও লুকানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। সেক্ষেত্রে তার কাছে এর প্রকাশ তাকে আরো দুঃসাহসী হতে প্ররোচিত করবে ফলে সে তা জনসম্মুখে প্রকাশিত হওয়ারও কোন ভ্রুক্ষেপ করবে না। অতঃপর দ্বিতীয় বার কর্মটি করলে গোপনে তাকে তিরস্কার করা উচিত। বিষয়টিকে তার সামনে বড় করে তুলবে ও তাকে বলবে : তুমি সামনে এধরনের কাজ আর করবে না! তোমার এরূপ কর্ম প্রকাশ পেলে তুমি মানুষের কাছে লজ্জিত হবে। প্রতি মুহূর্তে তিরস্কারমূলক কথা বলবে না। তাহলে মন্দ কর্ম সম্পাদন ও তিরস্কার শ্রবণ তার জন্য একটা তুচ্ছ বিষয়ে পরিণত হয়ে যাবে এবং তার অন্তর থেকে কথার মূল্যায়ন হ্রাস পাবে। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে বাবাকে অবশ্যই নিজের ভাবমর্যাদা রক্ষা করে কথা বলতে হবে। সুতরাং শিশুকে তিরস্কার করতে হবে তবে মাঝে মধ্যে। আর মা তো বাবার ভয় দেখিয়েই তাকে মন্দ কর্ম থেকে নিরস্ত্র করবেন।'[৮৯]

কোন রকমের ক্ষতি ছাড়া কষ্ট দেওয়া

অপরাধের ক্ষেত্র অনুযায়ী অভিভাবক যখন যা সমীচীন মনে করবেন সে দৈহিক শাস্তিটাই কেবল নির্বাচন করতে পারবেন। সেকারণে তার ওপর এটা উপলব্ধি করা কর্তব্য যে, দৈহিক শাস্তির মধ্যে কখনো এক প্রকারের যন্ত্রনাও থাকতে হবে। তাহলে প্রত্যাশিত লক্ষ্যটি বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু কখনোই তা ক্ষতিকারক হওয়া উচিত হবে না। যার ফলে পরিচর্যা ও প্রতিপালন করছে এই যুক্তিতে হাড় ভাঙ্গা অথবা আঘাত ইত্যাদির মত গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। সঠিক প্রতিপালনের প্রয়াস এ জাতীয় কর্মকে অনুমোদন করে না। এমনিভাবে শিশুর মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী কোন বিষয় থাকতে পারবে না তার মধ্যে। কারণ এটা তাকে মর্যাদা রক্ষায় বাড়াবাড়ি করতে অভ্যস্ত করবে। শিশুর মুখমণ্ডলে আঘাত করা ঠিক নয়। কারণ সেটা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। এমনিভাবে তার গায়ে থুথু নিক্ষেপ, শিশুর পোশাক ছিড়ে ফেলা ইত্যাদি অথবা তাকে নিন্দিত শব্দের দ্বারা গালি দেয়া উচিত নয়। কারণ এর মাধ্যমে মানব জাতির মর্যাদার প্রতি লাঞ্ছনা ও অবিচার করা হয়।

প্রতিশোধের জন্য নয় সংশোধনের জন্য শাস্তি

শাস্তি প্রদানের সময় অভিভাবকের স্বেচ্ছাচারিতা ও কঠোরতা কিছুই শিশুকে বুঝতে দেয়া উচিত হবে না। বরং তাকে বুঝাতে হবে যে, শাস্তিটা হলো শুধুমাত্র মমতা ও অনুগ্রহ প্রকাশসহ তার আচরণ সংশোধন ও পুনরায় ভুলটি না করার জন্য। এক্ষেত্রে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ

---

[৮৯].এহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন-৩/৭৩

প্রনিধানযোগ্য। তিনি যখন দেখতে পেলেন-জনৈক সাহাবী একজন মদ্যপকে গালি দিচ্ছে যার ওপর মদ্যপানের অপরাধে ইতিমধ্যে দণ্ডবিধি কার্যকর করা হয়েছে ; তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে গালি দিতে নিষেধ করলেন। আবু হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট মদ্যপায়ী জনৈক ব্যক্তিকে আনা হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন- 'তাকে তোমরা প্রহার করো! ফলতঃ আমাদের মধ্যে কেউ হাত, কেউ জুতা আবার কেউবা নিজের কাপড় দিয়ে প্রহার করতে লাগলো। অতঃপর যখন সকলে শাস্তি প্রদানের কাজ সম্পন্ন করলো। তখন তাদের মধ্য হতে কেউ বলে উঠলো : আল্লাহ তাআ'লা তোকে অপমানিত করুন! একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'তোমরা এরূপ বলো না! তার বিরুদ্ধে তোমরা শয়তানকে সহায়তা করো না। বরং তোমরা বলো ! আল্লাহ তাআ'লা তোমার প্রতি দয়া করুন।'[৯০]

উল্লেখ থাকে যে, অভিভাবক শিশুর প্রতি স্নেহ-মমতার অনুভূতি জাগ্রত করার ক্ষেত্রে যে ভুলত্রুটিগুলো করে থাকেন তার মধ্যে অন্যতম হলো: শাস্তি দানের পর সাথে সাথে তাকে আদর করতে তৎপর হওয়া। কখনো বা তাকে কিছু প্রদান অথবা কয়েক টুকরা মিষ্টি বা চকলেট ক্রয় করে দেয়া ইত্যাদি। এটা শাস্তির প্রত্যাশিত ফলাফলকে বিনষ্ট করে দেয়।

শাস্তির স্তরের বিভিন্নতা

সকল দৈহিক শাস্তি একই ধারায় প্রয়োগ করলে চলবে না বরং তারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর হলো শাস্তির উপকরণসমূহ প্রকাশ করা ; যেমন : লাঠি অথবা চাবুক। কারণ এটাই হলো যত্ন ও প্রতিপালনের মূল টার্গেট- যা শিশুকে কাংক্ষিত ও নান্দনিক আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 'লাঠি ঝুলিয়ে রাখো! এমনভাবে যে, ঘরবাসী তা দেখতে পায়।'[৯১] এরপর বারংবার অপরাধ সংঘটিত হলে এর দ্বারা ইঙ্গিত অথবা এটা ব্যবহারের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করা। অতঃপর মৃদু প্রহার যা যন্ত্রনাদায়ক হবে বটে কিন্তু ক্ষতিকারক হবে না। তবে কখনোই শিশুর শরীরের যে কোন স্থানে যথেচ্ছা প্রহার করা উচিত হবে না। কারণ তা শিশুকে অভিভাবকের প্রতি উদ্বেলিত ও তাকে অবমূল্যায়ন করতে প্ররোচিত করবে, যার শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে ইতিপূর্বে সতর্ক করা হয়েছে। এর ওপর যে প্রতিক্রিয়া আবর্তিত হবে তা হবে শিশুর জন্য দুঃশ্চিন্তার কারণ। বরং তার কর্তব্য হলো শিশুকে শাস্তি দেয়ার জন্য শরীরের স্থান নির্ধারণ বা নির্বাচন করা। সুতরাং হাড় ও স্পর্শকাতর স্থানে প্রহার করবে না। একই স্থানে বার বার প্রহার করবে না। হাত এতটা উচু করবে না যে বগলের শুভ্রতা পরিলক্ষিত হয়। বরং তার বাহু পার্শদেশের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে মোটা লাঠি অথবা লোহা ইত্যাদি ব্যবহার করা ঠিক হবে না।

ইবনে খালদুন বলেন, 'মুহম্মাদ বিন আবি যায়েদ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের করণীয় সম্পর্কে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে উল্লেখ করেন- 'শিশুদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারীর প্রয়োজনে তাদের প্রহারের ক্ষেত্রে তিনটি বেত্রাঘাতের বেশি করবে না। এ ক্ষেত্রে উমার রা. এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'শরিয়ত যে ধরনের শাস্তি অনুমোদন করেনি আল্লাহ তাআ'লা সে ধরনের শাস্তিতে সংশোধন রাখেননি।' লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির মাধ্যমে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া যায় না। এক্ষেত্রে শরিয়ত যে পরিমাণ নির্ধারণ করেছে,

---

[৯০].মুসনাদে আহমদ-৭৬৪৫

[৯১].মুছান্নাফে আব্দুর্ রাজ্জাক-৯/৪৪৭

ততটুকুই প্রয়োগ করার অধিকার রয়েছে। যেহেতু শরিয়তই তার কল্যাণ সম্পর্কে সম্যক অবগত আছে।[৯২]

শাস্তিপ্রদানের সময় উপহাস বা তামাশা না করা

আঘাত করে না এবং যার মধ্যে কোন পরিহাস অথবা বিদ্রূপাত্মক কিছু নেই এমন কোন শব্দ প্রয়োগ অভিভাবকের জন্য গালি বলে বিবেচিত নয়। কিন্তু সেটা শিশুর অপরাধ কর্মের প্রকার অনুযায়ী বিনিময় প্রদানের পর্যায় হতে হবে। এটাও এক প্রকারের প্রতিপালন। অতএব শিশু অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে যখন তাকে বলা হবে হে বিশ্বাস ঘাতক, তার বিশ্বাস ঘাতকতা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য। তাহলে এটা অকথ্য গালির পর্যায় পড়বে না। বরং এটা তার কর্মের অনুরূপ গালি হবে। যা তার নেতিবাচক আচরণকে ধরিয়ে দেবে ও দ্বিতীয় বার উক্ত কর্মের পুনরাবৃত্তি না করতে উৎসাহিত করবে। তবে অবশ্যই সেই শব্দগুলো তার ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্নকারী হতে পারবে না।

আব্দুল্লাহ বিন বিসির আল-মাযনী রা. বলেন, 'আমার মা আমাকে একগুচ্ছ আঙ্গুর দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পৌঁছানোর পূর্বে আমি সেখান থেকে কিছু আহার করে ফেলেছিলাম। অতঃপর আমি যখন তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট গেলাম, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কান ধরে বললেন- হে বিশ্বাস ঘাতক![৯৩] এটা নিঃসন্দেহে শিশুর থেকে একটি অশুদ্ধ আচরণ। সুতরাং এ কথার সঙ্গে কান ধরা ছিলো তার জন্য শিক্ষা ও দ্বিতীয় বার একর্মের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য তার প্রতি অনুপ্রেরণা। অনুরূপ ঘটনা নু'মান বিন বশির রা. এর সঙ্গেও সংঘটিত হয়েছিলো। তিনি বলেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য তায়েফ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রচুর আঙ্গুর এসেছিলো। আমাকে সেখান থেকে এক থোক দিয়ে বললেন- 'এটা নিয়ে তোমার মাকে দিও!' আমি তা পথের মধ্যে খেয়ে ফেলি। অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'আঙ্গুরের থোকটি কী করেছো? আমি বললাম, খেয়ে ফেলেছি। ফলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বিশ্বাস ঘাতক অভিহিত করলেন।[৯৪] সাহাবী নু'মান রা.ও তখন শিশু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হিজরতের পর মদিনায় তিনিই হলেন আনসারদের সর্ব প্রথম নবজাতক।

শিশু যখন আপনাকে জড়িয়ে ধরে অথবা আশ্রয় চায় তখন তাকে অশ্রয় দিন

শাস্তি প্রদানের সময় কখনো এমন হয় যে, শিশু যার কাছে সাপোর্ট পাবে বলে মনে করে তাকে জড়িয়ে ধরে। তার কাছেই আশ্রয় নেয়। বাবার নিকট আশ্রয় নেয় যদি শাস্তিটা মায়ের পক্ষ থেকে হয়। ঠিক যদি শাস্তিদাতা বাবা হন তখন মা অথবা কোন নিকটাত্মীয়র কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। অতএব যিনি শাস্তি প্রদানের নিয়ত করেছেন তার থেকে শিশুর আশ্রয়দাতাকে কোন অবস্থাতেই অবমূল্যায়ন করা ঠিক হবে না। বরং শাস্তি থেকে এমনভাবে হাত গুটিয়ে নেবে যেন কিছুই ঘটেনি। অন্যথায় শিশুর নিকট আশ্রয়দাতার মর্যাদা ক্ষণ্ন হবে। বরং এপ্রেক্ষিতে তার নিকট স্পষ্ট করতে হবে যে, সে শাস্তিযোগ্য অপরাধই করেছে বৈকি। তবে যার আশ্রয় নিয়েছে তাকে যদি আজ জড়িয়ে না ধরতো তাহলে তাকে অবশ্যই শাস্তিটা পেতে হতো অথবা তার সঙ্গে ভিন্নরূপ আচরণ করা হতো।

---

[৯২] . মুকাদ্দামাহ ইবনে খালদুন-৫০৮

[৯৩] তাহজিবুল কামাল-১৭/২৮১

[৯৪] প্রাগুক্ত

এক প্রকারের আশ্রয় হিসেবে শিশু কখনো কোরআন শরীফ স্পর্শ করে থাকে তার মা-বাবার নিকট কোরআনে কারীমের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে তার অবগতির কারণে। যেহেতু তাদেরকে প্রতিনিয়ত কোরআনে কারীম অধ্যয়ন ও তার পতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে দেখে। সুতরাং অভিভাবকের জন্য ক্রোধ তাড়িত হয়ে শিশুকে শাস্তি দেয়া উচিত হবে না। বরং তার অনিবার্য কর্তব্য হলো, এ দিকটাকে মূল্যায়ন করা ও 'সে এক দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে' এমর্মে শিশুর অন্তরে কোরআনে কারীমের মর্যাদা ও মহত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তা না হলে তিনি তাকে অবশ্যই শাস্তি দিতেন। যদি এমন হয় শাস্তি প্রদানের কোন বিকল্প নেই, তাহলে প্রথমে তাকে কোরআন শরীফ যথাস্থানে রেখে আসতে নির্দেশ করবে, তারপর তাকে শাস্তি দেবে। অথবা তাকে বলবে : তোমার কৃতকর্মের জন্য অবিলম্বে তোমাকে জবাবদিহী করবো কিন্তু কোরআন শরীফ রেখে দেয়ার পর; আমি এমন একটি সময়ের অপেক্ষায় আছি যখন তুমি এর থেকে অনেক দূরে থাকবে।

কখনোবা শিশু আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে। এক্ষেত্রে অভিভাবকের কর্তব্য হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা 'কেউ আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমাদের নিকট কিছু চাইলে তাকে দিয়ে দাও এবং তোমাদের থেকে যে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়, তাকে আশ্রয় দাও !....'[৯৫] এর অনুকরণে তাকে শাস্তি দেয়া হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে। কখনো এমন হয় যে, শিশু নামাজের মাধ্যমেও আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে নামাজের মাহাত্ত্ব সম্পর্কে তার অবগতির কারণে। অভিভাবক কোরআনে কারীমের ক্ষেত্রে যে পথ অবলম্বন করেছে এখানেও সেই একই পথে তাকে চলতে হবে। এমতাবস্থায় আবেগতাড়িত হয়ে শিশুকে নামাজ থেকে টেনে বের করা ও তাকে শাস্তি দেয়া অভিভাবকের জন্য চরম অন্যায়। কারণ এ জাতীয় কর্মের দ্বারা শিশুর অন্তর থেকে ইবাদতের ভাব-গাম্ভীর্য বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রকৃত বাস্তবতা হলো শিশুর থেকে এ ধরনের তৎপরতার মধ্যে অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। কারণ অভিভাবক ক্রোধান্বিত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দিলে তাতে শিশুর অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। সে কারণে এ অবস্থায় শাস্তি না দিয়ে বরং এ পরিমাণ কালক্ষেপণ করা উচিত যাতে ক্রোধের তীব্রতা প্রশমিত হয়ে যায়।

ইচ্ছাকৃত ও ভুলক্রমে অন্যায়, এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়

কথা অথবা কর্মের বিরোধিতার শাস্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই যার কারণ ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা ও যার কারণ ভুলক্রমে অবাধ্যতা এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা একান্ত কর্তব্য। কারণ সকল অপরাধ মূল্যায়নের ক্ষেত্র এক সমান নয়; মূর্খ্যতা ও অজ্ঞতার সমাধান হলো শিক্ষা, শাস্তি নয়।

'যে সকল সংঘটিত অবাধ্য কথা ও কর্ম মুর্খতা বা অজ্ঞতার ফসল তাতে কোন শাস্তি নেই' যখন এটা মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত হয়ে গেলো। তাহলে সে কথা বা কর্ম থেকে যথাযথ পন্থায় বিরত রাখা বা নিষেধ করা এর পরিপন্থী নয়। জনৈক ব্যক্তি নামাজের মধ্যে কথা বলছিল অথচ সে এর হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ। লক্ষ করুন, এ লোকটি কোন শিশু ছিল না। ছিলো একজন পুর্ণ বয়স্ক পুরুষ। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়টির প্রতিকারের জন্য শুধুমাত্র একটিই ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাহল, তাকে নামাজের নিয়মাবলী শিক্ষা দেয়া। তিনি বললেন- 'নিশ্চয়ই মানুষের সঙ্গে যেরূপ কথা বলা হয় নামাজের মধ্যে সেই কথা বলা যায় না। বরং নামাজ হলো তাসবীহ, তাকবীর ও কোরআন তেলাওয়াত।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই পদক্ষেপে মুগ্ধ হয়ে উক্ত সাহাবী রা. তার সঙ্গে সংযুক্ত করে বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবেমাত্র নামাজ সমাপ্ত করেছেন; 'আমার মা-

[৯৫].মুস্তাদরেকে হাকেম-২/৭৩

বাবা তাঁর জন্য উৎস্বর্গ হয়ে যাক! তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে উত্তম শিক্ষক জীবনে আমি দেখিনি। আল্লাহর শপথ ! তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার প্রতি কোন কঠোরতা আরোপ করেননি, আমাকে প্রহার করেননি এবং আমার সঙ্গে একটি কটু বাক্যও ব্যবহার করেন নি।'[৯৬]

আদেশ পরিত্যাগ ও নিষেধ কাজ করার মধ্যে শাস্তিপ্রদানের ক্ষেত্রে পার্থক্য করা

করণীয় পরিত্যাগ করা ও বর্জনীয় সম্পাদনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে। তবে দ্বিতীয়টা বেশ কঠিন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-'তোমাদেরকে কোন ব্যাপারে নিষেধ করলে তা পরিহার করো ও কোন কর্মের আদেশ করলে তা যথাসাধ্য সম্পন্ন করো!'[৯৭] এখানে কাংক্ষিত কর্মটিকে সামর্থের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। অথচ বর্জনীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়টিকে নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ভুলের দিকটাকেও মূল্যায়ন করতে হবে। সুতরাং পার্থিব বিষয় সংক্রান্ত ভুল-ত্রুটির চেয়ে ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত ভুল-ত্রুটিসমূহ গুরুতর হিসেবে বিবেচিত হবে। আনাস বিন মালেক রা. বলেন, 'আমি সুদীর্ঘ দশটি বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খাদেম ছিলাম। অথচ এ দীর্ঘ সময়ে কখনো তিনি আমাকে এটা কেন করলে? ওটা কেন করনি? এমনকি উহ্ শব্দটি পর্যন্ত বলেননি।[৯৮] এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পার্থিব বিষয়ে তাকে কোনরূপ পর্যবেক্ষণ করেননি। অতএব অভিভাবক কর্তৃক শিশুর সঙ্গে আচার-আচরণের মাধ্যমে শিশুকে বুঝিয়ে দিতে হবে; ধর্মীয় বিষয়, আচার-ব্যবহার অথবা চারিত্রিক ভুল-ক্রটি এবং জাগতিক অথবা জীবন সংক্রান্ত ভুল-ক্রটির মধ্যে পার্থক্য কি?

এখানে যে বিষয়টা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হলো, এমন কতিপয় ক্রটিপূর্ণ কর্ম রয়েছে যা শিশু আরম্ভ করে ফেললে জ্ঞানের কথা হলো, তাকে তা সম্পন্ন করতে সুযোগ দেয়া। ফলে সে নিজের থেকেই তা হতে ফিরে আসতে সক্ষম হবে। কারণ তা সম্পন্ন করা হতে নিষেধ করলে তখন ক্ষতির পরিমাণটা বেশি হয়ে যেতে পারে। যেমন একটি শিশু মসজিদের মধ্যে প্রশ্রাব করছে। আপনি যদি ওকে ধমক দিতে যান তাহলে দেখতে পাবেন আপনার ভয়ে সে মসজিদের অবশিষ্ট অংশও অপবিত্র করে ফেলবে। পক্ষান্ত রে তাকে কোনরূপ ভীতি প্রদর্শন না করে প্রশ্রাব পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে ছেড়ে দেন। এরপর যদি মসজিদ হতে কোন সরু পথ ধরে তাকে বের করে আনতে পারেন, তাহলে খুব সহজেই তার ও মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করা সম্ভব হবে।

অতঃপর তার কাছে মসজিদের মর্যাদা ও গুরুত্ব স্পষ্ট করে তুলে ধরবেন। বলবেন, মসজিদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সংরক্ষণে ঘরের আসবাব পত্রের চেয়ে অনেক বেশি যত্নবান হতে হবে। যেহেতু মসজিদ শুধুমাত্র আল্লাহর জিকির ও নামাজের জন্যই নির্মাণ করা হয়েছে। এরপর শিশুটি যে স্থানটায় প্রশ্রাব করেছে তা আপনি ভালো করে পরিষ্কার ও পবিত্র করে ফেলুন। জনৈক বেদুঈনের মসজিদে নববীতে প্রশ্রাব সংক্রান্ত হাদিসের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। যেহেতু অজ্ঞতা ও না জানার দরুণ এমনটি করেছিলো সে কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোন শাস্তি দেননি। বরং তাকে সংশোধন ও শিক্ষা দিয়েছেন। উপরন্তু তার চলমান প্রশ্রাব বন্ধ করেও দেননি। অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্রাবের ওপর পানি ঢালতে বললেন, যাতে স্থানটি পবিত্র হয়ে যায়।

---

[৯৬].মুসলিম-৮৩৬

[৯৭].বুখারী-৬৭৪৪, মুসলিম-৪৩৪৮

[৯৮] .বুখারী-৫৫৭৮ , মুসলিম-৪২৭২

অভিভাবক যখন জানতে পারবে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তার পদ্ধতি কি হবে? সঠিক না ভুল পদ্ধতি। তাহলে সে নিজেকেই একটি প্রশ্ন করবে, সন্তান যদি কোন ভুল করে অথবা কোন ভুল কর্ম করে বসে, তাহলে কি সেই সন্তান তার কাছে গিয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করবে যে, এই ভুল কর্ম থেকে কিভাবে বের হওয়া যায় অথবা শাস্তির আশঙ্কায় তা তার থেকে লুকাতে চায় ? সন্তান যদি তার অভিভাবকের নিকট আগমন থেকে বিরত না থাকে। বরং তার নিকট এসে তা থেকে বের হওয়ার পথ জানতে চায়। তখন শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার পদ্ধতিটাই হতে হবে একটি সুন্দর পদ্ধতি। পক্ষান্তরে শিশু যদি অভিভাবককের দেখে ভয় পায় ও কোনভাবেই তার অন্যায় অভিভাবকের সম্মুখে প্রকাশ করতে না চায়। উপরোক্ত অপরের ভুল কর্মও অনুসন্ধান করে বেড়ায় ও নিজের কুকর্ম অভিভাবক থেকে লুকিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। এ অবস্থায় তার শাস্তির পদ্ধতিটা হবে ভুল।

পরিমিত শাস্তি দান

আমরা এখানে বিশেষভাবে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব যে বিষয়টির ওপর তা হলো, শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে পরিমাপ না করা অথবা শাস্তি প্রদানে বাড়াবাড়ি করা। দুটোই কিন্তু প্রতিপালনের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেষ্ট অভিভাবকের অনুতাপ অথবা দুঃশ্চিন্তার কারণ হবে। এর ফলে শিশুর ওপর যে রোগ ও বিপদ আপতিত হবে আমরণ সেটা তাকে বহন করে বেড়াতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায় :

নির্দেশনা ও উপদেশাবলি

(পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত নির্দেশনা ও উপদেশাবলির সাথে বয়োঃস্তরের পার্থক্য বর্ণনাসহ এটা একটি সম্পূরক আলোচনা)

সন্তানের জন্য একজন অভিভাবক নিযুক্ত করা

অভিভাবকদের নিকট সন্তান পরিচর্যা ও প্রতিপালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তবে কখনো তাদের অবস্থা ও ব্যস্ততা নিজ সন্তানদের যত্ন ও প্রতিপালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। তাই যাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা রয়েছে তারা নিজের সন্তানদেরকে অনর্থক ছেড়ে না দিয়ে তাদের জন্য একজন অভিভাবক ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারী নিযুক্ত করে দেবে।

আগের যুগের মুসলমানগণ তাদের সন্তানদের জন্য অভিভাবক ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারী নিযুক্ত করতেন। প্রতিপালন বিষয়ে তাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দান করতেন। এরকম অসংখ্য বিষয় তাদের নিকট প্রচলিত ছিলো। তার মধ্য হতে ইবনে খালদুন যা উল্লেখ করেছেন তাও রয়েছে। তিনি বলেন, 'শিক্ষাদানের সর্বাপেক্ষা উত্তম পদ্ধতি সেটাই যা হারূন রশীদ তার সন্তানদের শিক্ষকের জন্য উপস্থাপন করেছেন। আহ্মারের প্রতিনিধি বললেন- 'আমার নিকট হারূন রশীদ পাঠালেন তার ছেলে মুহাম্মাদ আল-আমীনকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। অতঃপর হারূন রশীদ বললেন- হে আহমার! আমিরুল মু'মিনীন তার প্রাণীশক্তি ও হৃদপিন্ডের ফল তোমাকে প্রতি অর্পণ করেছেন। সুতরাং তার প্রতি তোমার হাত সম্প্রসারিত করে রাখো। তোমরা আনুগত্য করা তার কর্তব্য। তুমি তার সঙ্গে এরূপ হয়ে যাও যেন আমিরুল মু'মিনীন তোমাকে নিজের দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন। তাকে কোরআনে কারীমের পাঠ শিক্ষা দাও। ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করাও।

কবিতা আবৃতি ও হাদীস শিক্ষা দাও। হাদীসের সূচনা ও অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট দেখাও। তাকে হাসতে নিষেধ করো কিন্তু শুধুমাত্র তার জন্য নির্ধারিত সময়। বনি হাশেমের মাশায়েখে কেরাম শুভাগমন করলে তাদের সম্মান করতে বল। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যখন তার কাছে আসবে তাদের মর্যাদা দিতে বল। তোমার কাছ থেকে যেন এক মুহূর্তও অনুপস্থিত না থাকে। তাকে কোনরূপ দুঃশিন্তায় ফেলবে না যাতে শিশুর কচি মনটা মরে যায়। তাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করবে না। ফলে যখন অবসর পাবে তখন তা করা শুরু করবে যা সে পছন্দ করে। যথাসম্ভব তাকে নৈকট্য ও নম্রতার দ্বারা গঠন করো। পক্ষান্তরে যদি সে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তার ওপর কঠোরতা আরোপ করতে হবে।'[৯৯]

উতবাহ বিন আবু সুফিয়ান তার সন্তানদের শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারী আব্দুস সামাদকে বলেন, 'কোন শিশু-সন্তানের সংশোধনের পূর্বে তোমার নিজের সংশোধন করে নেয়া উচিত। কারণ শিশুদের চক্ষুসমূহ আপনার চক্ষুর সাথে আবদ্ধ। কাজেই আপনি যা উত্তম মনে করবেন তা-ই ওদের নিকট উত্তম। আর আপনি যা মন্দ মনে করবেন তা-ই ওদের কাছে মন্দ। শিশুদেরকে কোরআনে কারীমের শিক্ষা দিন! তবে এক্ষেত্রে প্রবল চাপ প্রয়োগ করবেন না, ফলে তারা অনীহা প্রকাশ করতে পারে। আবার ওদেরকে একেবারে ছেড়েও দিবেন না যাতে ওরা তা পরিত্যাগ করতে পারে। এরপর কবিতা গুচ্ছ থেকে মার্জিতটুকু তাকে আবৃত্ত করান এবং হাদীস থেকে সর্বশ্রেষ্ঠটা তাকে শিক্ষা দিন! তাদেরকে এক পাঠ ভালো করে না শিখিয়ে অন্য পাঠে নিয়ে যাবেন না। কারণ কানের মধ্যে অনেক কথার ছড়াছড়ি ওদের মনের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। আমার ভয় দেখাবেন; কিন্তু আমাকে ব্যতীত শিক্ষা দেবেন। আপনি একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মত হবেন যিনি রোগ নির্ণয়ের পূর্বে ব্যবস্থাপত্র দেন না। তাদেরকে মহিলাদের সঙ্গে কথোপকথন হতে দূরে রাখবেন। ওদের নিকট বিজ্ঞজনদের জীবনালেখ্য বর্ণনা করুন। আপনি ওদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করে সমৃদ্ধ করুন আমিও আপনাকে বাড়িয়ে দেব। ওদের শিষ্টাচার শিক্ষাদান বৃদ্ধি করুন আমি আপনার পারিতোষিক বৃদ্ধি করে দেব।[১০০]

এগুলো সন্তানের শিষ্টাচার শিক্ষাদান ও তাদের প্রতিপালনে মহা মূল্যবান কয়েকটি উপদেশ। প্রত্যেক অভিভাবকের উচিৎ এর থেকে উপকৃত হওয়া।

নববী শিষ্টাচারের সঙ্গে শিশুকে বেঁধে রাখা

এ পর্যায় কিছূ নববী শিষ্টাচার রয়েছে যা এই স্তরের জন্য প্রযোজ্য। ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। 'তোমাদের সন্তানাদিকে নামাজের শিক্ষা দাও।' এখানে ওদেরকে নামাজ শিক্ষা দিতে বলেছেন, যখন তারা সাত বছরের শিশু ছিলো। উল্লেখিত বয়সে শিশুদেরকে নামাজের শিক্ষা দেবে নির্দেশ মূলকভাবে অথবা এর পূর্বে সৌজন্য মূলকভাবে। যদি শিশু এটা বুঝতে পারে তাহলে ওদেরকে অজুর পদ্ধতি শিক্ষা দিবেন। অজু ভঙ্গের কারণও জানিয়ে দিবেন। যেমনিভাবে ওদেরকে নামাজ ও প্রত্যেক নামাজের রাকাত সংখ্যা, নামাজের পদ্ধতি ও সময় সম্পর্কে শিক্ষা দিবেন। নামাজ ভঙ্গের কারণও জানিয়ে দিবেন। ওদেরকে স্মৃতি সহজ জিকির ও দোয়াসমূহ মুখস্ত করাবেন। শিশুদেরকে জামাত, জুমআ'র খুতবা, তারাবীহ ও দুই ঈদের নামাজে উপস্থিত হওয়ার প্রতি অনুপ্রাণিত করবেন। একাজে অভ্যস্ত করার জন্য ওদেরকে সাথে করে মসজিদে নিয়ে যাবেন। শিশুর বয়স দশ বছরে পৌঁছলে এ ব্যপারে কঠোরতা আরোপ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাবে না। এমনকি এরপরও যে শিশু নামাজে অলসতা দেখাবে তাকে

[৯৯] মুকাদ্দামা ইবনে খালদূন, পৃ ৫০৮

[১০০].যামহারাহ খুতাবিল-আরব-২/২২৪-২২৫

শিষ্টাচার শিক্ষা ও তিরস্কার করার জন্য প্রহার করা যাবে। তবে পূর্বে উল্লেখিত শাস্তিদান পদ্ধতি এক্ষেত্রে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিছানা পৃথক করে দিতে নির্দেশ করেছেন। যেন প্রত্যেকের জন্য আলাদা বিছানা হয়। বাড়ী যদি প্রশস্ত হয় তাহলে ছেলেদের জন্য আলাদা কক্ষ ও মেয়েদের জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করবে। তার মধ্যেও অবশ্যই প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন বিছানা হতে হবে। বিছানা পৃথক করার নির্দেশও এক প্রকারের সতর্কতামূলক পরিচর্যা যা সংশ্রবের ক্ষতিকর বিষয় হতে রক্ষা করবে। এখানে এ দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, কন্যা শিশু ও ছেলে শিশুর এই বয়সে তাদের অগোচরে যদি বয়ঃসন্ধি ঘটে যায় তাহলে একই বিছানার সংশ্রবের দরুণ ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। এই বয়োঃস্তরে যে বিষয়টির ওপর একান্তভাবে সতর্ক করা উচিত তা হলো; কন্যা তার ভাইদের সামনে আঁটসাট পোষাকে বের হবে না। যথা- স্কার্ট পরিধান করা অথবা স্কন্ধ ও বাহুযুগল উম্মুক্ত রাখা, উরুযুগল ও পেট খুলে রাখা ইত্যাদি। এ বয়সে কন্যা শিশুটিকে দৃষ্টি অবনমিত রাখতে ও অপরের গোপন অঙ্গ স্পর্শ ও তার দিকে না তাকানোর শিক্ষা দেবে।

আত্ম সংশোধন শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া

শরিয়তের পরিভাষায় আত্মা সম্পর্কে বেশ আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা আত্মা সম্পর্কে বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. (الشمس-9-10)

'নিশ্চয় সে সফলকাম হয়েছে যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে। এবং সে ব্যর্থ হয়েছে যে একে কলুষিত করেছে।'[১০১]

তিনি আরো বলেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. (النازعات-40-41)

'আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাস স্থল।'[১০২]

এ আয়াতগুলো আত্মার প্রতি যত্ন নেয়ার গুরুত্বকে স্পষ্ট করে দেয়। ফলে আত্মা থেকে দোষক্রটিকে 'না' বলে দেয়া হয়। কথা ও কাজের মাধ্যমে আত্মাকে নির্মল ও পরিশুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালায়। অভিভাবকের জন্য শিশুর বয়োঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করা ঠিক নয়। এরপর সে শিশুর আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও সমূহ ক্রটিবিচ্যুটি থেকে নিষ্কলুষ করবে। বরং তার সাথে ভালো-মন্দ নির্ণায়ক বয়স আরম্ভের সাথে সাথে এ বিষয় তার সঙ্গে সূচনা করবে। তার সামনে স্পষ্ট করে তুলবে যে, আল্লাহ তাআ'লা তার সকল ব্যাপারে অবগত, তার কোন কিছুই তার কাছে লুকায়িত নেই। কেরামান কাতেবীন ফেরেশ্‌তা তার ভালো-মন্দ সকল কর্ম লিপিবদ্ধ করে রাখছেন। সুতরাং তাকে কল্যাণকর কাজের নির্দেশ করবে এবং অন্যায় ত্যাগ ও নিজের আত্মার পর্যবেক্ষণের দিকে আহ্বান জানাবে। তার সামনে ফুটিয়ে তুলবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে তার চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. কে আল্লাহর তাআ'লার ধ্যান করতে এবং আল্লাহ তাআ'লার আদেশ নিষেধ সংরক্ষণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস রা.

[১০১] সূরা আস শামস, আয়াত ৯-১০

[১০২] সূরা আন নাযেআত, আয়াত ৪০-৪১

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পেছনে ছিলাম। তিনি বললেন- ‘হে বৎস, আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিচ্ছি শোন। তুমি আল্লাহর হুকুম সংরক্ষণ করো। তাহলে আল্লাহ তাআ’লাও তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহর হুকুমকে রক্ষা করলে আল্লাহকে তোমার নিকটেই পাবে.........।’[১০৩] এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এই ধ্যান মগ্নতার ওপর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাকে ইহকালে সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন। পরকালে জাহান্নাম ও তার শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। কারণ, সে আল্লাহর হকসমূহ সংরক্ষণ করলো ও তার সমৃদ্ধি অর্জনে ধন্য হলো। ফলে আল্লাহ তাআ’লা তার সঙ্গী হবেন ও তাকে কখনো ছেড়ে যাবেন না। অতএব ভারসাম্য রক্ষা করে আত্মশুদ্ধি ও আত্মাকে নির্মল করার দ্রুত প্রশিক্ষণ প্রদান শিশুকে তার প্রতিপালকের ধ্যানমগ্ন হতে ও আত্ম সমালোচনা করতে অভ্যস্ত করবে। ফলতঃ এর একটা ভাল প্রভাব তার পরবর্তী জীবনে পড়বে।

কোরআনে কারীমের অংশ বিশেষ মুখস্থ করানো

কোরআনে কারীম হলো মহামহিমান্বিত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআ’লার বাণী। যার মধ্যে নিহিত আছে সমগ্র মানব জাতির ইহ-পারলৌকিক সার্বিক কল্যাণ ও সৌভাগ্য। অতীতে ও বর্তমানে কোরআনের মর্যাদা অনুযায়ী মুসলমানগণ আপন নেতৃত্ব গ্রহণ করে নিয়েছে। মুসলিম উম্মাহর কাংক্ষিত মর্যাদা ও হৃত গৌরব আল্লাহর কালাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর আনুগত্য ব্যতীত কখনোই উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সুতরাং কোরআনে কারীম নিজেরা মুখস্থ করা এবং সন্তানদেরকে তা মুখস্থ করানো আমাদের কর্তব্য। আধুনিক পাঠ্যক্রম প্রমাণ করেছে যে, এ বয়সে শিশুর স্মরণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর থাকে।[১০৪] অতএব অভিভাবকদেরকে শিশুদের এই সামর্থ্যকে কোরআনে কারীম হেফ্জ করা ও অধিকাংশ মুসলিম দেশসমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাহফিজুল কোরআনের আসরে তাদেরকে অংশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উত্তমরূপে কাজে লাগাতে হবে। শিশু যেটা হিফ্জ করতে চায় তা কয়েকবারের বেশি তাকে পুনরাবৃত্তি করতে হয় না। এমনি করে সে আল্লাহর ইচ্ছাই হাফেজে কোরআন হয়ে যাবে।[১০৫] এ প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদও রয়েছে। ‘শৈশবের শিক্ষা যেন পাথরে অংকন করা।’

অতীতে ও বর্তমানে এমন অসংখ্য হাফেজ রয়েছে যারা শৈশবকালেই কোরআন হেফ্জ করতে সক্ষম হয়েছেন। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘তাফসীর সংক্রান্ত বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো। কারণ আমি কোরআন কারীম হেফ্জ করেছি যখন আমি ছোট ছিলাম।’[১০৬]

ইমাম বুখারী রহ. তার গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি অধ্যায় রেখেছেন। তার শিরোনাম করেছেন : ‘শিশুদেরকে কোরআনে কারীম শিক্ষা দান।’ কুরআনে কারীম হেফজের দ্বারা শিশুর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এমনকি সে নামাজে জামাতে অগ্রগামী হয় ও অনেক বড় বড় শায়খদেরও ইমামতি করে যদি তার হিফজের পরিপক্কতা তাদের চেয়ে বেশি হয়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে বলেছেন, ‘তোমাদের ইমামতি করবে যে তোমাদের মধ্যে বেশি কোরআন সম্পর্কে জানে।’ উমার বিন সালিমাহ রা. তার সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন, ‘তারা লক্ষ করে দেখলেন আমার থেকে বেশি কোরআন

---

[১০৩] .তিরমিজি-২৪৪০

1.أنظر: مشروع برنامج تربوى أسلامى لإصلاح النفس،ل–د /عبدالحى الفرماوى

2.أنظر: علم نفس النمو،ل: د/ هشام محمد مخيمر ص 132

.

[১০৬]. ফাতহুল বারী-৯/৮৪

সম্পর্কে অভিজ্ঞ কেউ নেই। কারণ আমি অশ্বারোহী (মুসলিম যোদ্ধা) দের কাছে কোরআন শিখেছিলাম। অতএব ইমামতির জন্য তারা আমাকেই সামনে পাঠাল। অথচ আমি তখন ছয় অথবা সাত বছরের শিশু মাত্র।'[১০৭]

উপকারী খেলাধুলার উপযুক্ত সুযোগ দান

শিশুর সময়ের প্রতি অভিভাবককে যত্নবান হতে হবে যেন অকারণে সময় নষ্ট না হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করে শিশুকে সকল প্রকার খেলাধুলা-যা মনকে সতেজ ও অন্তরকে প্রশান্তি দেয় থেকে বঞ্চিত করা উচিত হবে না। খেলাধুলার আয়োজন যদি এ প্রক্রিয়ায় হয় তবে তা অহেতুক সময় অপচয়ের পর্যায় পড়বে না। বরং তা সময়ের প্রতি যত্নবান হওয়ারই নামান্তর। কারণ তা অন্তরকে সুসংহত করে ও প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে দেয়। আর সে কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শিশুদেরকে খেলতে দেখতেন তখন এ ধরনের খেলাধুলা থেকে তাদেরকে নিষেধ করতেন না। যেহেতু এর থেকে নিষেধ করলে অন্তরের প্রফুল্লতা ও সতেজতায় একটা বিরূপ প্রভাব পড়বে। আনাস রা. বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যখন আমি শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করছিলাম। তখন তিনি আমাদের সকলকে সালাম করলেন। অতঃপর আমাকে ডেকে তাঁর এক কাজে পাঠালেন।'[১০৮]

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেলাধুলা করতে দেখেও তাদেরকে নিষেধ কিংবা তিরস্কার করেননি। কারণ শিশুদের এই বয়সে খেলাধুলার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবগত ছিলেন। সেকারণে তাদেরকে বেশ স্নেহ ও মমতা জ্ঞাপক সালাম করলেন। ইমাম গাজ্জালী রহ. বলেন, '(শিশুর জন্য ঘোষণা দিবে) পাঠশালা থেকে ফেরার পর সুন্দর খেলাধুলা করবে, যাতে পাঠশালার ক্লান্তি থেকে একটু প্রশান্তি ফিরে পায়। তবে দেখতে হবে খেলাধুলায় যেন আবার ক্লান্ত হয়ে না পড়ে। শিশুকে যদি খেলাধুলা থেকে নিষেধ করা হয় ও সর্বদা তাকে পড়াশুনার মধ্যেই ব্যস্ত রাখা হয়। তাহলে তার অন্তর মরে যাবে, মেধা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ফলে তার জীবনযাত্রা হবে দুর্বিষহ। এমনকি সে তখন মৌলিকভাবে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ফন্দি খুঁজতে থাকবে।[১০৯]

অগ্রগামীতার প্রশংসা ও অনুপ্রেরণার মাধ্যমে শিশুর বিকাশ সাধন

অগ্রগামীতার দু'টি অর্থ। প্রথমতঃ কাংক্ষিত কর্ম বিলম্ব না করে যথাসময়ে সম্পন্ন করা। শিশুদেরকে এ বিষয়ের ওপর অভ্যস্ত করা ও প্রশংসা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদেরকে এ ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা উচিত। যেমন- সময়মত নামাজ আদায়ে পারস্পারিক প্রতিযোগিতা অথবা পাঠ পর্যালোচনা ও প্রশিক্ষণের উত্তর দানে প্রতিযোগিতা। এর ফলাফল সাধারণত তখনই প্রকাশিত হবে যখন কর্মসম্পাদনে কোন অনাহুত অন্তরায় সৃষ্টি হবে অথবা প্রত্যাশিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিলম্ব হবে। যদি প্রতিযোগিতারত অবস্থায় বিলম্ব ঘটে সেক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সাধনে পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে।

পক্ষান্তরে কর্মসম্পাদনকে যদি তার সর্বশেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা হয়। এরপর যদি কোন কারণে সেটা আরো বিলম্ব করতে হয়। সেক্ষেত্রে সৃষ্ট বাধার কুফল পুষিয়ে নেয়ার আর কোন সুযোগ থাকবে না। ফলে প্রত্যাশিত কল্যাণ হাতছাড়া হয়ে যাবে অথবা তা সম্পাদনে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। সে কারণেই শিশুদেরকে প্রতিযোগিতায় অনুপ্রাণিত করা ও এক্ষেত্রে তাকে সহায়তা করা উচিত। যেমন অভিভাবক

---

[১০৭] .বুখারী-২৯৬৩

[১০৮]. মুসলিম, হাদীস নং ৪৫৩৩

[১০৯] .এহয়ায়ে উলুমুদ্দীন-৩/৭৩

নিজেই এ বিষয়ে একজন আদর্শ হতে পারেন। ফলশ্রুতিতে শিশুর প্রতিযোগিতার জন্য তা একটি নির্দেশনা ও মাইলফলক হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ প্রতিযোগিতার অর্থ হলো উদ্ভুত পরিস্থিতিতে শিশুর পক্ষ থেকে স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে অগ্রগামীতা। অর্থাৎ কারো পক্ষ থেকে উক্ত কর্ম সম্পাদনে তাকে আবেদন ব্যতিরেকেই সে অগ্রগামী হয়ে থাকে। যথা- কোন অভাবীর প্রতি অনুগ্রহ করা। দরিদ্রকে সাহায্য করতে অগ্রসর হওয়া। অথবা কম্পিউটার সামগ্রী অন/অফ করতে অগ্রগামীতা যখন সে এটা ভালো করে জেনে থাকবে ও তার নিকটজন এটা অফ করতে ভুলে যাবে তখন সে এটা করতে পারে। এ জাতীয় অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। এই অগ্রগামিতাকে সাদরে গ্রহণ করে এ ব্যাপারে শিশুকে আরো উৎসাহিত করতে হবে। কারণ এটা শিশুর দ্রুত পরিপক্ক হওয়ায় সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। পরিবেশ ও সমাজের সঙ্গে তার আচার ব্যবহারে সমৃদ্ধি আনয়ন করবে। শিশুর এই অগ্রগামিতাই একদিন সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির কারণ হবে। ফলে তাকে পেশ করা যাবে এক যোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে একটি সঠিক দাওয়াতের জন্য যার কারণে সে অফুরন্ত কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি মাইমুনা বিনতে হারেছ এর গৃহে অবস্থান করছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য অজুর পানি এনে রাখলাম। অতঃপর তিনি যথাস্থানে পানি দেখে বললেন- 'এটা কে রেখেছে?' মাইমুনা রা. উত্তরে বললেন, 'আব্দুল্লাহ'। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন- 'হে আল্লাহ, তুমি ওকে দীনে ইসলামের জ্ঞান দান করো ও আব্দুল্লাহকে কোরআনে কারীমের তাফসীর শিক্ষা দাও।'[১১০] লক্ষ করুন, এখানে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. কারো প্ররোচনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য অজুর পানি রাখতে অগ্রসর হননি বরং সম্পূর্ণ নিজের পক্ষ থেকেই এমনটি করেছেন তিনি। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করেন এটা তিনি জানতেন বিধায় যথাস্থানে পানি রাখতে অগ্রসর হয়েছেন যাতে তিনি সজাগ হয়েই তা দ্বারা অজু সম্পন্ন করতে পারেন। যা ইবনে আব্বাসের একটি দাওয়াতী চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ চরিত্রের অনুকূল দুআ করলেন। মুসলিম উম্মাহ দেখেছে, তিনি মুসলিম উম্মাহর বিদগ্ধ আলেম ও কোরআনে কারীমের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকর হয়েছেন।

হাদীস শরীফে ইবনে আব্বাসের রা. অপর একটি তৎপরতার কথা বর্ণিত আছে। একদা তিনি নিজ ফুফি মাইমুনা বিনতে হারেছের রা. গৃহে রাত্রি যাপন করেন, (হাদীসের ধরন ও গঠনে প্রতীয়মান হয় এটা পূর্বের ঘটনা থেকে ভিন্ন এক ঘটনা) এটা দেখার জন্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করে থাকেন? সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা যখন তাহজ্জুদ নামাজের জন্য দাঁড়ালেন তিনিও তাঁর মত দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা যা করলেন তিনিও তা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাকে একাজে উৎসাহিত করছিলেন। তাঁর হস্ত মুবারক ইবনে আব্বাসের রা. মাথায় রাখলেন ও তার কান ধরে মর্দন করলেন যাতে নামাজে ঘুমাতে না পারে।[১১১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এই অগ্রগামিতায় তাকে অনুপ্রেরণা দিলেন। 'সে ছোট তার পক্ষে এ কঠিন কাজ করা সম্ভব নয়' এই যুক্তিতে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিরত রাখার চেষ্টা করেননি। পক্ষান্তরে

---

[১১০] .সহিহ্ ইবনে হিব্বান-১৫/৫৩১ , হযরত মাইমুনা এবনে আব্বাসের ফুফু , এবনে আব্বাস শিশু ছিলেন তখনও সাবালক হননি।

[১১১].বুখারী-১৭৭ ,মুসলিম-১২৭৫

তার এই তৎপরতা অব্যাহত রাখতে সহায়তা করার জন্য তার মাথায় হাত বুলালেন ও তার কান মর্দন করলেন। অতএব শিশুর আত্মপ্রত্যয়, উদ্যম ও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অগ্রগামী তৎপরতা থাকলে তাকে এ ব্যাপারে আরো উদ্বুদ্ধ করা ও তার এ কর্ম তৎপরতার মূল্যায়ন করা উচিত।

কিন্তু কখনো কখনো এ অগ্রগামিতা প্রত্যশার অনুকূল না হয়ে বরং সম্পূর্ণ উল্টো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে - এটা বাস্তব- তখন তার সমাধান কি হবে? এ পরিস্থিতিতে শিশুকে ধমকি, গালি কিংবা শাস্তি প্রদান চরম ভুল হিসেবে পরিগণিত হবে। কারণ এটা তার কর্ম তৎপরতাকে দুর্বল অথবা একেবারে নিঃশেষ করে দেবে। তার অগ্রগামী আত্মাকে গলাটিপে মেরে ফেলবে। ফলে সে একজন অথর্ব মানুষে পরিণত হয়ে যাবে। যার নিকট সকল কর্মতৎপরতা স্থবির হয়ে পড়বে। তবুও তা শিশুকে দিকনির্দেশনা দান ও বিষয়টি তার নিকট ব্যাখ্যার পরিপন্থী নয়। ঐ বিষয়গুলোরও উল্লেখ করতে হবে যা প্রত্যাশিত ফলাফল লাভে অনিবার্যভাবে বাধার সৃষ্টি করেছে। ফলে শিশুর জন্য পরবর্তী পরিস্থিতিতে তা একটা শিক্ষণীয় বিষয় হবে যার দ্বারা সে উপকৃত হতে পারবে।

অতিরঞ্জন ও শৈথিল্য প্রদর্শন পরিহার করা

প্রশংসা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন অথবা অনুপ্রেরণা- এগুলো শিশুর প্রতিভা বিকাশে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে অনেক অভিভাবক ভুল পথে চলেন। যখন তারা অনুভব করেন অথবা ধারণা করেন যে, শিশুটি তার প্রতিশ্রুত কাজটি করতে পারবে না। অথবা যখন সে প্রত্যাশা বাস্তবায়নে শৈথিল্য প্রদর্শন করে তখন তারা তাকে বলে: তুমি একটা গবেট, একটা অথর্ব অথবা একটা অলস ইত্যাদি। অথবা তোমার মত লোক কোন কাজে সফল হতে পারে না অথবা এজাতীয় অন্য কোন কথা। যদিও বা কখনো এর দ্বারা অভিভাবকের উদ্দেশ্য শিশুকে উক্ত কর্ম ও কর্মে উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহিত করা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা ভুল পদ্ধতি, কারণ অদূর ভবিষ্যতে অভিভাবক তাকে যে অভিধায় অভিষিক্ত করেছেন সে বাস্তবে সেই কর্মটি সম্পাদনেই উদ্যত হয়ে থাকবে। কারণ অভিভাবক তার বাহু ভেঙ্গে ফেলেছেন ও তার সঙ্গে নেতিবাচক বিষয় সংযোজন করে দিয়েছেন। ফলে সে ঐ কর্মটি সম্পাদনের কখনোই চিন্তা বা সংকল্প করবে না। যদি সে চেষ্টা করতো হয়ত বা তার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ ও সফল হতে পারতো।

এক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগুলো পরিত্যাগ করতে হবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, অত্যধিক তিরস্কার করা, লাঠিদ্বারা আঘাত করা ও শিশুর থেকে পূর্ব সংঘটিত কোন শিথিলতার কারণে লজ্জা দেয়া। ফলে দূর অথবা অদূর ভবিষ্যতে তার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে ও তাকে একজন ইতস্ততঃকারীতে রূপান্তরিত করবে। ফলে শিথিলতার আশঙ্কায় সে আর কোন কাজই করতে পারবে না। বিশেষ করে যখন এমন কাজ করা উদ্দেশ্য হয়, যার মধ্যে কোন ফলাফল নিহিত নেই।

অতিরঞ্জনের কুপ্রভাবের এই অবগতির কারণে শিশুর অন্তরে সেটা বিরোধী আহ্বান ও ভীতিপ্রদ প্রবাদে ব্যবহারে পরিণত হবে। যেমন : এই সেনাবাহিনী অপাজেয়, কার সাধ্য আছে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে? এজাতীয় বাক্য যা যুদ্ধ ছাড়াই মনের মধ্যে পরাজয়কে নিশ্চিত করে দিয়ে থাকে। সে কারণই বিদগ্ধজনেরা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, অতিরঞ্জনকারী অথবা কাপুরুষকে কখনোই মুসলিম যোদ্ধাদলের সঙ্গে বের হতে দেবে না। কারণ তার থেকে উপকারের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। বরং তার বের হওয়ার মধ্যে কোন উপকারিতা নেই। সে কারণে অভিভাবকের হুবহু ঐ পদ্ধতি অবলম্বন উচিত হবে না যা শিশুর আবেগ-উচ্ছাসকে চূর্ণ-বিচূর্ন করে দেবে। তার সামর্থ্যকে করবে ধ্বংস। বরং তার স্থলে অনুপ্রেরণা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পদ্ধতি অবলম্বন করা তার কর্তব্য। সে আল্লাহর ইচ্ছায় উক্ত কাজটি সম্পন্ন করার সামর্থ্য রাখে। তার সামান্য দৃঢ়তা ও জিদেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যাবে। এবং তা এভাবেই হবে। অতএব এরূপ পদ্ধতির দ্বারাই উদ্দেশ্যে সিদ্ধি অথবা তার থেকে কিছু সাধনের আশা করা যায়। যেমন : এ পরস্থিতিতে

ভাই-বোন ও প্রতিবেশীদের সন্তাদের মধ্যে তুলনা করা উচিত হবে না। বিশেষ করে যখন তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকবে ও সেই পার্থ্যকের যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকবে। এটা একদিকে যেমনভাবে শত্রুতা ও ঘৃণার সৃষ্টির করবে ও অপর দিকে বিজয়ীর সামনে পরাজয় অনুভূতি ও দুর্বলতার জন্ম দেবে যা তার জন্য অপমান ও পরাজয়ভাবের কারণ হবে।

কখনো তার ওপর সঙ্গীদের সফলতা দেখে অথবা অনেক বিষয় তার শিথিলতার কারণে মনের মধ্যে শিশুর নিজের পক্ষ থেকে ব্যর্থতার অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে। এ প্রেক্ষিতে শিশুর অন্তরে উদ্যম ও সতেজতার প্রাণ সঞ্চারে তৎপর থাকা অভিভাবকের কর্তব্য। এবং তার নিকট কয়েকটি দিক উল্লেখ করতে হবে যেখানে সে এই পরাজয় থেকে তার বন্ধুদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে। অথবা এমন কয়েকটি দিক উল্লেখ করতে হবে যেখানে সৃজনশীলতার সামর্থ্য প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও তা হয়েছে পরাজিত পদ্ধতিতে। যেমন : তাদের দুজনের মধ্য হতে এমন বিষয় তার থেকে আবেদন করবেন কিন্তু কেউ যেন এ ব্যাপারে টের না পায়। হতে পারে তা যেকোন বিষয়ের পাঠ। অতঃপর তার একজন এসে ঐ বিষয়ের পাঠ তার ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব অথবা সহপাঠীদের সম্মুখে পেশ করবে। কারণ এ জাতীয় তৎপরতা তাকে সর্বোৎকৃষ্ট অবয়বে তাদের সম্মুখে প্রকাশ করবে যা তাকে অনুপ্রেরণা যোগাবে ও তার পরাজয়ের গ্লানি নিরসনে সহায়ক হবে।

এমন কিছু পরিস্থিতিও রয়েছে শিশুর, যা থেকে তাকে নিস্কলুষ করার জন্য দিক নির্দেশনা দিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ, অকারণে তার চরম শিথিলতা বা অবহেলা, অথবা এমন একটা কর্ম করে বসল যা তার উচিত হয়নি, অথচ এ সম্পর্কে তার অবহিত করা উচিত ছিল। এক্ষেত্রে অভিভাবক কি করবেন? এ প্রেক্ষাপটে উত্তম হচ্ছে সরাসরি শিশুর ব্যক্তি সত্তার দিকে টার্গেট করে সমালোচনা করবে না। বরং সমালোচনার গতিটা তার কর্ম ও আচরণের দিকে ফিরাবে। যেমন : বলা যেতে পারে, 'এটা একটি মন্দ কাজ' অথবা 'তোমার এ তৎপরতাটা ভালো নয়' কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন কথা। কখনো তাকে বলবে না : তুমি একটি মন্দ শিশু অথবা তুমি কোন ভালো মানুষ নও।[১১২] কারণ সরাসরি ব্যক্তিত্বের সমালোচনা সাধারণত সৃজনে নয় বিনাশে সহায়ক হয়। পক্ষান্তরে যে সমালোচনার টার্গেট হয় কর্মতৎপরতা অথবা আচরণ- যার সম্পর্ক থাকে পরিস্থিতির সঙ্গে, ব্যক্তিত্বকে আহত করে নয়। আপনি যদি অধিকাংশ কাফেরদের তৎপরতা লক্ষ করে থাকেন তাদের রাসূলগণের সঙ্গে তাহলে দেখতে পাবেন যে, তারা আচরণ নয় সরাসরি রাসূলদের ব্যক্তিত্বকেই আঘাত করেছে। কারণ সত্য উদ্ঘাটন নয় তাদের একটাই উদ্দেশ্য ছিলো, তা হলো ব্যক্তিত্ব ধ্বংস আর তার মাধ্যমে আদর্শকে ধ্বংস।

অনুভূতি ও দৃষ্টিভংগির পার্থক্য পর্যবেক্ষণ

বক্তব্য গ্রহণ ও তার মর্মার্থ অনুধাবন, এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তির মধ্যে তাদের বুদ্ধিগত সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সে কারণে তা পর্যবেক্ষণ করা উচিত, যাতে অভিভাবক যে বক্তব্য অথবা দিক-নির্দেশনা দিবেন তা উত্তমরূপে গ্রহণ করে শ্রোতা সেখান থেকে ভালভাবে উপকৃত হতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ওপর সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের অসংখ্য উলামায়ে কেরাম সতর্ক করেছেন। লক্ষ করুন, ইমাম শাতেবী এ বিষয়ে কত গুরুত্বপূর্ণ কথাই না বলেছেন, 'অযোগ্য পাত্রে জ্ঞান সংক্রান্ত মাসআলা আলোচনা থেকে বিরত থাকবেন।' অথবা ছোট মাসআলা ব্যতীত বড় কোন মাসআলা এমন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করবেন না যা সে ধারণ করতে সক্ষম নয়। কারণ এটা প্রচলিত প্রতিপালনের পরিপন্থী। ফলে এ জাতীয় পদক্ষেপ সমূহ বিপদ ডেকে

১. আ. ড. ওমর মুফদা কৃত ইলমু নাফসীল মারাহিলিল উমরিয়্যাহ : পৃষ্ঠা ৩৯৩ দ্রষ্টাব্য

আনতে পারে। সে কারণে আলী রা. বলেন, 'মানুষের সঙ্গে তাদের বোধগম্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করো। আল্লাহ তাআ'লা ও তদীয় রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক এটা কি তোমরা পছন্দ করবে?' এটা অনেক শ্রোতার জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি তিনি বলেছেন, 'এই মর্মবাণীসমূহের প্রতি যত্নবান না হয়ে কোন আলেমের জন্য জ্ঞান শিক্ষা দান শুদ্ধ হবে না। আর এটা না হলে তো তিনি কোন অভিভাবকও হতে পারছেন না। বরং তিনি নিজেই দ্বিতীয় আরেকজন আলেমের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বেন যিনি তাকে প্রতিপালন করতে সক্ষম।'[১১৩] সুতরাং অভিভাবকের একান্ত কর্তব্য হলো এই বয়োঃস্ত রকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন ও পরিচর্যা করা। শিশুদের জন্য মনের ভাব প্রকাশক এমন পদ্ধতি ও শব্দমালা চয়ন করা যা তাদের জন্য সহজবোধ্য হবে। কারণ সে যদি এমন বিষয় আলোচনা করে যা শিশুর বোধ ও বুঝের বাহিরে তাহলে তা শুধু কালক্ষেপণ হবে বৈ কি। ফলে এর অন্তরালে সৃষ্টি হবে ভয়ঙ্কর ক্ষতি। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, 'তুমি কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের বুদ্ধির পরিধি পরিমাপ না করে কোন বিষয় আলোচনা করবে না। আর তা না হলে তা তাদের কারো জন্য পথ ভ্রষ্টতার কারণ হয়ে যেতে পারে।'[১১৪]

কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা শিশুদের বোধগম্য না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে অথবা উদাহরণ বা উপমা পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে যে বিষয়টার উপলব্ধি করানো যায় সেক্ষেত্রে করণীয় কি? ইবনে জারির তার তাফসীর গ্রন্থে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 'আবু বকর রা. ও উমার রা. আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মধ্যবর্তী নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন, অথচ আমি তখন ছোট বালক ছিলাম। তিনি আমার কনিষ্ঠা আঙ্গুলটি ধরে বললেন- 'এটা হলো ফজর।' তার পাশের আঙ্গুলটি ধরে বললেন- 'এটা যোহর।' এরপর বৃদ্ধা আঙ্গুল ধরে বরলেন- 'এটা মাগরিব।' অতঃপর তার পাশের আঙ্গুল ধরে বললেন- 'এটা হলো এশা'র নামাজ।' এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'তোমার হাতের আর কোন আঙ্গুল অবশিষ্ট আছে কি? উত্তরে আমি বললাম- 'মধ্যমা' আবার বললেন- 'এবার বলো দেখি আর কোন নামাজ কি অবশিষ্ট আছে? উত্তরে আমি বললাম- 'আছর'। তখন তিনি বললেন- 'ঐটাই হলো আছর।'[১১৫] লক্ষ্য করে দেখুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত সুন্দর করে তার কাংক্ষিত বিষয়ের বিবরণ দিয়েছেন। এমন একটি পদ্ধতিতে যা প্রমাণ করে শিশুর বোধশক্তিকে তিনি কতটা মূল্যায়ন করতেন। তাকে একথা সরাসরি বলে দেননি যে, মধ্যবর্তী নামাজ হলো আছরের নামাজ। বরং তার সঙ্গে এমন পথে চলেছেন যে পথ ধরে প্রশ্নকারী নিজেই তার উত্তর খুঁজে বের করতে পারে।

ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতি প্রদান ও সে শিশু এ যুক্তিতে তার অধিকার খর্ব না করা

শিশুও তো একজন মানুষ তারও উপলব্ধি আছে। আছে অনুভূতি। সে বুঝতে পারে মানুষের মধ্যে কে তার সঙ্গে তার বয়সের যোগ্য ব্যবহার করছে ও কে তার সঙ্গে অবুঝ শিশুর মত ব্যবহার করছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা বুঝতে না পেরে তাদের সাথে অবুঝ শিশুর মত আচরণ করে থাকে। যেন তাদের কোন উপলব্ধি নেই। নেই কোন অনুভূতি অথবা সে একটি ছোট শিশু। এরূপ আচরণ এক দিক থেকে যেমন শিশুর জীবনে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সাথে সাথে অন্য দিক দিয়ে তার সঙ্গে সম্পাদনযোগ্য কর্ম হ্রাস করার জন্য দাবী সৃষ্টি হয়ে থাকে।

[১১৩] .আল-মুওয়াকিফাত-১/৮৭

[১১৪].মুকাদ্দামায়ে মুসলিম-২/৫৬০

[১১৫] . তাফসীরে তাবারী-২/৫৬০

শিশুকে মূল্যায়ন ও তার ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি প্রতিপালনের এক অনন্য শিষ্টাচার– যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োগ করেছেন। নিচের ঘটনা যার প্রমাণ বহন করে। সাহল বিন সা'দ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এক পেয়ালা দুধ আনা হলে তিনি প্রথমে তা হতে পান করলেন। তাঁর ডান পাশে একটি বালক উপবিষ্ট। যে বয়সে সকলের চেয়ে ছোট, অপরাপর গণ্য মান্য সাহাবায়ে কেরাম তাঁর বাম পাশে অবস্থান করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'তুমি অনুমতি দিলে আমি আগে বড়দেরকে দিতে পারি?' উত্তরে সে বলল- 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনার থেকে আমার প্রাপ্ত অংশের ওপর আমি কাউকে প্রাধান্য দিতে পারি না।' অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেই দিলেন।'[১১৬] সুন্নতও এটাই ছিল, যে ডানে থাকবে সে বাম পার্শস্থদের ওপর প্রাধান্য পেয়ে থাকবে। ফলে এটা ডানপার্শস্থদের অধিকারে পরিণত হয়ে গেলো। যদিও সে বয়সে সকলের চেয়ে ছোট হোক না কেন। সে কারণে সে বালক হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অনুমতি নেয়া প্রয়োজন মনে করলেন অথচ বামপার্শস্থরা ছিলেন বয়সে প্রবীন। এ হাদীসখানা শিশুকে মূল্যায়ন ও তার ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি, তার অধিকারসমূহ উপেক্ষা না করা বরং এক্ষেত্রে তার অনুমতি গ্রহণ নিশ্চিত করেছে। যদি সে গ্রহণ করে তাহলে ভালো ও উত্তম। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করলে তাকে দোষারোপ কিংবা এ ব্যপারে তাকে কোন তিরস্কার করা যাবে না। কিন্তু শিষ্টাচারের মাধুর্য হলো তা হতে শিশুটি এমন পদ্ধতি অবলম্বনে মুক্ত থাকার চেষ্টা করবে যার মধ্যে তার মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ বিচক্ষণ ছেলেটির দিকে লক্ষ করুন, সে কত সূক্ষ্মভাবে আপত্তি তুলে বলল, 'আমি আপনার থেকে আমার প্রাপ্য অংশে কাউকে প্রাধান্য দিতে পারি না।'

উল্লেখ্য যে, বালকটি ছিল আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. তিনি তখন একটি ছোট শিশু ছিলেন।

শিশুকে অন্যায় থেকে ফিরিয়ে রাখা

প্রকাশ থাকে যে, শিশু শরিয়তের বিস্তারিত বিধানাবলি পালনে আদিষ্ট নয়। আল্লাহ তাআলা যা নিষিদ্ধ করেছেন যদি সে এমন কর্মও করে বসে তবুও তার আমলনামায় পাপ লেখা হবে না। তথাপিও অভিভাবকদের কর্তব্য হলো শিশুকে নিষিদ্ধ কর্মসমূহ থেকে ফিরিয়ে রাখা। শিশু আদিষ্ট নয় বলে তাকে যেন এক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শনে উদ্যত না করে। যাতে সে পাপকর্মে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে না পারে। ফলে অর্থহীন ও নিস্ফল কর্মে শিশুর মূল্যবান জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর সে তা হতে আর মুক্ত হতে পারবে না। অতঃপর এটা তার নির্ঘাত ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। ইবনে কাইউম রহ. বলেন, 'শিশু বুদ্ধি সম্পন্ন হলে অন্যায় ও অনর্থক আসর, গানবাজনা, অশ্লীল ও উদ্ভট কথা শ্রবণ ও মন্দ কথন থেকে নিজেদের দূরে রাখা অভিভাবকের কর্তব্য। কারণ সে যদি তার কানের সঙ্গে একবার এর সম্পর্ক করে নিতে পারে তাহলে বড় হলে শিশুর পক্ষে তা বিছিন্ন করা কঠিন হয়ে যাবে। অভিভাবকের পক্ষেও তাকে ওখান থেকে উদ্ধার করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে বৈকি। এধরনের পথভ্রষ্টকে পরিবর্তন করা সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। কারণ তখন আরেকটি স্বভাব প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হবে। বলাবাহুল্য পুরাতন স্বভাব থেকে বেরিয়ে আসা হলো এক অসাধ্য সাধন।'[১১৭] বর্তমানে অসংখ্য উপকরণ প্রচলিত রয়েছে যার মাধ্যমে শিশুর নিকট অন্যায় ও অনর্থক বিষয় পৌঁছে যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পর্ণো, ম্যাগাজিন, অশ্লীল চ্যানেল, কাল্পনিক গল্প ও অসংখ্য বিকৃত মিডিয়া। অভিভাবক যখন এ সকল সামগ্রী গৃহে অনুপ্রবেশ না করাতে সক্ষম হবেন, তখনও তাকে অন্য আর একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তা হলো-শিশু যদি অন্য কোন উপায়ে ঐ বস্তু সামগ্রীর নাগাল না পায়। চাই সেটা তার বন্ধু অথবা

[১১৬] .বুখারী-২১৯৩ , মুসলিম-৩৭৮৬

[১১৭]. তুহফাতুল মওদুদ ফি আহকামিল মওলুদ : ২৪১

সহপাঠীদের সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যমে হোক অথবা তাদের কাছ থেকে ধার নিয়ে তা নিজের ঘরে উপস্থিত করে হোক। শিশুকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। মোদ্দা কথা হলো সন্তানের সঙ্গী নির্বাচনে অভিভাবকের ভূমিকা রাখা একান্ত কর্তব্য।

ক্ষমা, উদারতা এবং অত্যাচারীর প্রতিবিধানের মধ্যে সমন্বয় সাধন

যে সকল নান্দনিক চরিত্রে শিশুকে প্রতিপালিত করা উচিত তার অন্যতম হলো ক্ষমা ও উদারতা। এর তাৎপর্য বর্ণনায় কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। তবে কখনোই তা অত্যাচার সহ্য ও অত্যাচারীর প্রতিবিধান না করার প্রতি শিশুকে অভ্যস্ত করার সীমায় গিয়ে যেন না ঠেকে। যা শিশুর পরিণত বয়সে অপমান ও অপদস্ত হওয়ার কারণ হবে। একদিকে কোরআনে কারীমের বক্তব্য যেভাবে ধৈর্য ও ক্ষমার প্রশংসা করেছে। যেমন : আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন-

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ. (الشورى-40)

'যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে।'[১১৮]

আল্লাহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেন-

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور .(الشورى-43)

'অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয় তা দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।'[১১৯]

তেমনিভাবে মন্দের সমপরিমাণ মন্দ দ্বারা প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। যেমন : আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন-

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. (الشورى-40)

'মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ।'[১২০]

আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন,

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ.(الشورى- 41)

'অত্যাচারিত হবার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।'[১২১]

শরিয়তের প্রমাণ তারই প্রশংসা করে যে অত্যাচারীর প্রতিবিধান করে। আল্লাহ তাআ'লা ঈমানদারদের প্রশংসায় বলেন,

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. (الشورى-39)

'এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।'[১২২]

---

[১১৮]. সুরা-শুরা : ৪০
[১১৯]. সুরা-শুরা : ৪৩
[১২০]. সুরা-শুরা : ৪০
[১২১] . সুরা-শুরা : ৪১
[১২২] সুরা-শুরা আয়াত-৩৯

অতএব ক্ষমা ও উদারতার মত চরিত্র মাধুর্য একান্তভাবে কাম্য। যেমনিভাবে প্রতিশোধ ও প্রতিবিধানের চরিত্রও কাম্য। এর যে কোন একটাকে উপেক্ষা করলে অথবা তার আশ্রয় না নিলে জীবন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। যখন অধিকাংশ অভিভাবকের চিন্তা চেতনা শিশুর মনে ক্ষমা ও উদারতার মর্মবাণী দৃঢ়মূল করার দিকে কেন্দ্রিভূত, তখন তাদের মধ্যে অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারীদের প্রতিশোধ ও প্রতিবিধান করার মর্মবাণীও তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর হতে হবে। বিশেষ করে যখন বর্তমান বিশ্বের মুসলমানগণ তাদের আজন্ম শত্রু ইয়াহুদী খৃষ্টান কর্তৃক আগ্রাসী আক্রমণের শিকার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে এই চরিত্র নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনকি তাঁর পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণের মধ্যেও। আয়শা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমার অজ্ঞাতসারে যয়নব রা. অনুমতি ব্যতিরেকে ক্রুদ্ধাবস্থায় আমার ঘরে প্রবেশ করেছে। এরপর তিনি বললেন- 'হে আল্লাহর রাসূল, আবু বকরের কন্যা তার হাতের দুটি কংকন দিয়ে দিয়েছে তাতেই কি আপনি সন্তুষ্ট? অতঃপর তিনি আমার দিকে ফিরলে আমি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। এমন কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেই ফেললেন- 'যাও! তুমি গিয়ে প্রতিশোধ নাও।' এরপর আমি তাঁর দিকে মুখ করে তাকাতেই দেখি তার মুখ শুকিয়ে গেছে, ফলে আমার কোন প্রতি উত্তরই তিনি আর করতে পারলেন না। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমণ্ডলে প্রফুল্লতা লক্ষ করলাম।'[১২৩] দেখুন, এখানে যয়নব রা. যখন আয়শা রা. প্রতি অবিচার করলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রতিবিধান করার নির্দেশ করলেন। ক্ষমা ও উদারতার নির্দেশ করেননি। বরং তাঁর মুখমণ্ডলে প্রফুল্লতা তখন পরিস্ফুটিত হয়েছে যখন তার অধিকার আদায় করে নিতে দেখলেন। আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক স্ত্রীর কাছে ছিলেন, তখন আমাকে তাঁর আরেকজন স্ত্রী একটি পাত্রভর্তি খানা নিয়ে পাঠালেন। তখন তিনি যে স্ত্রীর ঘরে ছিলেন তিনি আমার হাতে আঘাত করেন; ফলে বরতনটি হাত ফসকে পড়ে ভেঙ্গে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরতনের টুকরাগুলো একত্রিত করলেন, এরপর পাত্রের মধ্যে যে খানা ছিলো তাও একত্রিত করতে লাগলেন ও বললেন- 'তোমাদের মা অতর্কিত আক্রমণ করেছেন। অতঃপর সেবক (আনাস রা.) খুব সতর্কতার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার ঘরে ছিলেন সেখান থেকে একটি ভাল পাত্র নিয়ে আসলেন। আর ভাঙ্গা পাত্রটি যে ভেঙ্গেছে তার ঘরেই রেখে দিলেন।'[১২৪]

ঘরের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সমাজের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দান করা

শিশুকে সঠিক পদ্ধতিতে সমাজের সঙ্গে মেলামেশা করতে অভ্যস্ত করা অভিভাবকের কর্তব্য যেখানে সে বসবাস করে। সমাজ বিমুখ ও একগুয়েমীভাবে তার বিকাশ হতে পারবে না। অথবা সে ঘরমুখো হয়ে পড়বে যে তার বাবা অথবা বড় ভাইর সঙ্গ ছাড়া বের হতে চাইবে না। কিন্তু কোন অজ্ঞাত পরিচয় লোকের ওপর এ ঝক্কি রাখা যাবে না এ ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন করতে হবে। যেভাবে বলা হয়ে থাকে। শিশুকে নিরাপদ সময়ে বাড়ীর নিকটবর্তী কোন মুদি দোকানে যাওয়ার জন্য বের হতে ও সেখান থেকে বাসার কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে অভ্যস্ত করবে। এভাবেই তার দায়িত্ব পালনের ওপর অনুশীলন হতে থাকবে। অভিভাবকের পক্ষ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত ক্রয়-বিক্রয়ে শিশুর লেনদেন করা শরিয়ত সিদ্ধ। তাকে পথ চলার নিয়মাবলী সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে যাতে কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হয়। সে শুধু সামনের দিকে তাকাবে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া পেছনে তাকাবে না। রাস্তা পারাপারের সময় একবার ডানে ও একবার বামে তাকিয়ে নেবে যাতে কোন গাড়ি তাকে চাপা দিতে না পারে। রাস্তা পারাপারের সময় অপর শিশুদের সঙ্গে কথাবার্তায় মগ্ন হতে পারবে না। সহপাঠির সঙ্গে পথের মধ্যে

[১২৩] ইবনে মাজা, হাদীস নং ১৯৭১, হাদীসটিকে আলবানী সহীহ বলেছেন

[১২৪] . বুখারী : ৪৮২৪

অবস্থান করবে না। বরং তার থেকে কাম্য দায়িত্ব পালন ও গৃহে প্রত্যাবর্তন তার কর্তব্য। সহপাঠীকে ঘরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করতে শিশুকে বারণ করবেন না। তার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও অতিথির জন্য উপস্থাপণযোগ্য সামগ্রী তার সম্মুখে পরিবেশন করতে নিষেধ করবেন না। অসুস্থ পরশী অথবা সহপাঠীর সেবা শুশ্রুষার জন্য যেতে অভ্যস্ত করবেন। কিন্তু এহেন পরিস্থিতিতে কাংক্ষিত সুফল পেতে হলে অভিভাবক কিংবা বড় ভাইর শিশুর সাথে থাকা উচিত।

'আত্মমর্যাদাবোধ ও তার মত লোকের ওপর নির্ভর করা যায়, যে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদন ও দায়িত্ব বহনের যোগ্য' এরকম চেতনাবোধ শিশুর মনে জাগ্রত করতে হবে। আমাদের সামনে কিছুক্ষণ পূর্বে এই ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। আবু বকর রা. ও উমার রা. একটি ছোট বালককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠালেন-মধ্যমা নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে। আনাস রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমত করছিলেন যখন তার বয়স ছিলো মাত্র দশ বছর। কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পাঠাতেন। উক্ত কর্ম সম্পাদনে তার ওপর নির্ভর করতেন। উপরন্তু কোন গোপন বিষয়ে তাকে বিশ্বস্ত মনে করতেন। ছাবেত রা. আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আসলেন আর আমি তখন ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করছিলাম। তিনি আমাদেরকে সালাম করলেন ও আমাকে একটি কাজে পাঠালেন। ফলে আমার ঘরে ফিরতে একটু বিলম্ব হয়ে যায়। অতঃপর যখন আমি বাড়ী পৌঁছলাম, আমার মা আমাকে বললেন- 'তোমার কি হলো? দেরি করে বাড়ীতে ফিরলে যে? আমি বললাম, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তাঁর একটি কাজে পাঠিয়েছিলেন। মা বললেন, 'কি কাজে ?' উত্তরে আমি বললাম, সেটা গোপন (বলা যাবে না)। তখন আমার মা বললেন- 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোপন বিষয় সম্পর্কে কারো সঙ্গে আলাপ করবে না যেন। আনাস রা. বললেন-' ছাবেত, ঐ প্রসঙ্গে আমি যদি কারো সঙ্গে আলোচনা করতাম, তাহলে তোমার সাথে তা আমি অবশ্যই আলাপ করতাম।[১২৫]

বড়দের সঙ্গ দেয়া ও আলেমদের বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ প্রদান

অনেক মানুষ আছেন যারা অবুঝ শিশুদের প্রতি যতটুকু লক্ষ রাখেন এই বয়সের শিশুদের প্রতি ততটুকু ভ্রুক্ষেপ করেন না। ফলে তাদেরকে আলেম-উলামা ও বড়দের মজলিসে যেতে বারণ করে থাকেন। শিক্ষামূলক সেমিনারে উপস্থিত হতেও নিষেধ করেন তা ধারণ করতে তাদের অসমর্থতার আশঙ্কায়। যখন মজলিসে কাংক্ষিত অতিথি শুভাগমন করেন তখন বুঝদার শিশুদেরকে মজলিস থেকে বের করে দেয়া হয় এবং তাদের সাক্ষাৎকার থেকে শিশুদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়। অনেকে তো খুবই অতিরঞ্জন করে ফেলেন। শিশুদেরকে একটি কক্ষের মধ্যে বন্দি করে অতিথি বের হওয়া পর্যন্ত তালাবদ্ধ করে রাখেন। এগুলো সবই স্বাভাবিকতার ওপর অতিরঞ্জন। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, এতো কিছুর পরও তারা এটাকে শিষ্টাচার হিসেবে গণ্য করে থাকেন। বরং প্রকৃত শিষ্টাচার ও সঠিক তৎপরতা হলো অভিভাবক শিশুদেরকে এ জাতীয় মজলিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য সুযোগ করে দেবেন। ফলে তারা সেখান থেকে কথা বলার শিষ্টাচার শিক্ষা করতে পারবে। শিখতে পারবে মজলিসের আদব ও শ্রবণ করার আদব। শুধুমাত্র ঐ কথাগুলোই তারা শুনবে যদ্বারা তারা উপকৃত হতে পারবে। অনুরূপ আচরণ বালিকাদের সঙ্গেও করতে হবে মহিলাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়। শিশুদের মনের মধ্যে এ সকল মজলিসে উপস্থিত হওয়ার একটা ভালো প্রভাব পড়বে। কারণ তারা তখন উপলব্ধি করতে পারবে যে, তারা প্রাথমিক শৈশব স্তর অতিক্রম করেছে। ফলে তাদেরকে পরবর্তী স্তরের যোগ্য করে তুলতে খুব দ্রুত কাজ করবে। কোন মজলিসই এ

---

[১২৫] . মুসলিম : ৪৫৩৩

সুবিধাগুলোর আওতামুক্ত নয়। শুধুমাত্র ঐ বিশেষ মজলিসগুলো ব্যতীত যা শুধু বয়স্কদের জন্য। যেমন হিজরতের হাদিসে সংঘটিত ঘটনা : যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরের রা. নিকট এমন এক মুহূর্তে গমন করলেন যে সময় ইতিপূর্বে কখনো যাননি। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'তোমার কাছে যারা আছে তাদের বেরিয়ে যেতে বলো। উত্তরে আবু বকর রা. বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, তারা হলো আমার কন্যাদ্বয় আয়েশা রা. ও আসমা রা.। আরো বললেন, 'আমি তাদেরকে জ্ঞাত করেছি যে, আমার হিজরতের অনুমতি হয়ে গেছে....।'[১২৬] সালাফে সালেহীন আপন সন্তানদেরকে সভা সেমিনারে উপস্থিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। তখন তো শিশুরা বড়দের সঙ্গে বসার আদব কায়দা বেশ ভালোভাবে রপ্ত করতে পেরেছিল। তারা চুপ থাকতো, মনোযোগ সহকারে শুনতো ও কোন কথা বলতো না। এমনকি আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে তাদের জানা থাকলেও। তবে কোন কোন সময় তাদের থেকে কিছু বলার ইচ্ছা অথবা অনুরোধ করা হয়ে থাকতো। সামুরা বিন যুন্দব রা. দিকে লক্ষ করুন। তিনি রা. বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমলে একটি বালক ছিলাম। আমি তাঁর থেকে হাদীস সংরক্ষণ করতাম। সেখানে আমার চেয়ে বয়স্ক লোকদের উপস্থিতি ভিন্ন অন্য কিছুই আমার কথা বলার অন্তরায় হয়নি।'[১২৭] অনুরূপ আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. এর মজলিসের আদব রক্ষার একটি ঘটনাও বিবৃত রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, ইতোমধ্যে 'যুমার' আনা হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে যার উদাহরণ হলো মুসলমানের মত। তখন আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, সেটা খেজুর গাছ। তথাপিও আমি উপস্থিত সকলের চেয়ে বয়সে ছোট বিদায় নীরব থাকলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই বললেন, 'তা হলো খর্জুর বৃক্ষ।'[১২৮] হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. যখন দেখতে পেলেন যে, তিনি সকলের চেয়ে বয়সে ছোট অথচ সেখানে আবু বকর রা. ও উমার রা. এর মত শীর্ষ স্থানীয় সাহাবীও উপস্থিত রয়েছেন একথা ভেবে চুপ থাকলেন। মনের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীর অনুকূল উদিত উত্তরকে অবদমিত করে রাখেন।

শিশুকে সুযোগ্য করে গড়ে তোলা

সাধারত মুসলিম বিশ্বের একটি শিশু স্কুলে যাতায়াত করা ব্যতীত অন্য কোন কাজ করে না। কিন্তু কিছু হতদরিদ্রের সন্তানের ক্ষেত্রেও যে এর ব্যতিক্রম হয় না এমনটি কিন্তু নয়। যারা এক মুঠো জীবিকার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে থাকে। তারা কোন কর্মই উত্তম রূপে সম্পন্ন করতে পারে না। যদিও তা একেবারে ক্ষুদ্র হয়।

গৃহস্থালীর এমন অনেক প্রয়োজনীয় কাজ রয়েছে যা কন্যা শিশুরাই করতে সক্ষম যদি তাদেরকে এ বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এটা বোধগম্য নয় যে, ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বের হওয়া পর্যন্ত সার্বক্ষণিক পড়াশুনার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হবে, যতক্ষণে তার বয়স হবে আনুমানিক তেইশ বছর। এরপর সে কোন কর্মই আর উত্তম রূপে সম্পন্ন করতে পারবে না। ফলে সে মা-বাবার ওপর বোঝা হয়ে থাকবে। অতএব শিশুকে সুযোগ্য করে গড়ে তোলার ব্যাপারে অভিভাবককে যারপর নাই তৎপর হওয়া উচিত। অর্থাৎ তাকে যে কোন কর্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন করার যোগ্য করে গড়ে তোলা। ফলে এর দ্বারা সে

[১২৬] .বুখারী-৩৭৮৪

[১২৭]. মুসলিম : ১৬০৩

[১২৮]. বুখারী : ৭০ , মুসলিম : ৫০২৮

নিজে উপকৃত হতে পারবে এবং সমাজেরও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। প্রকাশ থাকে যে, সম্পাদনযোগ্য কর্মসমূহ সম্পন্ন করার জন্য শিশুর শরীর ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী ও কর্মক্ষম হয়ে উঠে।

তবে এই কর্মটি সমাজ, যুগ ও এর চাহিদার বিচিত্রতার দরুণ বিভিন্ন রকম হতে পারে। সালাফে সালেহীনগণ রহ. তাদের সন্তানদেরকে সাঁতার শিক্ষা দিতেন। যেমনিভাবে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে তাদেরকে তীর চালনা ও অশ্বারোহণ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকতেন। মুসলিম জাহানের খলীফা উমার রা. সেনাপতি আবু ওবাইদার নিকট শাহী ফরমান লিখে পাঠালেন- 'তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতার ও তীর নিক্ষেপ প্রশিক্ষণ দাও!' (বর্ণনাকারী) বলেন, টার্গেট ভেদ করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছিলো।[১২৯] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ বিষয়ে তাদেরকে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে সকল কাজের মধ্যে আল্লাহর কোন স্মরণ নেই তাই অনর্থক ও খেলতামাশা। কিন্তু চারটি কাজ খেলা হওয়া সত্ত্বেও এরূপ নয়।

- পুরুষের তার বৈধ স্ত্রীর সঙ্গে খেলাধুলা করা
- ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া
- বিবাদমান দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করা
- ও সাঁতার শিক্ষা করা।[১৩০]'

সময় ও যুগের ব্যবধানে উপকরণ ও প্রয়োজনেরও ব্যবধান হয়ে থাকে। অতএব এ বিষয়টারও মূল্যায়ন করতে হবে।

শিশুকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ

একজন প্রকৃত অভিভাবক কোন যুক্তিতেই শিশুর পর্যবেক্ষণকে অবহেলা করতে পারেন না। বরং তিনি শিশুকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখবেন। কিন্তু অবহেলার এমন কতগুলো প্রকার রয়েছে যে দিকে মানুষ ভ্রুক্ষেপই করে না বরং তারা এর উল্টো মনে করে। আমার নিকট তার বাস্তব উদাহরণ হলো, সন্ত ানদেরকে আভ্যন্তরীণ আবাসিক বিদ্যালয়সমূহে ভর্তি করানো। যেখানে সপ্তাহে পাঁচ বা ছয় দিন সন্তানদের থেকে তার মা-বাবা বিচ্ছিন্ন থাকেন। যেখানে সকল শিশু একসঙ্গে শিক্ষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে থাকে। এখানে কথিত উপকারিতা হতে ক্ষতিই অনেক বেশি হয়ে থাকে।

- প্রতিষ্ঠানিক সমাজের চরিত্রসমূহে চরিত্রবান হওয়া
- অপর এমন শিশুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া যাদের সম্মন্ধে মা-বাবা কিছুই জানে না।
- মা-বাবার পর্যবেক্ষণ বিচ্ছিন্ন অথবা দুর্বল হওয়ার দরুণ অনেক সমস্যার সৃষ্টি হওয়া।

কখনো বা বলা হয়ে থাকে শিক্ষকদের অসামান্য পরিশ্রম ও ভূমিকা এক্ষেত্রে শিশুর দিক নির্দেশনা ও পর্যবেক্ষণ করে থাকে। ঠিক কথা, তবে এটা কখনোই মা-বাবার ভূমিকাকে নিষ্প্রয়োজন করতে পারে না।

---

[১২৯].সহিহ্ ইবনে হিব্বান-১৩/৪০০

[১৩০] .সুনানে কুবরা-৫/৩০২

- শিশু ও পরিবারের মাঝে স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে।
- শিশুদেরকে নিজ পরিবেশের সংশ্রব ও মেলামেশা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়- যা তাকে পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত পাত্রে পরিণত করবে।

যদি আমরা মেনেও নেই যে, এ পদ্ধতিতেই জ্ঞান আহরণ উত্তম। তারপরও একথা বলবো শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জনই সবকিছু নয়। মা-বাবার চোখের সামনে শিশুর বিকাশ তার চেয়ে অনেক অনেকগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, শিক্ষায় অসংখ্য মেধাবীমুখ এ সকল বিদ্যালয়ের বাহির থেকেই আবির্ভূত হয়।

বহিরাগত প্রভাব বিস্তারকারীর আনুগত্য

এ বয়োস্তরে শিশুর মধ্যে বহিরাগত প্রভাব প্রতিফলিত হয়। যেহেতু শিশু তখন স্কুল ও পথের দিকে যায়। ফলে অপরের সংশ্রব পেতে শেখে। হতে পারে তারা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্ব পায়নি। ফলে স্ববিরোধী প্রভাব শিশুর মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে। তার আচার- ব্যবহারে অনাহুত পরিবর্তন সাধিত হবে আর উন্মেষ ঘটবে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনার। বিশেষ করে বিশাল বিশাল মনগড়া তথ্য তৈরীর ছত্র ছায়ায় আমাদের সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে যার শরণাপন্ন হতে হবে। যদিও এ ধরনের গবেষণার জন্যও গৃহ, বিদ্যালয়, মিডিয়া ও সরকারী সংস্থাসমূহের ঘাম ঝড়ানো পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। কারণ আমাদের পক্ষে এর পুর্ণাঙ্গ পর্যায় পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। এ মহৎ কর্মে অভিভাবকই মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তিনিই তো সম্যক অবগত কু-চিন্তা ও মন্দ দৃষ্টিভঙ্গী অথবা অসৎ পরিকল্পনা সমাজে কেমন ঢেউ খেলে। ফলে সে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারবে শিশুর ওপর এর মাধ্যমে কি অবাঞ্ছিত পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সূক্ষ্ম বিচক্ষণতার সঙ্গে এটা তাকে উপলব্ধি করতে হবে এবং একটু কৌশলে তা তাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ফলে এর উৎস ও তা কোথা থেকে এসেছে তাও সে জানতে পারবে। এখন শিশুর মনন ও আচরণে বদ্ধমূল হওয়ার পূর্বে উপযুক্ত পদ্ধতিতে তার চিকিৎসা করা অভিভাবকের একান্ত কর্তব্য। এর ব্যত্যয় ঘটলে ভবিষ্যতে তার প্রতিকার করা দুরূহ ও কঠিন হয়ে পড়বে।

দায়িত্ব পালনে শিশুর অংশিদারিত্ব

শিশুকে এই বয়সে কোন দায়িত্ব গ্রহণে অংশীদার করা উচিত। এই দিকে তাকাবে না যে, সে এখনো ছোট; বিশেষতঃ এই স্তরের শেষের দিকের সময়গুলোতে। পক্ষান্তরে যদি তাকে কোন দায়িত্বভার গ্রহণে অংশীদার না করা হয় অথচ সে এক পৈরুষের সমপর্যায় পৌছার প্রায় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। তাহলে আর কবে সে এ দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারবে ?

অতএব শিশুকে এ ব্যাপারে সচেতন করা অভিভাবকের কর্তব্য। যেমন :

- তাকে এক দিনের স্থলে একসঙ্গে এক সপ্তাহের খরচার টাকা দিয়ে দিবে। সেখান থেকে প্রয়োজন সাপেক্ষে সে ব্যয় করবে। এবং খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে।
- কোন কোন কাজে তার মতামত চাইবে ও তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তার মতের ব্যাখ্যা করবে। তার সকল কথা কাটবে না। একাধিক বিকল্পের মধ্যে যে কোন একটা নির্বাচনের সুযোগ দেবে।
- এবং তার কাছ থেকে কোন কর্ম সম্পাদনের প্রতিশ্রুতি নেবে। গৃহস্থালী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কোন কাজের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত করবে।

কিন্তু এটা কি কল্পনা করা যায় যে, শিশু প্রথম বারেই কাংক্ষিত পদ্ধতিতে উক্ত কর্মটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে? নিঃসন্দেহে এমন আশা পূরণ সুদূর পরাহত। সুতরাং কোন ভুল-ক্রটি হয়ে যেতেই পারে। এ ব্যাপারে অভিভাবককে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ, কোন কর্মের সূচনা এমনই হয়। সে কারণে এ ধরনের পরিণতিতে অভিভাবককে ইমোশনাল হয়ে শিশুকে শাস্তি দেয়া অথবা তাকে অর্পিত কাজটি প্রত্যাহার করে নিলে চলবে না। বরং শিশুকে এক্ষেত্রে সঠিক পথটি দেখাতে হবে এমন পদ্ধতিতে যা তার জন্য অপমান ও তার ব্যয়িত শ্রমকে তাচ্ছিল্যের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। এবং তার সঙ্গে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে তা সমাধানের জন্য কাজ করবে। তবে এ প্রেক্ষিতে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হলো তাকে কোন বড় বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ অথবা যে কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার দরুণ ভুল হয় সেই কাজের দায়িত্ব অথবা প্রতিনিধিত্ব তাকে দেবে না। বরং দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথমে ছোট ছোট কর্ম দিয়ে সূচনা করবেন। এমনিভাবে এক পর্যায়ে যখন সেটা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে ও সঠিকভাবে তা সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে তখন তার ওপর যে কোন বড় ও মহৎ কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা যাবে।

যে সকল কাজের দায়িত্ব শিশুর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে সে ব্যাপারে তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভ্যস্ত করা উচিত। যাতে প্রতিটি ব্যাপারে তাকে অভিভাবকের দিকে ফিরে আসতে না হয়। এমনিভাবে অভিভাবকের জন্য শিশুর প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ধারিত করে দেয়া উচিত নয়। তার প্রতিশ্রুত কর্ম সম্পাদনে স্বাধীনতা দেয়া উচিত। বরং 'শিশু করতে সক্ষম নয়' এমন কোন কর্ম সম্পর্কে যদি তার এ রকম প্রবল ধারণা হয় কেবলমাত্র সেক্ষেত্রে তাকে পথ দেখাতে হবে। তবে অবশিষ্ট কাজ-কর্মে তাকে শুধু সংক্ষিপ্ত দিক-নির্দেশনা দিলেই চলবে। ফলশ্রুতিতে শিশু সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসমূহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

পক্ষান্তরে শিশুর ছোট বড় প্রতিটি পদক্ষেপে অভিভাবকের দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রতি তার অতিশয় আগ্রহ এ জাতীয় প্রতিটি ব্যাপারে দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে শিশুকে পরিপূর্ণরূপে আবদ্ধ করে রাখা ও পছন্দ-অপছন্দের ক্ষেত্রে তাকে কোন অধিকার না দেয়া, অচিরেই ব্যক্তিত্ব, সমর্থন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার আত্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করে দেবে। ফলে তখন দায়িত্বভার প্রদানটা হবে অনর্থক ও অকার্যকর।

প্রতিপালন ও শিক্ষায় অভিভাবকের তৎপরতা

অভিভাবকের কাজই হলো প্রতিপালন। সে একটি সুশৃঙ্খল নির্মাণ কাজের দায়িত্ব নিয়েছে যার প্রতিপালন করবে তার পরিচ্ছন্ন ও সঠিক বিকাশের জন্য। সুতরাং অভিভাবক সমাধানের জন্য ভুল-ক্রটি অথবা সমস্যা সংঘটিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকবেন না। অতএব যে সকল ক্রটি-বিচ্যুতি শিশুর থেকে সংঘটিত হওয়া সম্ভব অথবা তার দৃষ্টিতে সংঘটিত হতে পারে সে ব্যাপারে শিশুকে প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণ দেয়া অভিভাবকের কর্তব্য। তার বয়স উপযোগী কর্মই তার জন্য নির্বাচিত করা উচিত। বয়োঃসন্ধির চিহ্নসমূহ সম্পর্কে বয়োঃপ্রাপ্তির কিছুকাল পূর্বেই তার সঙ্গে আলোচনা করে নেবে। অর্থাৎ ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ বছরেই তার সঙ্গে আলোচনা করবে। এভাবে মা তার মেয়ের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে পারবেন। আরো আলোচনা করবে অপবিত্রতা থেকে কিভাবে পবিত্র হওয়া যায়। উক্ত আলোচনাটা অবশ্যই শিশুর বয়স নবম বছর অতিক্রম হওয়ার পূর্বে হতে পারবে না।

এই প্রত্যাশিত প্রক্রিয়ায় প্রতিপালন হলে তাকে ভীত্তিমূল প্রতিপালন আখ্যায়িত করা যায়। আর এরই অর্থ নিখাঁদ নির্মাণ। সে কারণেই তার জন্য প্রত্যেকটি বয়োঃস্তর অনুযায়ী কিছু পদক্ষেপ-প্রস্তুতি ও ধীর-স্থীরতা একান্ত প্রয়োজন। এটা ডাক্তারী পরিচর্যার সম্পূর্ণ বিপরীত। যা বাস্তবানুগ ক্রটি বা রোগ ব্যাধির চিকিৎসার প্রয়াস পেয়ে থাকে। ক্রটি সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রয়োগ করতে হবে। কখনোই নির্ধারিত বয়োঃস্তর পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলবে না।

অপচয়হীন ব্যয়

শিশুর প্রতিপালনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাকে বিশ্বস্ততা, আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদাবোধ প্রভৃতি নান্দনিক চরিত্রে অভ্যস্ত করা। ব্যয়ের ক্ষেত্রে শিশুর ওপর কার্পণ্য এগুলো সব ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। যখন শিশু লক্ষ করবে তার অনেক বন্ধু মিঠাই ও জুস ক্রয় করছে অথচ সে এর কোনটাই অর্জন করতে সক্ষম নয়। তার বাবার দারিদ্রতার জন্য নয়, বরং এটা শুধুমাত্র তার কার্পণ্যতার কারণে। তখন শিশু বিশেষ পদ্ধতিতে সেটা অর্জন করতে চাইবে। সে ঘর অথবা বন্ধুদের থেকে চুরির আশ্রয় নিয়ে থাকবে। যেমনিভাবে তার সহপাঠিদের নিকট ভিক্ষার হাত সম্প্রসারিত করার মাধ্যমেও এ সমস্যার সমাধান হতে পারে যা তার ব্যক্তিত্বকে একেবারে ম্লান করে দিতে পারে। ফলে অনেক সময় তাকে দাতার অপদস্ত অনুগামীতে রূপান্তরিত করে ফেলবে। ইবনে কাইয়্যুম রহ. বলেন, 'অভিভাবকের উচিত হলো শিশুকে অপরের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ থেকে চূড়ান্তভাবে ফিরিয়ে রাখবে। কারণ যদি সে গ্রহণে একবার অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে এটা তার স্বভাবে পরিণত হয়ে যাবে। 'গ্রহণ করবে কিন্তু দান করবে না' এভাবেই তার বিকাশ হবে।'[১৩১]

এমনিভাবে অধিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমালংঘন উচিত নয়- যা যুক্তিসঙ্গত সীমার অতীত। কারণ তা শিশুকে ধ্বংস করে দেবে। একেবারে ব্যয় না করা যদিও নিন্দিত চরিত্র। কিন্তএর বিপরীতে আরেকটি চরিত্র আছে যা এর থেকে মন্দ নয়। তা হলো অপচয় ও অপব্যয়। আল্লাহ্ তাআ'লা পবিত্র কোরআনে এ উভয় চরিত্র থেকে দূরে থাকতে বলেছেন -

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا .(الإسرآء-29)

'তুমি তোমার হাত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখ না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিত করেও দিও না। তা হলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।'[১৩২]

প্রতিপালন কর্মে অভিভাবকের হৃদয়ের বিশালতা

এই বয়োঃস্তরের মাঝামাঝি ও তারপর শিশুর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ ও মন্তব্য করণের উৎসাহ সৃষ্টি হয়। যেমনিভাবে তার নিকট সূচিত হয় প্রশ্নবান ও জিজ্ঞাসাবাদের আধিক্য। কোন কোন অভিভাবকের সময় থাকে খুবই ব্যস্ত, তারা শিশুদের জন্য এতটুকু সময় বের করতে পারেন না। এ প্রেক্ষিতে একেবারে সহজ সমাধান হলো : শিশুর সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় থেকে দূরে থাকবে এই যুক্তিতে যে, সে খুবই ব্যস্ত এ বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করার মত তার হাতে কোন সময় নেই অথবা এই মতামতগুলো নিরেট অসার অথবা অপূর্ণাঙ্গ ইত্যাদি। এটাই হলো সব চেয়ে বড় ভুল। কারণ একটি শিশু তার অভিভাবকের দিকে শ্রদ্ধামাখা দৃষ্টিতে তাকায়। অতএব সে-ই পারে তার এ সমস্যাগুলোর সমাধান দিতে। আর যখনই তিনি তাকে বিমুখ করলেন তখন শিশুটি নিশ্চয় অন্য কারো শরণাপন্ন হবে ও অভিভাবকের নিকট যা পেলো না সেটা তার কাছে তালাশ করবে। ফলশ্রুতিতে একটা গবেষণাগত বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হবে অথবা শিশু ও তার অভিভাবকের মধ্যে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে অভিভাবকের কর্তব্য হল, তার বক্ষ প্রসস্ত রাখবেন ও নিজের কাজগুলো যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করে তার সময়ের মধ্য থেকে একটি সময় বের করে নেবেন যেখানে শিশুর এই প্রয়োজনগুলোর সাড়া তিনি দিতে পারবেন। তার কল্পনা প্রসূত অসংখ্য বিষয়ের থেকে এটা উত্তম। এক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করে বরং প্রথমে তার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনবেন তারপর তার বক্তব্যের অনুশীলনী ও ব্যাখ্যা করবেন। কারণ এটাই মানব বিনির্মাণের সঠিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে সে নিজের, সমাজের ও দ্বীনের প্রভূত কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম হবে।

---

[১৩১]. তুহফাতুল মওদুদ ফি আহকামিল মওলুদ : ২৪১

[১৩২]. সুরা বনী ইসরাঈল আয়াত-২৯

ইসলামী পরিভাষাগুলোর ব্যবহার

পূববর্তী বয়োঃস্তরে কখনো শিশুকে 'এটা একটা ভালো ও সময় উপযোগী কাজ' এ জাতীয় কথা বলা গ্রহণযোগ্য ছিল। কারণ সেটা মা-বাবার নিকট পছন্দনীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেভাবে গ্রহণযোগ্য হতো 'এটা দোষের অথবা এ জাতীয় কথা।' কারণ সে কাজটি ছিলো অপছন্দনীয়। কিন্তু এই স্তরে এসে শরিয়তের পরিভাষাগুলো প্রয়োগ করা উচিত। কারণ এটাই তাকে পৌরুষ স্তরের যোগ্য করে তোলার মাধ্যম। তখন বলতে হবে এটা হালাল ও এটা হারাম, ওটা মুস্তাহাব ও ওটা মাকরুহ্ ইত্যাদি। এর প্রমাণ স্বরূপ একটি আয়াত ও একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে শিশুকে শরিয়তের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার লক্ষ্যে। যাতে বিষয়গুলো অভ্যাস ও সামাজিক প্রচলনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে শরিয়তের গণ্ডির মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে। ফলে সে কাজগুলোর তাৎপর্য ও মর্যাদা অর্জিত হয়ে যাবে। ফলে আল্লাহর আইন ও তার দ্বীনের মহত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে ও প্রকারান্তরে বয়োঃসন্ধি স্তরের জন্য শিশুকে তৈরী করাও হয়ে যাবে।

তবে অভিভাবকের পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআ'লা ও তদ্বীয় রাসুলের প্রতি মিথ্যারোপ করা হতে সতর্কতা অবলম্বন একান্ত কর্তব্য। যেমন বলা : 'এটা আল্লাহ বলেছেন' অথচ তিনি বলেননি। 'এটা রাসূল বলেছেন' অথচ তিনি বলেননি। এ রকম অসত্য কথা না বলেও একটি শিশুকে কিছু গ্রহণ কিংবা পরিহার করতে উদ্যত করা যায়। আর এ বয়সের শিশুদের সাথে অবাস্তব কোন কথা বলা উচিত নয়। যখন শিশু দেখবে কথাটা অবাস্তব তখন সে অভিভাবককে মিথ্যাবাদী মনে করবে। কিংবা অবাস্তব কথা বলাকে কোন দোষের কাজ বলে মনে করবে না।

চিন্তা, গবেষণা ও কারণ নির্ণয়

শিশুর প্রতিপালনের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তা ও গবেষণা পরিচিতির ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ। যা তাকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে বিশুদ্ধ সুদৃঢ় জ্ঞানের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবে। ফলশ্রুতিতে শিশু তার চতুর্পার্শ্বস্থ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্যতা ও সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। সম্পর্ক গড়ে তুলবে সূর্য ও পূর্ব দিগন্তে তার নিয়মিত উদয় ও দিনের শেষে তার অস্তগমনের সঙ্গে। কিন্তু সে কখনোই এই মহান ঘটনা সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারে না- কে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে? কিভাবে সে ভ্রমণ করে? কোন শক্তি তাকে ভ্রমণ করতে বাধ্য করছে ও তার জন্য এ অদ্ভুত নিয়ম কে বেঁধে দিয়েছে?– যার কারণে তার ভ্রমণে কখনোই ব্যত্যয় ঘটে না। কোত্থেকে আসলো তার এই তীর্যক জ্যোতি? প্রভৃতি বিষয় রয়েছে- যার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য বহু চিন্তা ও গবেষণা, বস্তু সমূহের পরিচিতি ও তার কারণ জানা প্রয়োজন। ভূ-পৃষ্ঠে এরকম অসংখ্য বস্তু রয়েছে। নদ-নদী, সাগর মহাসাগর ও চন্দ্র সবই তো এর অন্তর্ভুক্ত। আরো রয়েছে খুঁটিহীন সু-উচ্চ নভোমণ্ডল ইত্যাদি। অতএব এই বস্তু সামগ্রীর দিকে লক্ষ করতে, এ সম্পর্কে গবেষণা করতে, তার হেতু ও কারণ অনুসন্ধান করতে ও এগুলোর সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানতে শিশুকে অভ্যস্ত করা অভিভাবকরে দায়িত্ব। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণে এর অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে, যা সঠিক পদ্ধতিতে শিশুকে বিষয়গুলো অনুধাবন করাতে সক্ষম। এর সিঁড়ি বেয়ে শিশু এমন এক চূড়ান্ত ফলাফলে গিয়ে পৌঁছতে সক্ষম হবে, যার মধ্যে ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে।

দেখুন, সায়্যেদুনা ইব্রাহিম আ. যিনি এ পথে চলেছেন। আল্লাহ তাআ'লা এই ঘটনার বিবরণ তার জবানীতে দিয়েছেন-

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿76﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿77﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ .

(الأنعام-76-78)

'অতঃপর রাত যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল- 'এটাই আমার প্রতিপালক।' অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না।' অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জ্বল রূপে উদিত হতে দেখল তখন বলল, এটাই আমার প্রতিপালক।' যখন তা অস্ত মিত হল তখন বলল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথ ভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'[১৩৩]

কখনো বা এই চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা গৃহস্থালী সামগ্রী সংক্রান্ত কোন কাজ অথবা সেই কর্ম যা শিশু প্রত্যক্ষ করে সে ক্ষেত্রেও হতে পারে। এর দ্বারা এটাই একমাত্র লক্ষ্য নয় যে, উক্ত বিষয়ের সত্যিকারের পরিচয় লাভ করতে পারবে। বরং উক্ত গৃহস্থালী সামগ্রী সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণা পরিচালিত করে কোন ফলাফলে পৌঁছতে সক্ষম হবে। অথবা যার মাধ্যমে তার অভিভাবককে সমৃদ্ধ করবে। বরং আসল উদ্দেশ্য হল ক্রমাগত মার্জিত গবেষণায় শিশুকে প্রশিক্ষণ দেয়া যা– প্রাথমিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তার চূড়ান্ত ফলাফলে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

বিজাতীয় সংস্কৃতির অন্ধানুকরণ

শিশুরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়, বিশেষতঃ এই স্তরের শেষের দিকে এসে যার মধ্যে অধিকাংশ শিশুরা আক্রান্ত হয়ে থাকে। যেমন ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা ও তার নড়বড়ে অবস্থান ও ইসলমী অবকাঠামোর প্রতি অশ্রদ্ধাবোধ। সম্ভবতঃ এর কারণ হল, এই চিহ্নিত বয়সে যোগাযোগের অসংখ্য ও বিচিত্র মাধ্যম এসে শিশুদের নিকট উপস্থিত হয়ে থাকে। পঠন, শ্রবণ, প্রত্যক্ষ করণ ও বহিরাগত সমাজ সংশ্রব- যা তাদেরকে আকর্ষণীয় প্রভাবের কর্মক্ষেত্রে পরিণত করে। পরিশেষে তাদেরকে নাস্তিক, পাপাচারী ও মূল্যহীন ব্যক্তিদের আনুগত্য করতে প্ররোচিত করে। তাদের পোশাক পরিচ্ছদে, পানাহার পদ্ধতিতে, তাদের চুল কাটার ফ্যাশনে এমনকি তাদের বাহ্যিক অভিব্যক্তি ও সকল চালচলনে। অভিভাবকের এ বিষয়ে সতর্ক থাকা একান্ত কর্তব্য, তাকে সম্পূর্ণরূপে সতর্ক রাখতে হবে। কারণ কোন জাতির মৃত্যু হয় না যতক্ষণ না তার সন্তানদের ব্যক্তিত্ব দুর্বল হয় ও তাদের উত্তরসুরীদের নিয়ে আত্ম মর্যাদাবোধ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে তারা বিজাতীয় কৃষ্টি কালচারের মধ্যে নিশ্চিত হারিয়ে যায়। সে কারণে আমাদের শত্রুরা আমাদের সন্তানদেরকে তাদের সন্তানদের অনুরূপ বানাতে বেশ তৎপর। সবচেয়ে দুঃখজনক ও পরিতাপের বিষয় হলো, যেই অভিভাবকের কাছে প্রত্যাশা ছিলো যে, তারাই নিজ সন্তানদেরকে রাজপথের ওপর উঠাবে; তারাই কি-না তাদের সন্তানদেরকে অন্ধানুগত্য ও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শিশুকে সে দিকেই আহ্বান করে তার কথা ও কাজের মাধ্যমে। অথচ আমাদের ধর্ম ইসলাম বিজাতীদের সাদৃশ্য অবলম্বনে সম্পূর্ণরূপে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি কোন বিজাতির সাদৃশ্য

[১৩৩].সুরা আল-আনআ'ম-৭৬-৭৮

অবলম্বন করলো সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।'[১৩৪] উমার রা. আতাবাহ বিন ফারক্বাদ রা. কে লিখে পাঠালেন- যখন তারা আজারবাইজানে যুদ্ধরত অবস্থায় ছিলেন- 'তোমরা আরম্বড়তা ও পৌত্তলিকদের পোশাক পরিচ্ছেদ বর্জন কর।'[১৩৫]

সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিজাতীয় আনুগত্য হল, ছেলেকে মেয়ের অথবা মেয়েকে ছেলের সাজে সজ্জিত করা। এ ধরনের শিশুরা যখন শরিয়ত কর্তৃক আদিষ্ট হবে তখন তাদের ওপর অভিশাপ অনিবার্য হয়ে যাবে। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষদের ওপর ও পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলাদের ওপর অভিশম্পাত করেছে।[১৩৬] মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষদের নপুংশক ও পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলাদেরকে মেকি পুরুষ বলা হয়। এ প্রেক্ষিতে শিশুর অন্তরে তার ব্যক্তি সত্ত্বার অনুভূতি প্রবলভাবে জাগ্রত করা অভিভাবকের একান্ত কর্তব্য। সে একজন পুরুষ, একজন মুসলমান, ইসলাম হলো অপরাজেয় ও সুমহান, তার উপরে কোন জীবন বিধান নেই। আর মুসলমানগণ বিশ্ব মানবতার জন্য অনুকরণীয় একটি আদর্শ। সে হলো সর্বকালের সমগ্র বিশ্বের অমুসলিমদের থেকে উৎকৃষ্ট। শিশুর মনে তার ধর্ম ইসলামের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগ্রত করতে হবে। ঐ নাস্তিকদের আনুগত্য করে সে কিভাবে আবু বকর, উমার, উছমান, আলী, খালেদ, আবু ওবাইদাহ ও সা'দ বিন আবি ওক্কাস রা. প্রমূখদের উত্তরসুরী হতে পারবে? চূড়ান্তভাবে এর নিন্দনীয় ও কুৎসিত রূপ তার নিকট তুলে ধরতে হবে। এ সংক্রান্ত কোরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি ও বিজ্ঞজনদের বাণী তার নিকট উল্লেখ করতে হবে যা তাদেরকে এ শিক্ষাগুলো প্রদান করতে সক্ষম হবে। 'যার সাথে যার মহব্বত তার সাথে তার কিয়ামত' কথাটা তাদের নিকট স্পষ্ট করে দিতে হবে। যে ব্যক্তি যেই জাতির প্রতি ভালোবাসা রাখবে তার সঙ্গেই তার হাশর হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুকরণে তাদের আনুগত্য করলো সে তো প্রকারান্তরে তাদের ঐ পথকে ভালোবাসলো যেখানে তাদের আনুগত্য করলো। এমনিভাবে অন্ধানুগত্য ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি ও গবেষণার দুর্বলতার পরিচায়ক।

---

[১৩৪] .আবু দাউদ কিতাবুল-লিবাস-৩৫১২ , আহমদ-৪৮৬৮

[১৩৫].মুসলিম-৩৮৫৭

[১৩৬] .বুখারী-৫৪৩৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ বয়োঃসন্ধি স্তর (প্রাপ্ত বয়স্ক)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বয়োঃসন্ধি স্তর

এ বয়সটা হল ইসলামী শরিয়ত কর্তৃক আদিষ্ট হওয়ার স্তর, যার পরিচয় পাওয়া যাবে কয়েকটি নিদর্শন ও পনেরতম বছরে পৌছার মাধ্যমে। সাধারণতঃ এটার সূচনা হয়ে থাকে মধ্যম স্তরের শেষ ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সন্ধিক্ষণে।

ইবনুল কাইয়্যুম রহ. বলেন, 'যখন একটি শিশুর বয়স পনের বছর পূর্ণ হয়ে যায়, তখন ভিন্ন আরেকটি অবস্থার সৃষ্টি হয় : স্বপ্ন দোষ হয়, লজ্জাস্থানের চতুর্পাশে লোম গজায়, কণ্ঠস্বর মোটা হয়ে যায় ও তার নাসিকা রন্ধ্র পৃথক হয়ে যায়। এসবের মধ্য হতে শরিয়ত যে বিষয়টির বিবেচনা করেন তা হলো মাত্র দু'টো ঃ

- স্বপ্ন দোষ
- লোম গজানো।[১৩৭]

যখন শিশুর বয়োঃপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে আদিষ্টের কলম তার জন্য সক্রিয় ও পুরুষের সামগ্রিক বিধানাবলি তার জন্য প্রযোজ্য হবে। অতঃপর সে বয়োঃপ্রাপ্তির পরিপক্কতা অর্জন করবে। ইমাম যুহুরী রহ. শব্দটির ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন- 'পরিপক্কতা অর্জন হলো কোন মানুষের পৌরুষ স্তরে পৌছার পর থেকে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত। তিনি বলেন, 'অতএব পরিপক্কতা অর্জন হলো সীমানার প্রথম ও শেষ। তবে এটি কোন সীমা নয়। চল্লিশ বছর বয়সকে আল-কুরআনে الأشد বলে অভিহিত করা হয়েছে। শব্দটির অর্থ হলো শক্তি ও বীরত্ব। এ শব্দ থেকে الشديد এর অর্থ হল শক্তিশালী ব্যক্তি। অতএব الأشد এর অর্থ হল, অসম শক্তির অধিকারী। আর তা হলো বুদ্ধির পরিপক্কতা অর্জনের বয়স, যে কারণে শরিয়তের বিধানাবলি বাধ্যতামূলক হয়, বুদ্ধি ও বিবেকই হলো তার অবলম্বন। কিন্তু যখন বুদ্ধি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত পৌছার পর–যেখানে শরিয়তের বিধানাবলি বাধ্যতামূলক হয় তা অনুমান করে অবগত হওয়া অসম্ভব।

[১৩৭]. তুহফাতুল মওদুদ ফি আহকামিল মওলুদ-২৯১

এর সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানুষও তো বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সে কারণে ইসলাম এমন একটি সুস্পষ্ট নিদর্শনের মাধ্যমে তাকে সংজ্ঞায়িত করেছে যেখানে কেউ ভিন্নমত পোষণ করেননি। আর তা-ই হলো বয়োঃপ্রাপ্তি। এই বয়োঃপ্রাপ্তিই হলো পূর্ণতা প্রাপ্তির পরিচায়ক, যেখানে শরিয়তের বিধানাবলি বাধ্যতা মূলক হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক হলো এমন ব্যক্তি যার দৈহিক শক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সে কোন শ্রমসাধ্য কর্ম সম্পাদন ও শরিয়তের বিধানাবলি পালনের ক্ষেত্রে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। যার বুদ্ধিগত সামর্থ্য ও পরিপক্ক হয়েছে। ফলে সে দলিল প্রমাণাদি বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে। যেভাবে তার আবেগ ও উচ্ছাসের পূর্ণতা সাধিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সে সঠিকভাবে দিক-নির্দেশনা দিতে সক্ষম হবে। এমনিভাবে সেটা সংরক্ষণ করতে ও তার ওপর আবর্তিত আবেগ ও অনুভূতির ফলাফলও সে বের করতে সক্ষম হবে। সর্বোপরি তার প্রজনন ক্ষমতারও পূর্ণতা সাধিত হয়েছে যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানব প্রজাতিকে সংরক্ষণ করে থাকেন।

অনেকের দৃষ্টিতে এই স্তরটা হলো প্রচলিত مراهقة (মুরাহাকা) এর সূচনা। مراهقة যদিও আরবী ভাষার ক্রিয়ামূল رهق থেকে সংগৃহীত। কিন্তু কোন কোন ভাষা বিশারদ مراهقة শব্দটিকে মূলতঃ ল্যাটিন শব্দ বলে মত প্রকাশ করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, অধিকাংশ ভাষাবিদ কিশোর অথবা কিশোরীদের বয়োঃসন্ধিতে পৌঁছে যাওয়াকে مراهقة এর সূচনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

বয়োঃসন্ধি ক্ষণ

আরবী ভাষায় رهق শব্দটির একাধিক অর্থ এসছে। رهق অর্থ মিথ্যা, رهق অর্থ পাতলামী ও দুর্ব্যবহার, رهق অর্থ মানুষের মূর্খপণা ও তার বুদ্ধির অপরিপক্কতা। বলা হয়-وإنه لرهق نزل সে অনিষ্ট সাধনে দ্রুত ও দ্রুত ক্রুদ্ধ ব্যক্তি বা সে এমন ব্যক্তি যার মধ্যে ক্রোধ ও নির্বুদ্ধিতা বিদ্যমান অথবা সে এমন ব্যক্তি যার মধ্যে رهق রয়েছে যখন সে অনিষ্টতার দিকে ধাবিত হবে ও গোপন করবে। সর্বোপরি رهق হলো বোকামী ও সম্মানিত বস্তুকে ঢেকে ফেলা।

এমনিভাবে এই শব্দটির অথের মর্ধ্যে নিকটবর্তী হওয়া ও নৈকট্য অর্জনও রয়েছে। বলা হয়ে থাকে- راهق الغلام فهو مراهق অর্থাৎ সে স্বপ্ন দোষের নিকটবর্তী রয়েছে। বলা হয়ে থাকে- طلبت فلانا حتى رهقته অর্থ আমি অমুককে অনুসন্ধান করেছি তার নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত।[১৩৮] এক্ষেত্রে আনাস বিন মালেক রা. বর্ণিত হাদীসটি দ্রষ্টব্য। ওহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাত জন আনসার ও দু'কোরাইশীর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতকারে ছিলেন। ইতোমধ্যে তারা বয়োঃসন্ধি ক্ষণের নিকটে পৌঁছলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমাদের পক্ষে যে শত্রুদেরকে প্রতিহত করবে তার জন্য জান্নাত অবধারিত অথবা সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।"[১৩৯] আলোচ্য হাদীসে ব্যবহৃত শব্দ رهقوه এর অর্থ : তার নিকটবর্তী হলো ও নিকটে পৌঁছলো। এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বয়সের দিক থেকে مراهق সেই ব্যক্তি যে স্বপ্ন দোষের নিকটবর্তী হয়েছে তবে এখনো পর্যন্ত স্বপ্ন দোষ হয়নি, অর্থাৎ সে এখনো প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি।

---

[১৩৮] .লিসানুল আরব , رهق এর অর্থ দ্রষ্টব্য,মুলপদবাচ্য رهق ।

[১৩৯] .মুসলিম-৩৩৪৪

তবে মূর্খপণা, ক্রোধ ও অনিষ্টের প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অপরাপর গুণাগুণের দিক থেকে رهق যে কোন বয়োঃস্তরে মানুষের জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব। তার প্রথম, মধ্যম ও শেষ বয়সে। ওটা মানুষের জীবন প্রবাহের কোন নির্দিষ্ট কালের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়। আমি যতকুটু জানতে পেরেছি তার মধ্যে পাইনি যে, এই গুণাগুণ কালের কোন সীমাবদ্ধ সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আশা করি নোটটি মনোবিজ্ঞানের- অসংখ্য পাঠে যা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। مراهقة মানুষের জীবন প্রবাহের একটা নির্দিষ্ট কাল যার সূচনা বয়োঃসন্ধি ক্ষণ এবং একটা নির্ধারিত মেয়াদান্তে তার সমাপ্তি ঘটে' তা হতে আশ্রয়হীনতা অর্জনের সহায়ক হবে যা এই পাঠের একান্ত দাবী। কখনো কখনো তা কয়েক বছর পর্যন্ত প্রলম্বিত হতে পারে : চার থেকে ছয় বছর অথবা অনেকের মতে এর চেয়েও বেশি অথবা যুগের সঙ্গে যুগের ও এক সমাজের সঙ্গে অপর সমাজের পার্থক্যের কারণেও তা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এই অভিমতের আলোকে مراهقة এর সূচনা হবে বয়োঃসন্ধি ক্ষণে ও তার সমাপ্তি ঘটবে বুদ্ধিগত, সামাজিক ও ব্যক্তিগত আবেগের পরিপক্কতার মাধ্যমে। বয়োঃসন্ধি কালের দৈর্ঘ্য সমাজের ব্যক্তিবর্গের ওপর নির্ভর করে দশ বছর পর্যন্ত প্রলম্বিত হতে পারে।[১৪০] তবে অনেক গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি হলো এই সময়ে দুশ্চিন্তা, বিষণ্ণতা, অবমূল্যায়ন ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শৃঙ্খলহীনতা এ সবই সে বুঝতে পারে। এগুলোর জন্য তারা অসংখ্য সাক্ষী উল্লেখ করে থাকে যেগুলো তাদের অভিমতের স্বপক্ষের প্রমাণ বলে তারা জ্ঞান করে থাকে। অথচ এই মতের ওপর বিশেষজ্ঞদের কোন ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যা প্রমাণ করে এই বৈশিষ্ট্যাবলি ও কর্মকাণ্ড বয়স অথবা সাবালক হওয়ার আবশ্যকীয়তার অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং সমাজ অথবা সংস্কৃতিকে বয়োঃসন্ধির সাথে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর এই বৈশিষ্ট্যাবলির সিংহভাগ সেই অধ্যয়ন ও গবেষণার ফসল যার অধিকাংশটাই পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা নিজেদের সমাজের ওপর পরিচালিত করেছিলেন। তাদের গবেষণা প্রসূত এই ফলাফলগুলো সমগ্র মানবজাতির ওপর ব্যাপকভাবে চাপিয়ে দেয়া সমীচীন হবে না। কারণ এ গবেষণাটা শুধুমাত্র পাশ্চাত্য মানবগোষ্ঠীর জন্য পরিচালিত হয়েছিলো।

আমরা যদি বিষণ্ণতা ও অবমূল্যায়নের ব্যাখ্যা করি এই বয়সে মানুষের বুদ্ধির পূর্ণতা প্রাপ্তি দ্বারা অথচ তখন সে বসবাস করছে এমন এক পৌত্তলিক সমাজে, যেখানে বিরাজ করছে বিশ্বাসগত ভ্রষ্টতা ও চারিত্রিক নষ্টামী। এতদসত্ত্বেও তার বিবেকের দাবী ও সমাজে বিরাজমান পরিস্থিতির মধ্যে কোন সংঘর্ষ পাওয়া যাবে না। কিন্তু বয়োঃসন্ধি ক্ষণে পৌঁছানোর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার চেয়েও এটা বেশি বিশুদ্ধ, উত্তম ও সূক্ষ্ম অভিমত।[১৪১] কথাটা আরো স্পষ্ট করে এভাবেও বলা যায় : নিশ্চয়ই মানুষ কোন জড় পদার্থের নাম নয় যে পরিবেশের প্রভাব ও সময়ের সকল বন্ধন উপেক্ষা করে কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা প্রসূত নিয়ম-কানুনগুলোই তার ওপর প্রয়োগ করা হবে। বরং সে একটি জীবন্ত ব্যক্তি সত্তা যার দেহ, বুদ্ধি, হৃদয় ও একটি প্রাণ রয়েছে। আরো রয়েছে আবেগ, উৎকণ্ঠা, বিশ্বাস, অসংখ্য ধ্যান-ধারণা ও পরিকল্পনা। যা একজন থেকে অপর জনের, এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশের চেয়ে ভিন্ন ও বিপরীত হয়ে থাকে। সে কারণে ঐ পরিবেশসমূহ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা প্রসূত ফলাফল ও রীতি নীতিও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

এখানে জ্ঞাতব্য যে, নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার বারংবার একই ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে যদি শর্ত করা হয় যে, গবেষণা ও ফলাফল শর্তানুযায়ী হতে হবে ও উদ্যোক্তাদের তত্ত্বাবধানে হতে হবে। মুসলিম ও পৌত্তলিক সমাজের নিশ্চিত পার্থক্যের কারণে এটা কখনো বস্তবায়িত হয়নি ও ভবিষ্যতেও বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব

---

[১৪০] ড. হিশাম মুহম্মদ মুখাইমার কৃত ইলমু নাফসিন-নামুব্বি পৃষ্ঠা ১৫৭ দ্রষ্টব্য,

ড. মুহম্মদ সায়্যেদ মহম্মদ যা'বালাভী কৃত তারবিয়াতুল মারাহিক্ব বাইনাল ইসলাম ওয়া ইলমিন-নাফসি পৃষ্ঠা ৮৪

নয়। সে কারণে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান কর্তৃক তাদের অনুসারীদের আচার-আচরণের জন্য পরিবেশিত গবেষণালব্ধ অধিকাংশ ব্যাখ্যা ও ফলাফল অবশ্যই আমাদের ইসলামী সমাজের বাহ্যিক ব্যাখ্যার উপযুক্ত নয় । বরং সম্ভবতঃ উল্লেখিত প্রকাশ্য ব্যাখ্যারও আমাদের সমাজে মূলত কোন অস্তিত্ব নেই। এক্ষেত্রে যতটুকু ঘটেছে তাও আমাদের কারো কারো ঐ সমাজের অন্ধ অনুকরণের কারণে। সম্ভবত ড. উমার মুফদা তার উপস্থাপিত শিক্ষা সেমিনারে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন : 'তরুণদের দৃষ্টির সম্মুখে বয়োঃসন্ধি ক্ষণে প্রবৃত্তির দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ' শীর্ষক একটি সেমিনার পরিবেশন করেছিলেন। সেখানে বয়োঃসন্ধি ক্ষণে উপণীত তরুণদের অনুসৃত একটা সম্পর্ক তিনি দেখতে পেলেন অর্থাৎ যারা নিজেদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে বেড়ায়। কিন্তু এই সম্পর্কটা ছিলো ঘৃণিত ও মার্কিন সমাজ ঘেঁষা। কখনো নিশ্চয়ই ইসলাম এটা পরিবর্তন করে ব্যক্তির প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও সীমাবদ্ধ করতে সহায়তা করে। ফলে পরবর্তীতে গবেষণা ও প্রশ্নোত্তর কর্ম দীর্ঘায়িত হবে না।[১৪২] আমাদের নিকট মুসলিম তরুণ ও যুবকদের অসংখ্য উদাহরণ ও আদর্শ রয়েছে যারা সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে বুদ্ধিমান সুপুরুষ ও মর্যাদাবান হতে সক্ষম হয়েছেন। বরং তারা মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এটা সমুদ্রের ওপাড় থেকে আমাদের নিকট আমগনকারী কোন আদর্শ নয়। বরং তা হলো একটা বিশুদ্ধ মডেল যা আমাদেরকে মুসলিম সমাজে নিশ্চিত করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আসহাবে কাহাফ (গুহাবাসী) সম্পর্কে বলেন,

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. (الكهف-13)

'তারা কতক তরুণ তাহাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান গ্রহণ করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম।'[১৪৩] আল্লাহ তাআলা সাইয়েদিনা ইসমাঈল আ. সম্পর্কে বলেন, 'তার বাবার সঙ্গে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হওয়ার পর।' তা হলো বুদ্ধির পরিপক্কতা যদ্বারা প্রমাণ উপস্থাপণ করা যায় অথবা স্বপ্ন দোষ হওয়া। প্রসিদ্ধ ঘটনা :

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ.

(الصافات-102)

'অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বলল, 'বৎস ! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ্ করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল?' সে বলল, 'হে আমার পিতা, আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহর ইচ্ছাই আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।'[১৪৪]

এ হলো ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যার সম্পর্কে তার সম্প্রদায়ের লোকজন বলেছিল, যখন তিনি তাদের প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে দিয়েছিলেন-

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ .(الأنبياء-60)

---

১. আ. ড. ওমর বিন আঃ রহমান মুফদা কৃত ইলমু নাফসিল মারাহিলিল ওমরিয়্যাহ ,পৃষ্ঠা : ৩৪৮-৩৪৯

[১৪৩] .সুরা কাহাফ-১৩

[১৪৪]. সুরা সাফ্‌ফাত-১০২

'কেউ কেউ বলল, 'এক তরুণকে তাদের সমালোচনা করতে শুনেছি। যাকে বলা হয় ইবরাহীম।'[১৪৫]

এছাড়াও এ সময় সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে অসংখ্য উদ্ধৃতি রয়েছে।

প্রশ্ন : যদি বলা হয়- مراهقة কে উল্লেখিত অর্থে সংজ্ঞায়ন হলো একটা পরিভাষা। আর পরিভাষায় কোন দ্বন্দ্ব নেই।

উত্তর : তাকে বলা হবে নিঃসন্দেহে পরিভাষায় কোন দ্বন্দ্ব নেই ; তবে যে পরিভাষা বাস্তবতা ও সত্যের পরিপন্থী তার স্বীকৃতি অথবা গ্রহণ কোনটাই বৈধ নয়। যখন অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে একমত হন যে, مراهقة (তারুন্য) মানুষের বয়োঃপ্রাপ্তি থেকে সুচিত হয়। এ মতটি কোন ভাবেই গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ শরিয়ত বয়োঃপ্রাপ্তিকে আদিষ্ট হওয়া ও ইসলামের বিধানাবলি বাধ্যতামূলক হওয়ার আলামত নির্ধারণ করেছে। দোদুল্যমানতা, অবমূল্যায়ন, বিষণ্নতা, নৈরাশ্য ও আবেগতাড়িত ক্রোধ প্রভৃতির সূচনার সঙ্গে কিভাবে তাকলীফ বা আদিষ্টযোগ্য প্রযোজ্য হতে পারে?

مراهق শব্দের সঙ্গে অসংখ্য শরিয়তের বিধানাবলি সম্পৃক্ত। যেমন :

- مراهق মাহরাম হওয়ার যোগ্য কি না ?
- অপরিচিত মহিলার সঙ্গে তার একান্ত সাক্ষাতকার বৈধ কি না ?
- তার জন্য মেয়েদের সৌন্দর্য দর্শন বৈধ কি না ?
- সে যদি হজ্জব্রত পালন করে তাহলে ইসলামের ফরজ হজ্জ তার থেকে আদায় হয়ে যাবে কি না ?
- মদ্য পান করলে তার ওপর দণ্ডবিধি কার্যকর হবে কি না ?
- সে চুরি করলে তার হাত কর্তন করা হবে কি না ?
- কোন মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করলে তার ওপর দণ্ডবিধি কার্যকর হবে কি না ?
- এবং যে মহিলার সঙ্গে مراهق (বয়োঃসন্ধি ক্ষণে উপনীত তরুণ) ব্যভিচার করেছে তার ওপরও দণ্ডবিধি কার্যকর করা হবে কি না ?
- যদি উক্ত মহিলা বিবাহিত হয় তার ওপর (প্রস্তর নিক্ষেপে) মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে কি না ?

প্রভৃতি অসংখ্য ফিক্বহী মাসআলা রয়েছে যার সমাধান ফুকাহায়ে কেরাম আরবী ভাষার দাবীর আলোকে পেশ করেছেন। আর তা হলো مراهق যে এখনো প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি। অর্থাৎ সে হলো শিশু তবে শৈশবের শেষ স্তরে রয়েছে। পক্ষান্তরে মনোবিজ্ঞানে مراهق হলো যে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে গেছে। সে বয়োঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শরিয়ত কর্তৃক আদিষ্ট। এ দ্বৈত ব্যাখ্যা ফিক্বহী মাসআ'লার ক্ষেত্রে কঠিন দোদুল্যমান পরিস্থিতির মুখোমুখী করবে।

---

[১৪৫].সুরা আম্বিয়া-৬০

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাবালকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে যে, বয়োঃসন্ধি ক্ষণে উপনীত এক বালক যার দাবী সমাজের দৃষ্টিতে তরুণ-তরুণীদের পরিপক্কতার বয়স বিলম্ব করা। তার ভুল-ত্রুটিসমূহকে তুচ্ছ করে দেখা, বিরুদ্ধ আচরণে তাদের জন্য বাহানা তালাশ করা। অথচ প্রত্যেকটি সাবালক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের জন্য যে আবেদন রেখেছে তাদের জন্যও একই আবেদন প্রযোজ্য। কিন্তু শরিয়ত যে দৃষ্টিভঙ্গিতে একজন প্রাপ্ত বয়স্কের দিকে তাকায়- সে প্রাপ্ত বয়স্ক ও আদিষ্ট। তার সাথে আচার ব্যবহার এই ভিত্তিতেই পরিচালিত হবে। কারণ এটা তরুণ-তরুণীদের দ্রুত পরিপক্ক হতে সহায়ক হবে। ফলে সমাজও অবশ্য তাদের সঙ্গে এই ভিত্তিতেই আচার-ব্যবহার করতে পারে।

প্রথম অধ্যায় :

বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি

বয়োঃপ্রাপ্তি

কেউ কেউ মনে করে থাকেন এর উদ্দেশ্য হলো লিঙ্গগত পরিপক্ক অবস্থা অথবা লিঙ্গগত কার্যক্ষমতার পরিপূর্ণতা। এটা অবশ্যই আদিষ্ট হওয়ার (تكليف) ভিত্তি নয়। বরং تكليف এর মূল ভিত্তি তার নিকট চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা ইন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণতা অর্জন, আর তা-ই হলো 'আক্বল' বা বুদ্ধিমত্তা। বয়োঃপ্রাপ্তি বুদ্ধির পূর্ণতা লাভের নিদর্শন যদ্বারা تكليف অনিবার্য হয়ে যায়। অতএব আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে, তাদের মধ্যে এ বিষয়ে মতবিরোধ নিরসন কল্পে শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে লোম গজানো, কণ্ঠস্বর ভারী হওয়া অথবা প্রজনন ইন্দ্রিয়সমূহের দায়িত্ব পালনের সামর্থ লাভ কেবলমাত্র ইত্যাকার আলামতসমূহ প্রকাশ পেলেই تكليف এর মত মহান দায়িত্বে কাউকে আদিষ্ট করেন না। বরং এগুলো হলো কতগুলো নিদর্শন মাত্র।

এই স্তরে এসে তরুণ-তরুণীদের বিপরীত লিঙ্গে প্রতি অনুভূতি সক্রিয় হয়। তবে এটা সমস্যা নয়, কারণ এটা পৌরুষ ও নারীত্বের নিদর্শনের দাবী। কিন্তু মূল সমস্যা তখনই প্রকাশ পাবে যখন বিষয়টা শরিয়তের বিধানের আলোকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। অথচ শরিয়তই প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে তার বিশুদ্ধ পথে পরিচালিত করতে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তার মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত করেছেন। তিনিই আবার তাদের জীবন প্রবাহের জন্য জীবন বিধান দিয়েছেন যার মধ্যে শুধু কল্যাণ আর কল্যাণই নিহিত, তথায় কোন অকল্যাণের লেশমাত্র নেই। যা হবে সমাজ বিনির্মাণ ও তাদের পরস্পর যোগাযোগ স্থাপন এবং মানব প্রজাতির ধরাবাহিকতা সংরক্ষণের সোপান। অবশ্যই তা মানব জাতির বিপর্যয়, ধ্বংস ও বিলুপ্তির মাধ্যম নয়।

অতএব মা-বাবা ও অভিভাবকদের কর্তব্য হলো এই বিধানাবলি তারা নিজেরা শক্তভাবে ধারণ করতে সচেষ্ট হবে ও এর সঙ্গে আবদ্ধ থাকতে তৎপর হবে। এ পর্যায় উল্লেখযোগ্য কতিপয় বিধান নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

- উভয় লিঙ্গের মধ্যে সংশ্রব না হওয়া
- মেয়েদের প্রয়োজনে বাহিরে যেতে হলে শারঈ পোশাক বাধ্যতামূলকভাবে ধারণ করা

- অবিবাহিতদের সামর্থ হলে বিবাহ করা।
- দাম্পত্য জীবন পরিচালনার সামর্থ না থাকলে কামভাব দমনকারীর আশ্রয় নেয়া। এরজন্য উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বিষয় প্রত্যক্ষ করা ও পাঠ থেকে বিরত থাকাসহ রোজাব্রত পালনের অনুশীলন করা যেতে পারে।
- শক্তি সামর্থ্যকে কোন জনহিতকর ও ফলপ্রসূ কাজে নিয়োজিত রাখা।
- অবসর সময়গুলোকে ব্যস্ত রাখতে প্রচেষ্টা করা ও কোন বিশুদ্ধ ও মহৎ লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকা। ফলে তরুণ-তরুণীরা চিন্তাগত দিক থেকে ঐ ধরনের অনুভূতি থেকে দূরে থাকতে পারবে।
- এর পূর্বে ও পরে নেক আমলকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা।
- অতি অবশ্যই আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া ও আশ্রয় প্রার্থনা করা। অশালীন ও গর্হিত কর্মের নিকটবর্তী হওয়া থেকে মুক্তি ও হেফাজত থাকার প্রার্থনা খুব কাকুতি মিনতিসহ করা।

পরিপক্কতা ও পূর্ণাঙ্গতা

একটি শিশুর এ স্তরে রূপান্তরিত হলেই তার মধ্যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় ; চাই সেটা তার দেহ, বুদ্ধি, গবেষণা অথবা অনুভূতিতেই হোক না কেন, যা অবশ্যই তাকে পূর্ববর্তী স্তর থেকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে। এখন আর তাকে শিশু অথবা বাচ্চা বলে নামকরণ করা শুদ্ধ হবে না। বরং সে এখন একজন পুরুষ। নব যৌবনের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাকে বলা হবে: তরুণ অথবা বালক। তরুণের নিকট পরিপক্ক ও পূর্ণাঙ্গতার বিভিন্ন প্রকরণ হয়ে থাকে।

সুতরাং শিশুর বুদ্ধিগত সামর্থ্য ও গভীরতা তার অনিবার্য পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে অগ্রসর ও বিকাশ লাভ করতে থাকে। যদ্বারা প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে থাকে ও শরিয়তের বিধানাবলি কার্যকর হয়। ফলে বিরুদ্ধাচারণ ও শৈথিল্য প্রদর্শনে তাকে নিশ্চিত জবাবদিহী করা হবে। এ বয়সে শিশুর নিকট নিরেট চিন্তা ভাবনার (যা কোন অনুধাবনযোগ্য বিষয় সংশ্লিষ্ট নয়) সামর্থ্য পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপ পরোক্ষ বিষয়, একটি মোকদ্দমার অসংখ্য দূরত্ব ও বিভিন্নদিক সে উপলব্ধি করতে সক্ষম ও সামগ্রিক বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্প্রসারিত হয়ে থাকে। ফলে সে আর এক কোণে আবদ্ধ হয়ে থাকবে না। উপরন্তু সে প্রবিষ্ট করণ, বিন্যাস, অবগঠন অথবা পরিক্ষণের মত উচ্চতর গবেষণার অভিজ্ঞতা চর্চায় সক্ষম। এমনিভাবে উপস্থিত বিষয় দ্বারা অনুপস্থিত বিষয়ের ওপর প্রমাণ উপস্থাপন, একাধিক প্রাথমিক তথ্য একত্রিত করে তা বাস্তবায়নের জন্য সে দিকে দৃষ্টিপাত করা ও এর ওপর আবর্তিত সম্ভাব্য ফলাফল পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হওয়া এসব কিছুই সে পারে। যেভাবে সে শিক্ষামূলক গবেষণা পরিচালনা করতে পারে। যেহেতু সে সমস্যা উপলব্ধি করতে ও আলোচ্য বিষয় সংজ্ঞায়িত করতে প্রয়াস পায়। ফলে এখান থেকেই এই সমস্যাটা ব্যাখ্যার উপযোগী তথ্যাবলি একত্রিত করে থাকে। অতঃপর একটি একটি করে তথ্যগুলো নিরীক্ষা করতে থাকে কাংক্ষিত তথ্যটি আবিস্কার করা পর্যন্ত যা উল্লেখিত সমস্যার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে।[১৪৬] এই বুদ্ধিগত সামর্থ্যের মাধ্যমে সেই তরুণ সত্যের সন্ধান, সত্য চর্চা করতে ও শৈশব অথবা শিশু বয়সে দীক্ষালব্ধ আনুগত্য নির্ভর ঈমানকে যুক্তিযুক্ত শ্রুতিনির্ভর প্রমাণাদি লব্ধ বিশ্বাসগত ঈমানে

১. ড. মুহম্মদ সায়্যেদ মুহম্মদ যা'বালাভী কৃত তারবিয়াতুল মারাহিক্ব বাইনাল ইসলামে ওয়া ইলমিন-নাফসি-পৃষ্ঠা ৮০-৮১

সুনিশ্চিত রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে। এটা নিঃসন্দেহে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বুদ্ধিগত সামর্থ লব্ধ ফলাফল নিশ্চিত করতে হলে তরুণ-তরুণীদেরকে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সার কথা হলো, এই যোগ্যতা ও তা অর্জনের পর্যাপ্ত সামর্থ্য আল্লাহর ইচ্ছাই তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, এর অর্থ কখনোই এটা নয় যে, সকল প্রাপ্ত বয়স্করাই কার্যতঃ এই অবস্থানে রয়েছে। এমন না হলে তো সকল মানুষই মর্যাদা ও সম্মানের দিক থেকে সমপর্যায়ের হতো।

এমনিভাবে দেহটাও দ্রুত বিকাশ লাভ করে, কিন্তু সেটা হলো শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে একটা ভারসাম্যপূর্ণ ক্রমাগত বিকাশ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. (التين-4)

'আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।'[১৪৭]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ . فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ

(الإنفطار-7 -8)

'যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন, যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।'[১৪৮]

তা কোন অসামঞ্জস্য অথবা দোদুল্যমান বিকাশ নয়, যার ফলে মেজাজের দোদুল্যপনা, আবেগ, উত্তেজনা, কষ্টানুভূতি, অবাধ্যতা অথবা চলার পথে পদস্খলন সৃষ্টি হতে পারে। ফলশ্রুতিতে সে হয়ে পড়বে হতবিহ্বল ও নির্বোধের ন্যায়। যেমনিভাবে কোন কোন শিক্ষা তাকে এ দিকে ধাবিত করে থাকে বৈকি।[১৪৯] এ সুগঠিত বর্ধনশীল দেহ দ্বারাই তো বান্দা শক্তি অর্জন করে নামাজ রোজা ও জিহাদ ইত্যাকার গুরুত্বপূর্ণ শরিয়তের বিধানাবলি পালনে সামর্থ লাভ করে থাকে।

এই সময়ই আবেগ ও উচ্ছাসগুলো পরিপক্ক হয়, যে ঘটনা ও অনুঘটনগুলো তরুণের সম্মুখে সংঘটিত হয় অথবা সে শুনতে পায় তাই তার আবেগকে উত্তেজিত করে। কিন্তু সেই আবেগ প্রবঞ্চিত হওয়া অথবা না হওয়া অথবা প্রশংসা ও ভর্ৎসনাকে অতিক্রম করে এমন এক অনুভূতির দিকে ধাবিত হয় যা কোন মহৎ কর্ম-তৎপরতার প্রেরণা যোগাতে সক্ষম হয়। যদি হয়, তাহলে এটা হবে ইতিবাচক আবেগ।

এক্ষেত্রে একজন তরুণ প্রত্যক্ষ অথবা বাহ্যিক ভূমিকার ওপর তুষ্ট থাকতে পারবে না। বরং তার ভেতরে সৃষ্ট এ ইতিবাচক আবেগই এই সৎ তরুণকে সৎ কাজের নির্দেশ ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখতে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে থাকবে। ফলে এমনকি যদি সেই কর্ম সম্পাদনে তাকে বিপদের সম্মুখীনও হতে হয় তুবও সে এ ব্যাপারে আপোষহীন থাকবে। কারণ তার রয়েছে উচ্চ আত্ম-বিশ্বাস। লক্ষ করুন, দুই আনসারী বালক যখন আবু জাহল কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়া সম্পর্কে জানতে পারল, তখন তারা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লো এবং তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে

---

[১৪৭] . আত-তীন-৪

[১৪৮].আল-ইন্‌ফিতার-৭-৮

৩. ড. মহম্মদ সায়্যেদ মুহম্মদ যা'বালাভী কৃত তারবিয়াতুল মুরাহিক্ব বাইনাল ইসলামি ওয়া ইলমিন-নাফসি, পৃষ্ঠা ৪১-৫৭ এ প্রাসাঙ্গিক ঘটনা ও উত্তর দ্রষ্টব্য।

ফেললো। যার পূর্ণ বিবরণ আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. এর যবানীতে : তিনি বলেন, ‘আমি বদরের দিন যুদ্ধের সাড়িতে দণ্ডায়মান অবস্থায় অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ডানে বামে তাকাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমি আনসারদের দুই বালককে দেখতে পেলাম যাদের সবেমাত্র দাঁত উঠেছে। আমি উভয়ের মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী তা প্রত্যক্ষ করছিলাম, তখন তাদের মধ্যে একজন আমাকে চেপে ধরে বললো : চাচাজান, আপনি কি আবু জাহলকে চেনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে ভ্রাতুস্পুত্র, তার কাছে তোমার কি প্রয়োজন? তারা বলল, আমরা জানতে পেরেছি, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়। ঐ সত্ত্বার শপথ! যার হাতে আমাদের প্রাণ, আমরা যদি তাকে দেখতে পাই তাহলে আমাদের মধ্যে একজন নিহত না হয়ে একজনের ছায়া অন্য জন থেকে পৃথক হবে না। ফলে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। অতঃপর অপর জন আমার হাত ধরে অনুরূপ কথাই বললো। এরপর কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আমি আবু জাহলকে লোকের ভেতর ঘোরাফেরা করতে দেখে বললাম : এই হলো তোমাদের শিকার যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে। অতঃপর উভয়ে তাদের তরবারী কোষমুক্ত করে তাকে হত্যা করে ফেললো। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে ঘটনার বিস্ত ারিত বিবরণ দিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- ‘তোমাদের দু’জনের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? উভয়ে বললো- ‘আমিই তাকে হত্যা করেছি।’ অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- ‘তোমরা কি তোমাদের তলোয়ার মুছে ফেলেছো? তারা উভয়ে বললো, না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় তলোয়ারের দিকে লক্ষ করে বললেন- ‘তোমরা দু’জনেই তাকে হত্যা করেছো।’ তবে তার পরিত্যক্ত সম্পদ পাবে মুয়ায বিন আমর বিন আল-জামুহ। এ তরুণ দুজনের নাম ছিল, মুআয বিন আফরা ও মুআয বিন আমর বিন আল-জামুহ।’[১৫০]

আরেকটি ঘটনা আমিরুল মু’মিনীন উমার বিন আব্দুল আজিজ রহ. এর ছেলে আব্দুল মালেকের। তখন তার বয়স ছিলো উনিশ বছর। যখন তিনি স্বীয় পিতাকে দেখলেন, তিনি জন সাধারণকে সুন্নতের অনুসরণের প্রতি অনুপ্রাণিত করছেন। তার বাবা তাদেরকে পুরোপুরি সুন্নাতের ওপর উঠাক এটা তারও একান্ত ইচ্ছা ছিল। তার নিকট এসে তিনি তার সম্মানিত পিতাকে বললেন : ‘হে আমিরুল মু’মিনীন, আপনি কি কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহর আলোকে দেশ পরিচালনা করছেন না ? অতঃপর আল্লাহর শপথ! আমার ও আপনার চুলায় পাতিল জ্বলা না জ্বলার আমি কোন ভ্রুক্ষেপ করি না।’ এরপর তিনি তার ছেলেকে বললেন- ‘আমি জনগণকে কষ্টসাধ্য কাজের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। আমি সুন্নাতের কোন অধ্যায় থেকে বেরিয়ে গেলে সেখানে প্রত্যাশার পর্ব রেখে দেই। তারা যদি সুন্নাতের জন্য বেরিয়ে পড়ে তাহলে প্রত্যাশার প্রশান্তি পাবে। আমি যদি পঞ্চাশ বছর বয়স পেতাম তাহলেও আমি মনে করতাম যে, আমার সকল প্রত্যাশা আমি তাদের কাছে পৌঁছাতে পারিনি। কারণ আমি বেঁচে থাকলে আমার প্রয়োজনও বেড়ে যাবে; আর যদি মৃত্যু বরণ করি। তাহলে আল্লাহ তাআ’লাই আমার নিয়্যত সম্পর্কে সম্যক অবগত।’[১৫১]

পরিপক্কতা ও পূর্ণতা তার বাহককে স্থিরতা ও ভারসাম্যতা, সত্যকে গ্রহণ ও মিথ্যা বর্জনের দিকে আহ্বান করে। কিন্তু যে পরিবেশে সে বসবাস করে সেখানে এমন ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যা দ্ব্যর্থহীনভাবে বিবেক সম্মত প্রমাণাদির সঙ্গে সাংঘর্ষিক অথবা যা সংঘটিত হয়েছে অথবা হওয়া উচিত। তখনই প্রকাশ পাবে, অস্থিরতা দোদুল্যপনা বিষণ্নতা নৈরাশ্য ও যুক্তি বিবর্জিত ক্রোধ তাড়িত আবেগ। এটা কিছু কাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যা কখনো দীর্ঘ আবার কখনো নাতিদীর্ঘও হতে পারে। অনেক সময়

---

[১৫০] . বুখারী : ২৯০৮ , মুসলিম : ৩২৯৬

১. আল-মারুযি কৃত আস্-সুন্নাহ : ১/৩১, ইমাম আহমদ কৃত আয-যুহদ : ১/৩০০

অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ববিরোধী বিষয়গুলো গ্রহণ করে তার সঙ্গে বসবাস করতে ও তাকে ভালোবাসতে হয়। ফলে সেগুলো সে ভালোবাসবে অথবা সেগুলোর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা পরিবর্তন করে ফেলবে।

অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী স্তরগুলোতে যদি একটি তরুণের বিশুদ্ধ পরিচর্যা ও প্রতিপালন না হয়, তাহলে এখন অনেক সমস্যা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। কারণ তরুণটি তখন তার মা-বাবা ও শিক্ষকবৃন্দ থেকে গবেষণাগত ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অনুভব করতে শিখবে। আর এর অবশ্যম্ভাবলী ফসল হলো বন্ধু নির্বাচন, অবসর সময় কাটানোর পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা। এমনিভাবে অভিভাবক কর্তৃক প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা ও উপদেশাবলি গ্রহণ না করলে অসংখ্য সমস্যা দেখা দেবে। একটি তরুণ চায় প্রত্যেকটি বিষয়ে তার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থাকুক। এতে সে যদি প্রসিদ্ধ ও পরিচিত পথ থেকে বেরিয়েও যায় তবুও।

تكليف বা শরিয়তের নির্দেশ পালনে আদিষ্ট হওয়া

একটি তরুণের এই স্তরে পৌঁছলে তার মধ্যে কয়েক প্রকারের বিকাশ সাধিত হয়ে থাকে যেগুলো ইতিপূর্বে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা কোন অহেতুক বিকাশ নয়, বরং এর পেছনে মহান উদ্দেশ্য লুক্কায়িত রয়েছে। তা হলো, আল্লাহপাক তার বান্দাদেরকে এই স্তরে পৌঁছার সাথে সাথে আদিষ্ট করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করে সৎকাজ করবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। পক্ষান্তরে যে অস্বীকার করবে তার জন্য জাহান্নাম। (আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে আমরা এর থেকে মুক্তি ও পরিত্রাণ চাই।) ফলে এর বিকাশ বান্দার বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করবে। তবে কখনোই তা বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে প্রমাণ হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. (النساء-165)

'যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর কাছে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে।'[১৫২]

অতএব দৈহিক বিকাশ বিধানাবলি পালনে সামর্থ্য লাভের জন্য অবশ্যম্ভাবী। বুদ্ধিগত বিকাশ, প্রমাণ অনুধাবনে সামর্থ অর্জন ভ্রষ্টতার পথগুলো ও হেদায়েতের প্রমাণাদি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারে। আবেগ ও উচ্ছাসের মধ্যে বিকাশ সাধন, জনসাধারণের জন্য সত্য গ্রহণ ও অসত্য অপনোদন সর্বোপরি আল্লাহর পথে সমূহ কষ্ট যথাসম্ভব সহ্য করতে সহায়ক হবে। অতএব দৈহিক বিকাশ বলতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসম ও শৃঙ্খলাহীন বিকাশ নয় ; যার কারণে তরুণ তার মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলবে। তার স্বাভাবিক জীবন প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়বে। অন্য দিকে বুদ্ধির বিকাশের অর্থ এই নয় যে, সে তার মা-বাবা ও শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিরোধ করবে ও তার বিরোধীদের মতামতকে নির্বুদ্ধিতা ঠাওরাবে। যেমনিভাবে লিঙ্গগত পরিপক্কতার অর্থ এই নয় যে, একটি তরুণ অদৃশ্য আহ্বানকারী যোগাযোগকারী ও বিপরীত লিঙ্গ নিয়ে সদা তৎপর থাকবে। আবেগের বিকাশ বলতে একগুয়েমী স্বভাব, ক্রুদ্ধ প্রভাবান্বিত, অপারগতা ও রাগান্বিত হওয়া নয়, যার ফলে সে অপরের সঙ্গে কোন দুর্ঘটনা ঘটায় ও মারামারি করতে উদ্যত হয়।

সুতরাং একজন তরুণের সুষ্ঠ বিকাশ যা আল্লাহ তাআলা তাকে দান করেছেন তাহলো : আল্লাহ তাআলার অবশ্যপালনীয় বিধান পালনে সামর্থ্য অর্জনের জন্য। সেই বিকাশকে তার উদ্দেশ্যের বিপরীত খাতে প্রবাহিত করা হলে দেখা দেবে বহু রোগ ব্যাধি ও ত্রুটি বিচ্যুতি। অথচ এই ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো এই

[১৫২] নিসা-১৬৫

বয়োঃস্তরের বৈশিষ্ট্যাবলির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কারণ, যে মহান সত্ত্বা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তো এর জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করেননি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. (الذاريات-56)

'আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।'[১৫৩]

সে কারণেই অভিভাবককে প্রকাশিত লক্ষণগুলোর সাথে আচরণ করতে হবে এমনভাবে, যেন সেগুলো হলো কতগুলো রোগ- যার চিকিৎসা একান্ত প্রয়োজন। এগুলো 'এই বয়সেরই অপ্রতিরোধ্য প্রতিক্রিয়া, 'তরুণটি এ ব্যাপারে অনন্যোপায় এখানে তার কোন ইচ্ছাশক্তিই কাজ করে না' ভেবে কখনোই তাদের সঙ্গে সে অনুযায়ী আচরণ করা যাবে না।

অনন্তর মানুষ একটি অবসর জীবন পায়নি, বরং মানুষ জীবনকে জন্মগত অভ্যাসপূর্ণ অবস্থায় পেয়েছে- যে অভ্যাসের ওপর আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মা-বাবা, অভিভাবকবৃন্দের তৎপরতা অথবা পরিবেশের কারণে তার পরিবর্তন ঘটে থাকে। পক্ষান্তরে সে যদি তার স্বভাবজাত প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে ও তার কোন কিছুরই পরিবর্তন সাধিত না হয়। তাহলে সে ইসলামকে সাদরে গ্রহণ করবে, যা তাকে সামগ্রিক কল্যাণ ও প্রতিটি সুন্দরতম নান্দনিক চরিত্রে নির্দেশ করবে। সকল অকল্যাণ ও নিন্দনীয় মন্দ চরিত্র থেকে তাকে বিরত রাখবে। অতএব একজন তরুণ যখন জন্মগত স্বভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ও ইসলামী পরিবেশে প্রতিপালিত হবে, তখন উল্লেখিত কর্মকাণ্ডগুলো তাকে স্পর্শ করতে পারে এমন সাধ্য কি তার আছে? বরং তা আসে একটি স্বভাববিকৃত পরিবেশ থেকে। 'অতঃপর তার মা-বাবা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়।'[১৫৪] অথবা তার প্রতিপালন আল্লাহ তাআলার বিধানের আলোকে করা হয় না। সর্বোপরি কথা হলো যার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে সেখান থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে হবে। তবে অবশ্যই তা 'এ বয়সের বৈশিষ্ট্য নয়' কথাটা সব সময় মাথায় রাখতে হবে।

সাহসিকতা, অগ্রগামিতা ও কষ্টসাধ্য কর্মসম্পাদন

এই বয়োঃস্তরে তরুণের শরীরে যে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি সাধিত হয় ও তার নিকট গবেষণা করার যে ক্ষমতা অর্জিত হয়, তা-ই নিজের কাছেও ঐ শক্তি ও সামর্থের অনুভূতির জন্ম দেয়।

আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন-

اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً. (الروم:54)

'আল্লাহ, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি ; শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।'[১৫৫] শৈশবের দুর্বলতা থেকে ক্রমান্বয়ে তারুণ্য ও যৌবনের শক্তির দিকে সে রূপান্তরিত হয়। শক্তি ও সামর্থের অনুভূতি তাকে অগ্রগামিতা ও কষ্টসাধ্য কর্মসম্পাদনে অনুপ্রাণিত করে। সেহেতু অধিকাংশ সময় সে কোন

---

[১৫৩]. আয-যারিয়াত : ৫৬

[১৫৪]. বুখারী : ১২৭০ ,মুসলিম : ৪৮০৩

[১৫৫] .আর-রুম-৫৪

প্রতিকূলতার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করে না। এটা তার ভালো একটি দিক যদি তরুণটি সত্যাশ্রয়ী হয়। পক্ষান্ত রে আবেগতাড়িত হয়ে যদি সঠিক দিক-নির্দেশনা থেকে দূরে সরে যায় তাহলে এটা হবে তরুণটির ধ্বংস ও মন্দ দিক। অতএব অভিভাবককে এক্ষেত্রে খুবই সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে যাতে তিনি তরুণটিকে কল্যাণের পথে নেতৃত্ব দিতে পারেন।

সর্বকালেই এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে : একাধিক সাহাবায়ে কেরাম জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন অথচ এরপর তারা তারুণ্যে গমন করেছেন। তারা এক্ষেত্রে যার পর নাই উদগ্রীবও ছিলেন বটে। এমনকি তারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য নিজেদের বয়স বেশী দেখানোর কৌশল অবলম্বন করতেন। সামুরাহ বিন যুনদুব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার মা বিধবা হওয়ার পর তিনি মদীনায় চলে আসলে লোকেরা তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। এরপর তিনি বলেন, 'এই অনাথের দায়িত্বভার যে ব্যক্তি গ্রহণ করতে রাজি হবে আমি শুধুমাত্র তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি। অতঃপর তাকে এক আনসারী বিবাহ করলো। তিনি (হাদিসের বর্ণনাকারী) বলেন, 'প্রতি বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আনসারী বালকদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য পেশ করা হতো। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের বয়স হয়েছে তাদেরকে মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীতে তালিকাভুক্ত করে নিতেন। তিনি (হাদীসের বর্ণনাকারী) বলেন, 'আমাকে এক বছর পেশ করা হলো। তখন এক বালককে ভর্তি করা হলো আর আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল, আপনি ওকে ভর্তি করে নিলেন আর আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। অথচ আমি তার সঙ্গে কুস্তি ধরে তাকে ধরাশায়ী করতে পারি। অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'তাহলে দেরি করছো কেন? কুস্তি ধরেই দেখাও না।' অতঃপর আমি কুস্তি ধরে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলি। ফলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।'[১৫৬] আব্দুল্লাহ বিন উমার রা.থেকে বর্ণিত, 'অহুদের দিন তাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থাপিত করা হলো, অথচ সে তখন চৌদ্দ বছরের কঁচি বালক। তাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। অতঃপর দ্বিতীয় বার আমাকে খন্দকের দিন পেশ করা হলো, অবশ্য তখন আমার বয়স পনের বছর পূর্ণ হয়েছিলো। তখন আমাকে অনুমতি দেয়া হলো।' (হাদীস বর্ণনাকারী) নাফে' বলেন, 'আমি উমার বিন আব্দুল আজিজের দরবারে গেলাম, যখন তিনি মুসলিম জাহানের সম্রাট। অতঃপর এই হাদীসটি তার নিকট বর্ণনা করলে তিনি সকল প্রাদেশিক গভর্নরদের নিকট শাহী ফরমান লিখে পাঠালেন- 'পনের বছর পূর্ণ হয়েছে এমন বালকদের জন্য সেনাবাহিনীর তহবিল থেকে ভাতা নির্ধারণ করে দেয়া হোক।'[১৫৭] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসামা বিন যায়েদ রা. এর হাতে আঠারো অথবা বিশ বছর বয়সে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। এর বিপরীতে আমরা দেখতে পাই অসংখ্য অপরাধ যা এমন লোকদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে যারা জীবনের এই ঈর্ষণীয় ও প্রসন্ন বয়সে উপনীত। এই প্রেক্ষাপটে এই বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত বয়সকে যথাযথ ব্যবহার করে শ্রমসাধ্য কল্যাণকর কর্ম সম্পাদনের জন্য তরুণকে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে এখান থেকে উপকৃত হওয়া অভিভাবকের কর্তব্য। সাথে সাথে না দেখে না বুঝে কোন কাজে আসক্ত হওয়া ও নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া হতে তাকে সতর্ক করতে হবে ।

[১৫৬] .মুস্তাদরেকে হাকেম-২/৬৯

[১৫৭] .বখারী-২৪৭০ , মুসলিম-৩৪৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায় :

অন্তরায় ও সমস্যাবলী

পূর্ববর্তী স্তরগুলোয় যখন উত্তম রূপে একজন যুবকের প্রতিপালন ও পরিচর্যা সাধিত হবে। তখন পূর্ববর্তী অন্তরায় ও সমস্যাগুলোও দূরীভূত বা বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই স্তর সংশ্লিষ্ট প্রকট একটি সমস্যা প্রকাশিত হতে পারে। তা হলো তরুণ তরুণীদের বয়োঃসন্ধি সংশ্লিষ্ট সমস্যা। আর এটা শুধুমাত্র উত্তম পরিচর্যা ও প্রতিপালনের অভাবেই দেখা দিতে পারে। অথবা সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে সেই নষ্ট পরিবেশের কারণে যেখানে সেই তরুণ-তরুণীরা বসবাস করছে। আল্লাহ তাআলা তো এই সুন্দর বসুন্ধরাটাকে আবাদ ও মানব প্রজন্মকে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে মানুষের মধ্যে কামোত্তেজনা ও সঙ্গমের সামর্থ প্রোথিত করে রেখেছেন। পক্ষান্তরে এটা যদি নিরেট একটা কর্ম হতো যেখানে কোন কামভাব থাকবে না, উপভোগ করা যাবে না তা সম্পাদনে কোন স্বাদ তাহলে কেউ বিবাহ করতে কিংবা এর ব্যয় ভার বহন করতে অগ্রসর হতো না। ফলে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে মানব প্রজাতি বিলুপ্তির মাধ্যমে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস ডেকে আনতো। অনন্তর আল্লাহ তাআলা এই বিশ্বকে এই জন্য সৃষ্টি করেননি। কিন্তু এই কামভাবকে যদি শরিয়তের বিধানাবলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না করা হয়, তখনই সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। আর তা হলো তরুণ-তরুণীদের অবৈধ পথে কামক্ষুধা চরিতার্থ করা। ইসলাম এই সম্ভাব্য সমস্যার অসংখ্য উপকারী ও ফলপ্রসূ সমাধান দিয়েছে। অভিভাবকদের এই সমাধানগুলো থেকে উপকৃত হওয়া ও তা প্রয়োগ করা কর্তব্য। কারণ এইগুলোই আল্লাহর ইচ্ছায় উক্ত সমস্যা থেকে রক্ষা করতে পারে। তা হতে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১- মহিলাদের গৃহ অভ্যন্তরে অবস্থান করা ও শরিয়ত সম্মত প্রয়োজন ছাড়া বের না হওয়া।

২- শরিয়ত সম্মত প্রয়োজনে বের হওয়ার সময় মহিলাদের পোশাকের ব্যাপারে সমাজকে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করা। বের হওয়ার সময় বাঞ্ছনীয় কর্ম : আবৃত হওয়া ও সৌন্দর্য প্রকাশ না করার প্রতি যত্নবান হওয়া।

৩- দৃষ্টি অবনত রাখা। আল্লাহ তাআলা যে দিকে তাকাতে নিষিদ্ধ করেছেন সে দিকে না তাকানো।

৪- উম্মোচিত হওয়া, দ্রষ্টব্য হওয়া অথবা স্পর্শকৃত হওয়া থেকে লজ্জা স্থানকে সংরক্ষণ করা।

৫- তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সংশ্রব না ঘটা। চাই তা পথে, ঘরে অথবা কর্মক্ষেত্র যেখানেই হোক না কেন।

৬- নির্জনতা পরিহার করা, অর্থাৎ কোন তরুণ তরুণীর সঙ্গে একান্তে মিলিত হবে না। কারণ শয়তান হয় তখন তাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি। ফলে সে তাদেরকে অবৈধ কাজের জন্য কুমন্ত্রণা দেবে ও তাদেরকে অপকর্মের দিকে ভালো করে ঠেলে দিতে সক্ষম হবে।

৭- সময় হলে বিবাহ কর্ম দ্রুত সম্পন্ন করা ও এতে বিলম্ব না করা।

৮- যার বিবাহ করার আর্থিক সামর্থ নেই তার জন্য রোজাব্রত পালন করা।

৯- উত্তেজনাবর্ধনকারী বিষয় থেকে দূরে থাকা। যেমন : উপন্যাস, সিনেমা ও গান-বাজনা ইত্যাদি।

১০- একাকীত্ব ও সমাজ বিমুখতা পরিহার করা। কারণ তখন মানুষের ওপর শয়তানের প্রভাব বিস্তার সহজ হয়।

১১- শক্তি সঞ্চয়ের জন্য বৈধ শরীর চর্চার প্রতি যত্নবান হওয়া।

১২- গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান ও তাকে কর্মের মধ্যে ব্যস্ত রাখা।

১৩- সৎ সঙ্গ অবলম্বন করা। যা তাকে পুণ্য ও সংযমের কাজে সহায়তা করবে এবং পাপাচার ও সীমা লংঘনের কাজে বাধা দেবে।

১৪- ইবাদতের প্রতি যত্নবান হওয়া। যা মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের অনুভূতি জাগ্রত করে। যেমন : তাহাজ্জুদ নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াত।

১৫- আল্লাহ থেকে লজ্জার দিকটাকে বেশি শক্তিশালী করা। আল্লাহ তাআলা বান্দার দিকে তাকিয়ে আছেন। ফলে বান্দার কোন কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকতে পারে না।

১৬- আল্লাহর নিকট দোয়া করার ক্ষেত্রে কাকুতি-মিনতি করা ও সন্তানাদি তথা ছেলে- মেয়েদের সার্বিক হেফাজতের জন্য তার কাছে প্রার্থনা করা।

সুতরাং কিভাবে এই সমাধানগুলো বাস্তবায়ন করতে পারে তার পদ্ধতিসমূহ খুঁজে বের করা একজন দায়িত্বশীল অভিভাবদের কর্তব্য। আর তা হলো এমন তৎপরতা যা তরুণ- তরুণীদের মনের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা তৈরী করতে সক্ষম। যেহেতু তা জন্মগত স্বভাবের অনুকূল যার ওপর তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কারণেই এর প্রভাব যারা ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা পছন্দ করে তাদের প্রভাবের চেয়ে অনেক অনেক বেশি।

পক্ষান্তরে উল্লেখিত উপকরণের মাধ্যমেও যদি অভিভাবক এই সমস্যাটির সমাধান করতে না পারেন। তাহলে এক্ষেত্রে শিথিলতার পরিণাম তিন দিকে আবর্তিত হবে। সমাজ, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী। প্রত্যেকেই তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বহন করবে। সে কারণে এ প্রেক্ষিতে সফলতার কার্যকর রূপ তখনই প্রতিফলিত হবে, যখন এই মৌলিক উপাদানত্রয় একই দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করবে। এই তিনটি মৌলিক উপাদানের যে কোন একটির মধ্যে যদি কোন দুর্বলতা অথবা বিচ্ছিন্নতা সংঘটিত হয়, তাহলে অবশিষ্ট দুটি উপাদানকে আল্লাহর ইচ্ছায় জাহাজের পাল তুলে মুক্তি তীরে নিয়ে নোঙ্গর করতে হবে (যদি এক্ষেত্রে কোন দুর্বলতা থাকে)। কিন্তু বিপদ প্রকট আকার ধারণ করবে যখন দুটি উপাদানের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও দুর্বলতা সংঘটিত হয়ে যাবে। কারণ অচিরেই এটা তৃতীয় উপাদানকেও সংক্রমিত করে ফেলবে। আল্লাহ ভাল কাজের সহায়ক।

তৃতীয় অধ্যায় :

উপকরণ ও পদ্ধতিসমূহ

একটি তরুণ এই বয়োঃস্তরে পৌছেই আদিষ্ট হয়ে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের ওপর দৃঢ়তা অবলম্বনই হবে তার একমাত্র কাজ ও এটাই তার কাছ থেকে কাম্য। প্রথম পদক্ষেপেই সংঘটিত শিথীলতার জন্য তাকে জবাবদিহী করতে হবে। এর অর্থ হলো তার ওপর বাঞ্চনীয় কর্ম সম্পাদনে প্রচেষ্টা চালানো তার কর্তব্য। যেমন : ইল্ম, আমল ও আদব। সুতরাং তখন তরুণের প্রতিপালনের মহৎ কর্মটি তরুণ ও তার অভিভাবকের মধ্যে যৌথভাবে শিক্ষা দিতে হবে উপদেশ ও উদাহরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে। সৎ কাজের

আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার মাধ্যমে– যা কোরআনে কারীম বিরুদ্ধাচারীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য অসংখ্যবার প্রয়োগ করেছে। আল্লাহ তাআলা এই উদাহরণ প্রসঙ্গে বলেন,

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. (العنكبوت-43)

'এই সকল দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য দেই ; কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে।'[১৫৮]

যেমনিভাবে একটি তরুণের অনুসন্ধিৎসা ও রহস্য উদ্ঘাটনের আগ্রহ থেকে তার প্রতিপালন ও জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে উপকৃত হওয়া সম্ভব। চাই তা অভিজ্ঞতা, পঠন, অধ্যয়ন অথবা শিক্ষা সফর ইত্যাদি প্রয়োগ করেই হোক না কেন।[১৫৯] আল্লাহ তাআলা মিথ্যাবাদীদেরকে ভ্রমণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে তারা জানতে পারে তিনি কিভাবে সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ (العنكبوت-20)

'বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন ?'[১৬০]

এবং তিনি তাদের মৃত্যু সংবাদ দিলেন যারা তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি থেকেও কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ (غافر-21)

'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহলে দেখতে পেতো তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিলো।'[১৬১]

জ্ঞান অন্বেষনের জন্য ভ্রমণ আলেম-উলামাদের নিকট প্রসিদ্ধ। তাদের লেখনীতে এ বিষয়ের ওপর 'অধ্যায় : জ্ঞান অন্বেষণে ভ্রমণ' নামে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই ভ্রমণকাহিণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মুসা আ. এর শিক্ষা সফর। যখন তিনি খিযির আ.-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করলেন। তার সাক্ষাতের আবেদন করলেন, যাতে তার নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারেন। কারণ মুসা আ. জানতে পেরেছেন, তার নিকট এমন জ্ঞান রয়েছে যা তিনি জানেন না।

---

[১৫৮] . সুরা আন-কাবুত : ৪৩

২. আ. ড. আঃ আজিজ বিন মুগম্মদ নুগাইমিশী কৃত আল-মুরাহিক্কুন দেরাসাহ নাফিসাহ ইসলামিয়াহ, পৃষ্ঠা: ১১৭-১২৪ দ্রষ্টব্য।

[১] .আল-আনকাবুত-২০

[২] .গাফের-২১

চতুর্থ অধ্যায় :

পুরস্কার ও শাস্তি

পুরস্কার

তরুণ যদিও সে এখন পুরুষের স্তরে উপনীত হয়েছে তথাপি পুরস্কারের প্রয়োজনীয়তা থেকে সে উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। কোরআনে কারীমের অসংখ্য আয়াত রয়েছে যেখানে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও মহিলার নেক আমলের বিনিময় পুরস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সুতরাং তরুণ ও তরুণীদের ব্যাপারে এটাকে গুরুত্বহীন ভাবা কোন অবস্থাতেই ঠিক হবে না। বিশেষ করে কষ্টসাধ্য কর্ম সম্পাদনে এবং যে কাজের জন্য বিরাট সাহসিকতার প্রয়োজন হয়। খন্দক যুদ্ধের ঘটনা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম সৈন্যদের মধ্য হতে এমন কাউকে চাচ্ছিলেন, যে শত্রু সৈন্যদের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে তাদের তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে পারবে। সে জন্য তিনি এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে হুজায়ফাহ রা. হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আহযাব যুদ্ধের রজনী, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে দেখতে পেলেন। (প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া) তীব্র ও শীতল বায়ু আমাদেরকে স্পর্শ করে গেলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বললেন- 'এমন কেউ আছো কি? যে শত্রুবাহিনীর খবরাখবর এনে আমাকে দিতে সক্ষম, তাহলে আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন তাকে আমার সঙ্গী করে উঠাবেন। তখন আমরা সকলে চুপ হয়ে গেলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কোন উত্তর দিলো না। অতঃপর (দ্বিতীয় বার) তিনি সাল্লাল্লাহু আমাদেরকে বললেন- 'এমন কেউ কি নেই? যে শত্রুবাহিনীর খবরাখবর এনে আমাকে দিতে পারবে তাহলে আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন তাকে আমার সঙ্গী করে উঠাবেন। তখন আমরা সকলে চুপ হয়ে গেলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কোন উত্তর দিলো না। অতঃপর (তৃতীয় বার) তিনি আমাদেরকে বললেন- 'এমন কেউ কি নেই? যে আমাকে শত্রুবাহিনীর খবরাখবর এনে দিতে পারবে তাহলে আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন তাকে আমার সঙ্গী করে উঠাবেন। তখন আমরা সকলে চুপ হয়ে গেলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কোন উত্তর দিলো না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বললেন- 'হুজাইফা, তুমি দাঁড়াও, যাও তুমি গিয়ে শত্রুবাহিনীর খবরাখবর নিয়ে এসো।' আমার নাম ধরে আহ্বান করার পর আমি কোন উপায়ান্তর না দেখে অগত্যা দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি বললেন- 'যাও শত্রুবাহিনীর খবর নিয়ে এসো! তাদেরকে তোমার পরিচয় বুঝতে দিও না।'[১৬২] সেই রাতে প্রচণ্ড ও তীব্র শীতল ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছিলো। সে কারণে উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য দুর্দান্ত সাহসিকতা ও শক্তির প্রয়োজন ছিলো। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুঃসাহসিক কর্ম সম্পাদনের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে ছিলেন। কাজেই যে তার ইচ্ছা পূরণ করবে তার সম্পর্কে তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গী করবেন।' তিনি কাউকে শুরুতেই এ ব্যাপারে নির্দেশ করেননি। কল্যাণকর কাজে সাহাবীদের আগ্রহ ও তা বাস্তবায়নে তাদের চূড়ান্ত প্রয়াস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে এই মহান মর্যাদার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করা পর্যন্ত কেউ দাঁড়ায়নি। যা সেই দিনের তীব্র শীত ও প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার দরুণ সৃষ্ট দুর্বিসহ পরিস্থিতিতে দুঃসাহসিক দায়িত্ব পালনের দিকেই ইঙ্গিত করে। সে কারণে রাসূলুল্লাহ

[১৬২].মুসলিম-৩৩৪৩

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রয়োজন হয়েছে, তিনি নিজেই সেনাপ্রধান হিসেবে নির্দেশ করেন। সকল দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি উপেক্ষা করে যার আনুগত্য অপরিহার্য কর্তব্য। তিনি এই দুঃসাহসিক কাজের দায়িত্ব হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. কে অর্পণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ ভূমিকা অহুদের যুদ্ধেও নিয়েছিলেন যখন তাঁকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কতিপয় সাহাবীকে মুশরিকরা অবরোধ করে ফেলেছিলো। আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহুদের দিন সাত জন আনসারী ও দুই কোরাইশকে নিয়ে একাকী হয়ে পড়লেন। অতঃপর তারা যখন সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হলো, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'কে আছে যে আমাদের পক্ষ হয়ে শত্রুদের প্রতিহত করবে, ফলে বিনিময়ে তার জন্য রয়েছে জান্নাত অথবা সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।''[১৬৩] এমনিভাবে অভিভাবকের কর্তব্য হলো প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা। আর যে কাজটি আল্লাহ তাআলা আবশ্যক করেছেন তার প্রতিদান তো সেটাই যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাআলা তার সংযমী বান্দাদের সঙ্গে করেছেন ।

শাস্তি

তরুণের এই বয়োঃস্তরে পৌঁছার সাথে সাথে সকল বিরুদ্ধাচরণ ও পাপাচার লিপিবদ্ধ হতে থাকে। আল্লাহ তাআলা পরকালে এর জন্য তাকে পাকড়াও করবেন যদি মৃত্যুর পূর্বে তা হতে তওবা না হয়ে থাকে অথবা পাপ মোচনকারী কোন নেক আমল তার না থাকে। কোন কোন পাপাচার তো পৃথিবীতে দণ্ডবিধি কার্যকর করণকে অবধারিত করে। এ শাস্তি প্রয়োগের জন্য কেবল অভিভাবকই যথেষ্ট নয়। অতএব এই বয়োঃস্তরে অভিভাবকের উক্ত অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া প্রতিপালনের কোন উপকরণ নয়। বরং তখন প্রতিপালন হবে দণ্ডবিধি কার্যকর করণের মাধ্যমে। কিন্তু অসংখ্য বিরুদ্ধাচরণ রয়েছে যার ইয়ত্তা নেই। এই সকল অপরাধের ক্ষেত্রে অভিভাবকের কর্তব্য হলো, অভিভবক যখন জানতে পারবে তখন তা হতে তাকে বারণ করবে যদিও তা শাস্তির মাধ্যমেই হোক না কেন। উল্লেখ্য যে, শাস্তির উদ্দেশ্য এখানে অবশ্যই প্রহার নয়। বরং কখনো তা হতে পারে ধমক দিয়ে, কখনো ক্রোধ প্রকাশ ও ভীতি প্রদর্শন করে, কখনো ত্যাগ করে অথবা এক দুই দিনের জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করে। খেয়াল রাখতে হবে, বয়কট করাটা তার অবাধ্যতা বাড়িয়ে না দেয়। বিদাআ'তী ও পাপাচারীদের বয়কট করার বিধানাবলি সংক্রান্ত জ্ঞানের একটা বিশাল অধ্যায় রয়েছে। অবহেলা না করে প্রয়োজন হলে অভিভাবক তা প্রয়োগ করতে পারেন ।

আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'মহিলাগণ মসজিদে আসার জন্য অনুমতি চাইলে তোমরা তাদেরকে বারণ করো না!' (হাদীস বর্ণনাকারী) বলেন, 'এ কথা শুনে তার ছেলে বিলাল বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমরা অবশ্যই তাদেরকে বাধা দেব।' (হাদীস বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর তার পিতা ইবনে উমার তার দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে খুব করে বকা দিলেন। অনুরূপ আর কাউকে কখনো তাকে বকা দিতে দেখিনি। ইবনে উমার রা. তাকে বললেন-'আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস বর্ণনা করছি। অথচ তুমি বলছো : 'আমরা অবশ্যই তাদেরকে বাধা দেব।''[১৬৪]

---

[১৬৩] .মুসলিম-৩৩৪৪

[১৬৪] . মুসলিম : ৬৬৭

লক্ষ করুন! সন্তান যখন সুন্নাতের সাথে সাংঘর্ষিক মত প্রকাশ করলো, তাকে সে জন্য শাস্তি দিলেন ও তার থেকে এটা শ্রবণ করার পর তাকে ছেড়ে দেননি। অপরাধ ও ক্রটি বড় হওয়ার দরুণ তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন।

অনেক অভিভাবক আছেন যারা তরুণ-তরুণীদেরকে শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে এমন আচরণ করে থাকেন যা আদৌ ঠিক নয়। সে কারণে তাদের এ ক্ষেত্রে যে সকল ভুল-ক্রটি সংঘটিত হয়ে থাকে তার মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

শাস্তি-শাস্তি প্রদানে ক্রটিসমূহ

বহিস্কার করণ

কোন কোন কাজ থেকে অভিভাবক যখন তাকে বারণ করতে সক্ষম হবে না অথবা তার তরুণ সন্তানটি তার দিকনির্দেশনায় সাড়া দেবে না। সে কারণে তার ভরণ-পোষণ স্থগিত করে দেবেন অথবা তার ঘরে প্রবেশ করাতে নিষেধাজ্ঞা জারী করবেন। কিন্তু কখনো এটা সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এটা বরং তখন সমস্যার প্রকট আকার ধারণ ও বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরপর শাস্তির আশঙ্কায় অবশ্য এতে তরুণটি অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। আবার এর যে কোন সমাধান নিজের থেকে খুঁজতে আরম্ভ করে দিতে পারে। অবশ্য তখন সর্বাপেক্ষা দ্রুত ও সহজ সমাধান হতে পারে বিপথে ভ্রমণের সূচনা। পরিচিত ভ্রমণটি হতে পারে তাদের পথে যাদেরকে বলা হয় মন্দ বন্ধুমহল। ফলতঃ তারাই হবে এ পথের মূল শিকার, যেখানে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়বে। চূড়ান্ত পর্যায় বাবা তাকে ফিরিয়ে আনার কিংবা নিয়ন্ত্রণ করার আর কোন উপায়ই খুঁজে পাবে না। কিন্তু এরপর কি হবে ?

সন্তানকে অভিশাপ বা বদ-দোয়া করা

মা-বাবা কর্তৃক সন্তানের জন্য সামগ্রিক কল্যাণের দোয়া করা যা নবী রাসূলগণের আমলে ঈমানদারদের সুন্নত ছিলো। দেখুন ইবরাহীম আ. যিনি বলতেন-

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي.(إبراهيم-40)

'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও।'[১৬৫]

যাকারিয়া আ. বলতেন-

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً. (آل عمران-38)

'আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে সৎ বংশধর দান কর।'[১৬৬]

একজন ঈমানদারের প্রার্থনা -

وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. (الأحقاف-15)

'আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে সৎকর্মপরায়ণ কর।'[১৬৭]

[১৬৫] . সূরা ইবরাহীম, আয়াত - ৪০
[১৬৬] সূরা আলে ইমরান, আয়াত - ৩৮
[১৬৭] সূরা আহকাফ, আয়াত ১৫

ঈমানদারগণের প্রার্থনা-

هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. (الفرقان-74)

'আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর।'[১৬৮]

সন্তানের সৌভাগ্যের অন্যতম সোপান মা-বাবার দোয়া। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী- 'তিনটি দোয়া আল্লাহর নিকট নিশ্চিত কবুল যোগ্য।' সেখানে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তানের জন্য বাবার দোয়াকেও উল্লেখ করেছেন।[১৬৯] কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অনেক মানুষ এই দোয়াকে সন্তানের উপকারের জন্য ব্যবহার করার পরিবর্তে তারা বিষয়টাকে সম্পূর্ণরূপে উল্টিয়ে দিতে অভ্যস্ত। যখন তারা ওদের ওপর ক্রোধান্বিত হয় অথবা সন্তানরা এমন কাণ্ড ঘটিয়ে বসে যা তাদের অসন্তুষ্টির কারণ হয়, তখন তারা ওদেরকে অভিশাপ দেয়, বদ-দোয়া করে থাকে। বলে থাকে - 'আল্লাহ, ওকে ধ্বংস করে ফেল, ওকে শাস্তি দাও অথবা ওর ওপর অভিসম্পাত কর! কেন মৃত্যু তোকে চোখে দেখে না। কত মানুষকে আল্লাহ নিয়ে নেয়, তোকে নিতে পারে না?' এগুলো বলার স্থলে তারা বলতে পারেন : হে আল্লাহ, ওকে হেদায়েত দাও, ওকে সংশোধন করে দাও, ওকে পরিপাটি করে দাও এবং ওর তাওবা কবুল কর ইত্যাদি। কারণ এটা হলো উত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। এর মধ্যে কারো জন্য কোন ক্ষতি নেই, বরং এতে সন্তান ও বাবা উভয়ের জন্য কেবল কল্যাণ আর কল্যাণই নিহিত রয়েছে। এমন দোয়া করা উচিত নয়, যদি তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়, তাহলে মা-বাবা দুঃখ ও অনুতাপে তার হাতের আঙ্গুল কাটবে। ফলে সে হবে নিতান্ত লজ্জিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তানদেরকে অভিশাপ দিতে নিষেধ করেছেন। কারণ এর মধ্যে এমন বিপদ নিহিত যেখানে কোন ধরনের উপকারিতা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- 'তোমরা তোমাদের নিজেদের, তোমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সম্পদের ওপর অভিশম্পাত কর না। তোমরা ঐ সময়ের ব্যাপারে আল্লাহর সঙ্গে ঐক্যমত্যে যেওনা যখন আল্লাহর নিকট কোন দান প্রার্থনা করলে তিনি তা তোমাদের জন্য কবুল করে থাকেন।'[১৭০]

জরিমানা অথবা ছোট ভাই-বোনদের সামনে তাকে লজ্জিত করা

তরুণ-তরুণীদের এ বয়সে আত্মমর্যাদাবোধ প্রবলভাবে উজ্জীবিত হয়ে থাকে। এই পথ অথবা পদ্ধতি তাদের উভয়কেই ভীষণভাবে আঘাত করে। যার ফলে অনেক সময় অভিভাবকদের সাথে তাদের শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। উপরন্তু এই পদ্ধতির বারংবার প্রয়োগ তাকে অবাধ্যতা ও তার কর্মকাণ্ডের বিশুদ্ধতার স্বপক্ষে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন ও অভিভাবকের ভুলত্রুটিগুলো খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হতে উদ্যত করবে। অথচ অন্য দিকে অভিভাবকগণ কেবলমাত্র এতটুকু করেই ক্ষ্যন্ত থাকেন না। বরং তাদেরকে অপরিচিত ব্যক্তি অথবা সহপাঠি ও বন্ধুদের মত নিকটতম লোকদের সম্মুখে লজ্জা দেন ও তিরস্কার করে থাকেন। অথচ এর অবশ্যম্ভাবী অশুভ পরিণতি সম্পর্কে তার কোনই ভ্রুক্ষেপ নেই।

অবমূল্যায়ন ও তুচ্ছ জ্ঞান করা

ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় প্রকারের ভুল-ক্রটি থেকে কেউই মুক্ত নয়। কোন কোন অভিভাবক রয়েছেন যারা চান যে, তার সন্তান হবে একেবারে নিষ্কলুষ ও নিষ্পাপ। ফলে কোন পদস্খলনকেই তারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে পারেন না। বরং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও কঠিন হিসাব নিয়ে থাকেন। এ কারণে

---

[১৬৮] সুরা ফোরক্বান : ৭৪

[১৬৯] তিরমিজী- কিতাবুদ দাওয়াত। আবু দাউদ- কিতাবুস সালাত। ইবনে মাজা - কিতাবুদ দাওয়াত

[১৭০]. মুসলিম : ৫৩২৮

অনেক সময় তরুণ সন্তানটি অভিভাবককে তুচ্ছজ্ঞান ও অবমূল্যায়ন করতে পারে। যার বহিঃপ্রকাশ কয়েকভাবে ঘটতে পারে। যেমন : কথাবার্তা অথবা কোন সময় কর্মের মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ। যথা, ছোটদেরকে তার ওপর প্রাধান্য দেয়া, তার উর্ধ্বতনের স্থানে তাকে স্থাপন করা, বড়কে উপেক্ষা ও তার দিকে কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ না করে ছোটদের সঙ্গে পরামর্শ করা ও তার মত অনুযায়ী কর্ম প্রস্তুতি গ্রহণ করা যেন সে অনুপস্থিত প্রভৃতি।

কোন অপরাধ বা বিরোধিতাকে হালকা করে দেখা

একদিকে যেমন এমন অভিভাবক রয়েছেন যারা সামান্য অপরাধে কঠিন শাস্তি দিয়ে থাকেন। অপর দিকে বড় বড় অপরাধের ক্ষেত্রেও শাস্তি দানকে তুচ্ছ জ্ঞান করে থাকেন এমন অভিভাবকের সংখ্যাও একেবারে কম নয় অথচ উভয় কাজই নিন্দনীয়। তরুণ- তরুণীদের থেকে কোন ত্রুটি সংঘটিত হয়ে গেলে তা হালকা করে দেখা অথবা এক্ষেত্রে এমন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করা যে, 'এ বয়সে এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার' উচিত নয়। যদি সে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে ওখান থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধানরত অবস্থায় তাওবা করে ফিরে আসে তবুও। কারণ, এ অবস্থায় তাকে যদি কোন ভর্ৎসনা তিরস্কার ও লজ্জা দেয়া না হয় 'সে অপরাধ স্বীকার করে তাওবা করে ফিরে এসেছে' শুধুমাত্র এ কারণে, তাহলে সে বিষয়টিকে হাল্কা মনে করে তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। ঐ লোকটির দিকে লক্ষ করুন, যে, পবিত্র রমজান মাসে স্ত্রী সম্ভোগ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ফতওয়া জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহধর্মিনী উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন- 'পবিত্র রমাদান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাতে এক লোক মসজিদে নববীতে এসে বলে- 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি দগ্ধ হয়ে গেছি, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রশ্ন করলেন- 'তোমার কি হয়েছে ?' উত্তরে সে বললো- 'আমি স্ত্রীর সাথে মিলন করে ফেলেছি।' তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'সদকা কর।' এরপর সে বললো- 'হে আল্লাহর নবী, আমার তো কোন সম্পদই নেই। সুতরাং আমি সদকা করতে সক্ষম নই।' তিনি বললেন- 'তুমি বসো!' তখন লোকটি বসে রইল। ইতিমধ্যে খাদ্য সামগ্রী বোঝাই গাধা হাঁকিয়ে এক ব্যক্তি আগমন করলো। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'একটু আগে যে দগ্ধলোকটি এসেছিল সে কোথায়?' তখন লোকটি দাঁড়িয়ে গেলে পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'যাও এটা নিয়ে সদকা করা গিয়ে।' অতঃপর সে বললো, 'আমাদের ছাড়া অন্য কাউকে?' আল্লাহর শপথ! আমরা ক্ষুধার্ত ও কপর্দকশূন্য।' এরপর তিনি বললেন- 'তাহলে তোমরাই তা আহার করো!'[১৭১] ভদ্রলোক তার অপরাধ স্বীকার ও তাওবা করে সমাধান জানার জন্য এসেছে। এর প্রমাণ তার কথা 'আমি দগ্ধ হয়ে গেছি, আমি পুড়ে গেছি' যার অর্থ তার কৃত অপরাধ বোধ ও তার অবগতি। যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার তাওবার দিকে তাকিয়ে তাকে কোন শাস্তি দেননি। আর তা ছাড়া তার কর্মটি দণ্ডবিধির আওতায় পড়ে এমন অপরাধও নয়। এতদসত্ত্বেও তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অপরাধটিকে খাটো করে না দেখে বললেন- 'একটু আগে যে দগ্ধ লোকটি এসছিলো সে কোথায়?' যা থেকে প্রতিভাত হয় যে, তার সে অপরাধকে তুচ্ছ জ্ঞান করা যাবে না। অনন্তর পাপের বৈশিষ্ট্য হলো তা আগুনের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় যা মানুষকে ভস্মীভূত করে দেয়।

এই হলো পদ্ধতি, তরুণ-তরুণীদের এ জাতীয় দণ্ডবিধিমুক্ত অপরাধে নিমজ্জিত হওয়ার পর যা অভিভাবকের প্রয়োগ করা একান্ত কর্তব্য। ইমাম বুখারী রহ. এ বিষয়ের ওপর একটি অধ্যায় রচনা

---

[১৭১] বুখারী : ৬৩২২ , মুসলিম : ১৮৭৪

করেছেন। 'পর্ব : যে ব্যক্তি দণ্ডবিধির আওতাধীন নয় এমন কোন অপরাধ করলো, অতঃপর তা রাষ্ট্রপ্রধান বা বিচারপতিকে অবহিত করা হলো। যদি অপরাধী তাওবা বা আত্মসমর্পণ করে সমাধান জানার জন্য আসে তাহলে তার ওপর শাস্তি প্রযোজ্য হবে না।[১৭২]

তরুণ ও তরুণীদের থেকে অপরাধ সংঘটিত হলে তা তুচ্ছ করে না দেখার অর্থ এ নয় যে, অভিভাবক তাকে অব্যাহতভাবে লজ্জা দিতেই থাকবে। যখন সে আলোচনা করবে, কোন কথা অথবা কোন কাজ করবে তখনই তাকে বলা হবে : তুমি হলে এই, এই। কারণ, এই পদ্ধতি সংশোধন নয় তাকে কেবল ধ্বংস করতে পারবে। সুনানে আবু দাউদের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : التعيير। হলো বর্তমানকালে কারো পূর্ব সংঘটিত অপরাধের জন্য তিরস্কার ও দোষারোপ করা, চাই তার তাওবা জ্ঞাত হোক বা অজ্ঞাত। তবে অন্যায়ে লিপ্ত হওয়ার সময় বা তার পরক্ষণে লজ্জা দেয়ার যার সামর্থ আছে তার ওপর এটা কর্তব্য। আবার কখনো বা দণ্ডবিধি অথবা শাস্তি বিধান করা অবশ্যক হয়ে যায়। এসবই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের পর্যায়ভুক্ত।[১৭৩]

দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করা ও অজুহাত পেশ অগ্রাহ্য কিংবা অবিশ্বাস করার ফলে কখনো কখনো তরুণ-তরুণীদের থেকে এমন অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে যা কেউ দেখেনি অথবা কেউ টের পায়নি। সে কারণে অভিভাবক অনুসন্ধান ও ছিদ্রান্বেষণ করতে থাকে তার কোন অপরাধ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে এ আশংকায়। অতঃপর সেটা নিয়ে তার মুখোমুখি হয়। অথচ কেবলমাত্র কিছু অলীক কল্পনা ও নিছক আশঙ্কা ছাড়া তার কাছে কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই। এতে সম্পর্ক ছিন্ন করা, সন্দেহের বীজ বপণ ও আস্থা হীনতা ব্যতীত অন্য কোন উপকারিতা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- 'রাষ্ট্রপ্রধান যদি প্রজা সাধারণের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেন, তাহলে তিনি যেন তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন।[১৭৪] কখনো কখনো তরুণ-তরুণীদের থেকে এমন কিছু কর্মও সংঘটিত হয়ে থাকে যাকে ভুল হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় যদি এ ব্যপারে সে কোন ওজর পেশ করে তবুও। বাস্ত বেও যদি সেটা যুক্তিসঙ্গত অপারগতার উপযুক্ত হয় তবুও অভিভাবকের এই কথা বলে তাকে দিকনির্দেশনা উচিত হবে না - তুমি মিথ্যাবাদী ইত্যাদি। এমনকি এ মর্মে একাধিক আলামত তার নিকট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঐ বাহানা প্রকাশ তার জন্য বিশুদ্ধ নয়। কারণ এভাবে পরিত্রাণের প্রচেষ্টাই প্রমাণ করে যে, তার কর্মকাণ্ডের মন্দানুভূতি তার হয়েছে। কেবল এই অনুভূতিই তাকে সে কর্ম থেকে দূরে রাখতে সক্ষম। 'সে বলেছে অথবা করেছে' অভিভাবক কর্তৃক এ মর্মে চাপ প্রয়োগ অভিভাবকের অন্তরের রুক্ষতা ও কাঠিন্য প্রমাণ ভিন্ন অন্য কোন ফল দেবে না। কারণ, সে যতক্ষণ বিশ্বাস করবে যে, তার এ কর্ম সম্পর্কে কেউ অবহিত নয়, তা গোপন রাখতে ও কারো নিকট প্রকাশ না করতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এটাই তার কল্যাণের দিকে ধাবিত হওয়ার সঠিক পথ। পক্ষান্তরে যখন জানতে পারবে যে, জনসাধারণ তার ঐ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জেনে গেছে তখন এ ধারণাটাই তাকে উক্ত অপরাধ লুক্কায়িত না রাখতে ও জন সম্মুখে তা প্রকাশ করে দিতে উস্কানি দেবে। সাধারণত এটা অকল্যাণ ও মন্দের পথ। এ

[১৭২] বুখারী, কিতাবুল হুদুদ

[১৭৩].আউনুল মা'বুদ-১১/৯৪-৯৫

[১৭৪] .আল-মু'জামুল আওসাত্ব-লিত্তিবরানী : ৮/৫৯

প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- 'আমার প্রত্যেক উম্মতকে ক্ষমা করা হবে তবে যারা নিজেদের অপরাধ প্রকাশ করে দেয় তাদের নয়।'[১৭৫]

এ প্রেক্ষিতে অভিভাবককে অতি সূক্ষ্ম পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করতে হবে যা তরুণ তরুণীদের মধ্যে 'অভিভাবকের নিকট তাদের কোন কৌশল প্রকাশিত হয়নি' এ উপলব্ধি জন্ম দিতে সক্ষম হবে। যদিও তিনি ঐ মুহূর্তে তাদেরকে কোন দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন না। অভিভাবকের বিচক্ষণতা সম্পর্কে তার অবগতির কারণে এ পদ্ধতি উক্ত অপরাধের মূলোৎপাটন ও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করতে ও দ্বিতীয় বার ঐ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটাতে সহায়ক হবে ।

পক্ষান্তরে তরুণের অজুহাত যদি একেবারে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ কখনো কৌশলটি তার নিকট প্রকাশিত হয়ে গেছে মর্মে ইঙ্গিত করে থাকে তাহলে তা তাকে আরো ঔদ্ধত্যপনা ও অপরাধ করতে উস্কানি দিয়ে থাকবে। আবার কখনো কখনো অস্বীকৃতি ও মিথ্যা প্রতিপন্নতার দ্বারা তাদেরকে সম্মোধন করলে বিষয়টা দুঃখজনক পরিস্থিতির অথবা মিথ্যা শপথের দিকে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। অবশ্য এরূপ ঘটনা খুব স্বল্প সংখ্যক লোকের বেলায় ঘটে থাকে। এমনটি হতেই পারে।

আমরা সেই ঘটনার দিকে লক্ষ করলে দেখতে পাবো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে তার সমাধান দিয়েছেন। যায়েদ বিন আসলাম রা. থেকে বর্ণিত, খাওয়াত বিন যুবাইর রা. বলেন, 'আমরা মার্‌রায-যাহরান[১৭৬] নামক স্থানে অবতরণ করি। (হাদীস বর্ণনাকারী) বলেন, 'আমি আমার তাবু থেকে বের হলাম। দেখলাম কয়েকজন মহিলাকে পরস্পর কথাবার্তা বলছে। আমার ভাল লাগল। অতঃপর আমি আমার সফরের ব্যাগটা বের করি। এরপর সেখান থেকে একজোড়া কাপড় বের করে পরিধান করি। অতঃপর আমি গিয়ে তাদের সঙ্গে বসে পড়ি। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তাবু থেকে বের হয়ে এসে বলেন, 'হে আব্দুল্লাহর বাপ, তুমি মহিলাদের আসরে বসলে কি কারণে? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে তাঁর ব্যক্তিত্বে অভিভূত ও কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে গেছি। আমি বললাম- 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার একটি উট ছুটে গেছে, আমি তাকে বাঁধতে চাই। অতঃপর তিনি সামনে চললেন। আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। এক পর্যায়ে তিনি আমার নিকট তার চাদর নিক্ষেপ করলেন ও বৃক্ষরাজির আড়ালে চলে গেলেন। আমি বৃক্ষের শষ্য শ্যামলিমার মধ্যে যেন তাঁর মেরুদণ্ডের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করছিলাম। অতঃপর তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পন্ন করলেন ও অজু করে সামনে আসলেন। তখনো অজুর পানি তার দাড়িগুচ্ছ থেকে গড়িয়ে বক্ষদেশ স্পর্শ করছিলো। অতঃপর তিনি বললেন- 'হে আব্দুল্লাহর পিতা, তোমার ছুটে যাওয়া উট সম্পর্কে কী করলে?' অতঃপর আমরা পথ চলা শুরু করলাম, এরপর পথিমধ্যে কেবল বলতেন 'হে আব্দুল্লাহর পিতা, তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, সেই পলাতক উটটির কি হলো?' যখন 'আমি ধরা খেয়েছি' অনুভব করলাম তখন দ্রুত মদীনায় ফিরে গেলাম। মসজিদ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মজলিস থেকে দূরে থাকলাম। যখন এ অবস্থা দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকল, এক সময় আমি মসজিদে না যাওয়ায় নিজের মধ্যে শূন্যতা অনুভব করলাম। এরপর আমি মসজিদে গিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর একটি কক্ষ থেকে হঠাৎ বের হয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে দুই রাকাআত সালাত আদায় করে নিলেন। তবে আমি সালাত দীর্ঘ করি এই আশায় যে, তিনি আমাকে ছেড়ে চলে যান। কিন্তু তিনি বললেন- 'আব্দুল্লাহর বাপ, তোমার যতক্ষণ মন চায় সালাত দীর্ঘ কর। তবে আমি তোমার সালাত শেষ না করা পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছি না। তখন আমি মনে মনে সংকল্প করলাম- 'অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

[১৭৫]. বুখারী : ৫৬০ , মুসলিম : ৫৩০৬

[১৭৬] مَرّالظهران হেযাজের একটি উপত্যকার নাম। যা খনন করেছিলেন যমুহ বাহরাহ্ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গিয়ে আমার ভুল স্বীকার করব ও আমার ব্যাপারে তাঁর পবিত্র অন্তরকে সংশয়মুক্ত করবই। এরপর যখন তিনি বললেন- 'হে আব্দুল্লাহর বাপ, তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমার সেই ছুটে যাওয়া উঁটটি সম্পর্কে কী করলে? অতঃপর আমি বললাম- 'সেই সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যের আহ্বান নিয়ে প্রেরণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে ঐ উটটি আর কখনো হারিয়ে যায়নি। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি রহম করুন।' কথাটি তিনবার বলেছেন। এরপর কখনো তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পেছনের কোন বিষয় পুনরাবৃত্তি করেননি।[১৭৭] এখানে বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তার অজুহাত পেশ শুদ্ধ নয়। তা সত্ত্বেও তিনি তাকে তাৎক্ষণিকভাবে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাননি। কিন্তু যখনই তার সঙ্গে সাক্ষাত হতো প্রশ্নের পুনরাবৃত্তির করার মাধ্যমে ঐ কর্মটি উল্লেখ করতেন। ফলে অনন্যোপায় হয়ে কৃতকর্ম স্বীকার করতে বাধ্য হতো। যখন তার পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় হয়ে যাবে তখন তাকে ডাকবে ও দ্বিতীয় বার সেই প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করবে না। কারণ স্বীকারোক্তির পর লজ্জা দেয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শের পরিপন্থী।

পঞ্চম অধ্যায় :

দিকনির্দেশনা ও উপদেশাবলি

(পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত দিকনির্দেশনা ও উপদেশবালির সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয়সহ একটি সংযোজন।)

তরুণের অন্তরের সংরক্ষণ

তরুণের বিভিন্ন দিকের পরিপূর্ণতা অর্জনের সাথে সাথে পরিবার, মসজিদ ও বিদ্যালয়ের মত পরিচিত গণ্ডির বাহির থেকেও জ্ঞান আহরণ ও গ্রহণ করার সামর্থ্য অর্জিত হয়ে থাকে। অতএব দুষ্ট লোকের দুষ্টামী যেন কল্যাণকামী লোকের কল্যাণের ওপর কার্যত দ্রুতগামী হতে না পারে। সমগ্র দেহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো হৃদপিণ্ড। হৃদপিণ্ড সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হৃদপিণ্ড সুস্থ থাকলে গোটা দেহই সুস্থ থাকবে। পক্ষান্তরে তা অসুস্থ্য হয়ে পড়লে গোটা শরীরটাই অসুস্থ হয়ে পড়বে।'[১৭৮] সুতরাং এই হৃদপিণ্ডের সযত্ন পরিচর্যার জন্য যার মাধ্যমে হৃদপিণ্ড সুস্থ থাকতে পারবে ঐ বিষয়গুলোর দিকে দিকনির্দেশনা দিতে হবে। তার মধ্যে অন্যতম হলো : কিয়ামুল লাইলের প্রতি অনুপ্রাণিত করা। সাহাবায়ে কেরামের প্রাথমিক প্রজন্মগুলো কিয়ামুল লাইলের ওপর প্রশিক্ষিত ও প্রতিপালিত হয়েছিলেন- যাদের সৌজন্যে সেকালে ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আল্লাহ তাআলা কিয়ামুল লাইল সম্পর্কে ইরশাদ করেন-

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. (المزمل-6)

'নিশ্চয় এবাদতের জন্য রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল।'[১৭৯]

---

[১৭৭] . আল-মু'জামুল কাবীর-লিত-তাবারানী : ৪/২০৩

[১৭৮] বুখারী-৫০ , মুসলিম-২৯৬৯

[১৭৯] সুরা মুয্যাম্মিল : ৬

ইবনে কাছির রহ. বলেন, 'উদ্দেশ্য হলো কিয়ামূল লাইল রসনা ও হৃদপিন্ডের মাঝে সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপনকারী এবং কোরআন তেলাওয়াতে একাগ্রতা সৃষ্টিকারী। সেকারণে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا' অর্থাৎ তা কিয়ামুন্নাহারে কোরআন তেলাওয়াত ও তা অনুধাবন করার চেয়ে অন্তরে বেশি একাগ্রতা সৃষ্টিকারী। কারণ দিবস হলো মানুষের কাজের জন্য বেরিয়ে পড়া শব্দদুষণ ও জীবিকা নির্বাহের সময়।'[১৮০] কতই না উত্তম সেই অভিভাবক যে নিজে কিয়ামুল লাইল আদায় করে ও তার তরুণ ছেলে মেয়েদেরকেও নামাজের জন্য জাগ্রত করে তাদেরকে নিয়ে যতটুকু সম্ভব এক সঙ্গে জামাত সহকারে সালাত আদায় করার চেষ্টা করে থাকেন। তাদের নিদ্রা ভঙ্গের জন্য যৎ কিঞ্চিত পানি ছিটানোর সহায়তা নেয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে ইঙ্গিতও রয়েছে। যেভাবে তরুণ- তরুণীদের সামনে পরকালের তথা জান্নাতের আলোচনারও পুনরাবৃত্তি করতে পারে। জান্নাতে প্রবেশ করার করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন। এমনিভাবে জাহান্নামের বিবরণ দিবেন। তাদের সামনে নবী ও রাসূলদের ইতিহাস, জীবনী ও আল্লাহর পথে তারা যে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ও অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করেছেন। কিভাবে তারা এ সংকটময় পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করেছেন। নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য কি কি সাহায্য এসেছে তা পর্যালোচনা করতে পারেন।

কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঁকড়ে ধরা

পবিত্র কোরআন ও হাদীসে রাসূলের বিশুদ্ধতা এবং এতদুভয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী সকল কিছুর অসারতা মুসলিম উম্মাহর নিকট একটি জাজ্জ্বল্যমান ও দিবালোকের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত সত্য। অধিকাংশ মুসলমান এমনকি তাদের শিশুরা পর্যন্ত বিষয়টা সংক্ষিপ্তভাবে অনুধাবন করে থাকে। কিন্তু অনৈসলামী সমাজগুলো থেকে অসংখ্য দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষণা আমাদের সমাজের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। যার কোনোটা লেখনী আবার কোনোটা প্রচারমাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। কোনোটা আবার কোন কোন মুসলিম দেশের শিক্ষাকারিকুলামকেও দংশন করতে সক্ষম হয়েছে। এ দৃশ্যপটে একজন অভিভাবকের কর্তব্য হলো, ঐ দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষণাগুলো সম্পর্কে সতর্ক হওয়া যা তার চতুর্পাশের পরিবেশের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সেগুলোর কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী হওয়ার বিবরণ দেয়া প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে এ বিষয়ের ওপর রচিত ছোট ছোট পুস্তিকার সহায়তা নেয়া যেতে পারে। যার মধ্যে অত্যন্ত সহজ সাবলীলভাবে উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও তরুণকে পরিতুষ্ট করা

এই বয়সে তরুণ-তরুণীদের বুদ্ধিমত্তা শরিয়তের বিধানাবলির ক্ষেত্রে সে নির্দেশপ্রাপ্ত হওয়ার প্রমাণে পরিপূর্ণতা অর্জন করে থাকে। এই অবস্থায় অভিভাবকের গবেষণাসমূহ, দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিকল্পনা চর্চার প্রয়াস যদি অতৃপ্তিদায়ক হয়, তাহলে সেটা কখনোই ফলপ্রসূ হবে না। তরুণ-তরুণীদের নিকট তার কোন গ্রহণযোগ্যতা অথবা আহ্বান না থাকলে তা কখনোই ফলপ্রসূ হবে না। কাজেই আলোচনা, পরিতুষ্ট করা ও প্রমাণসহ দাবী উত্থাপণ ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই। কারণ, তরুণ-তরুণীরা এ বয়সে পৌঁছলে আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করা ও অপরাপর বিষয়গুলো বোঝার মত আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতা তাদের অর্জিত হয়ে থাকে। এমনকি তারা ভুল ও শুদ্ধ এবং এতদুভয়ের প্রমাণাদিও উপলব্ধি করতে পারে। কথোপকথন ও পরিতুষ্ট করণের দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, অভিভাবক যা বলবে সবকিছুই সে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেবে। কারণ দৃষ্টিভঙ্গি গবেষণা ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত গবেষণামূলক বিষয়গুলো সাংঘর্ষিক ও

---

[১৮০]. তাফসীরে ইবনে কাছির إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ এর ব্যখ্যা

নিক্ষেপযোগ্য। কোন প্রকারের চাপ অথবা বল প্রয়োগ না করে এ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করে যাবেন। তবে নিশ্চিত প্রমাণিত বিষয়, অধিকাংশ ওলামার বক্তব্য অথবা পার্থিব বিষয়ে অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের মতামত কেবলমাত্র বাধ্যমূলক করা যাবে। কিন্তু তা নিরেট অভিভাবকের মত হতে পারবে না। এ সবই হলো জ্ঞানগত অথবা তথ্যগত বিষয়ে। যেমন : বিশ্বাস পরিকল্পনা ও গবেষণা।

পক্ষান্তরে অভিভাবকের জন্য কার্যগত বিষয়সমূহ সন্তানের জন্য বাধ্যতামূলক করা বৈধ, যেখানেই কর্ম সম্পাদনই হলো মূখ্য কাম্য। তবে অবশ্যই তা তরুণ-তরুণী সন্তানদের কল্যাণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। উদাহরন স্বরূপ, বাবা যদি এক মহল্লা থেকে অন্য মহল্লায় অথবা এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে স্থানান্তরিত হতে সংকল্প করে থাকেন, তাহলে বিষয়টা তিনি সন্তানদের সামনে উপস্থাপন করবেন এবং এ ব্যাপারে তাদের মতামত নেবেন। কিন্তু আলোচনার পরও যদি তারা কোনরূপ পরিতুষ্টি অর্জন করতে না পারে তাহলেও এক্ষেত্রে অভিভাবকের উক্ত কর্ম সম্পন্ন করা বৈধ হবে।

প্রজ্ঞা অথবা কারণ বর্ণনাসহ উপদেশ দান

আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন তরুণদের উপদেশ দানের ক্ষেত্রে খুব সংক্ষিপ্ত করে থাকেন। অথচ উপদেশ হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ অনিবার্য বিষয়। কিন্তু তা এককভাবে যথেষ্ট নয় ; বিশেষতঃ এমন বিষয়ে যার পরিণতি সম্পর্কে সে অবগত। যেমনিভাবে শরিয়তের একটি বিধান এককভাবে আলোচনা করা এ অবস্থায় যথেষ্ট নয়। বরং এজাতীয় পরিস্থিতিতে উপদেশ ও বিধান বর্ণনার সাথে যদি কারণ নির্ণয় অথবা রহস্য উদ্ঘাটন করা হয় ; তাহলেই আল্লাহর ইচ্ছায় কেবল তা উপকারী হতে পারে। নিম্নের ঘটনা থেকে আমরা তার উদাহরণ পেশ করতে পারি। ইমাম আহমদ রহ. তার মুসনাদে আবু উমামা রা. থেকে বর্ণনা করেন, 'জনৈক উদীয়মান তরুণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল- 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন! উপস্থিত জনসাধারণ তাকে তিরস্কার করতে লাগলো। তারা বললো, থামো। চুপ করো। অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- 'তুমি আমার কাছে এসো! এরপর সে তাঁর একেবারে নিকটে চলে গেল। (হাদীস বর্ণনাকারী) বলেন, 'এরপর সে বসে পড়লে তিনি বলেন, 'এটা কি তুমি তোমার মায়ের জন্য পছন্দ করবে?' সে বলল না, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা যেন আপনার জন্য আমার জীবনের কুরবানী কবুল করেন। তিনি বললেন- 'কোন মানুষই তার মায়ের সঙ্গে এটা পছন্দ করতে পারে না।' আবার বললেন- 'তাহলে তোমার কন্যার জন্য তা পছন্দ করবে?' সে বলল না, আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তাআলা যেন আপনার জন্য আমার জীবনের কুরবানী কবুল করেন। তিনি বললেন- 'কোন মানুষই তার কন্যার জন্য এটা পছন্দ করতে পারে না।' আবার বললেন- 'তাহলে তোমার বোনের জন্য তা পছন্দ করবে? সে বলল না, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা যেন আপনার জন্য আমার জীবনের কুরবানী কবুল করেন। তিনি বললেন- 'কোন মানুষই তার বোনের জন্য এটা পছন্দ করতে পারে না।' তিনি আবার বললেন- 'তাহলে তোমার ফুফির জন্য তা তুমি পছন্দ করবে?' সে বলল না, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা যেন আপনার জন্য আমার জীবনের কুরবানী কবুল করেন। তিনি বললেন- 'কোন মানুষই তার ফুফির জন্য এটা পছন্দ করতে পারে না।' তিনি আবার বললেন- 'তাহলে তোমার খালার জন্য তা তুমি পছন্দ করবে?' সে বলল না, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা যেন আপনার জন্য আমার জীবনের কুরবানী কবুল করেন।' তিনি বললেন- 'কোন মানুষই তার খালার জন্য এটা পছন্দ করতে পারে না।" (হাদীস বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর তিনি তাঁর হাত মুবারক তার গায়ে সস্নেহে বুলাতে বুলাতে বললেন- 'হে আল্লাহ, তুমি ওর পাপরাশি ক্ষমা করে

দাও। ওর অন্তরকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ করে দাও। এবং ওর লজ্জাস্থানকে তুমি সুসংহত কর।' এরপর সেই উদীয়মান তরুণটি আর কোন দিকে তাকায়নি।'[১৮১]

লক্ষ্য করুন, এখানে তরুণটির নিকট ব্যভিচার নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টা গোপন ছিলো না। এ কারণেই সে অনুমতি প্রার্থনা করতে এসেছিল। 'আল্লাহকে ভয় কর! এটা হারাম অথবা বৈধ নয়' এখানে এই কথা বললে হয়তো বা তরুণটির কোন উপকারে নাও হতে পারতো। তা ছাড়া এ বিধান তারও গোচরীভূত হওয়ার ফলে তার অন্য কোন বিষয়ের প্রয়োজন ছিল। সে কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গে বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তা হলো ব্যভিচার নিষিদ্ধ হওয়ার রহস্য উদ্ঘাটন। রহস্যটা হলো ভিকটিম নিশ্চয় কারো মা, কন্যা, বোন, ফুফি অথবা খালা হয়ে থাকবে। এছাড়া অন্য কিছূ হওয়া সম্ভব নয়। তরুণ যখন নিজের জন্য তা অনুমোদন করতে পারল না, তাহলে অন্যেরা নিজেদের জন্য তা পছন্দ করবে কিভাবে। কীভাবে এর বৈধতা দেবে? অতএব এই আত্মিক প্রমাণ ঐ উদীয়মান তরুণের অন্তর থেকে উক্ত কুকর্মের বাসনা চিরতরে দমন করে দিয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে সত্য ও সংযমের ওপর দৃঢ়পদ থাকার জন্য দোয়া করা হল।

অতএব এজাতীয় পরিস্থিতিতে আমরাও এরকম পদক্ষেপ নিতে পারি। মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারি। এ ধরনের কর্মের ক্ষেত্রে এরূপ বলা যেতে পারে : 'তুমি তার স্থানে যাও, এবং আমাকে বল তুমি কি করছ?' মানুষ যদি অসংখ্য ব্যাপারে এরূপ কর্ম করতে পারতো, তাহলে মানুষের মধ্যে অনেক সমস্যার সৃষ্টিই হত না। কোন মানুষ যদি নিজেকে তার স্থানে উপস্থান করে যে তার আচরণ ও কর্ম তৎপরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাহলে কখনো কখনো সে ঐ পথটি অথবা তার নিকটবর্তী কোন পথ অবলম্বন করে থাকবে। সুতরাং কর্তব্য হলো তাকে এই পথের দিশা দেয়া।

নৈকট্য অর্জন ও পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন

এই বয়সে তরুণ অথবা তরুণীরা গবেষণা ও পরিকল্পনায় অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। অবশ্য এটা তারা উপলব্ধি করতে পারে না। বরং তারা মনে করে গভীর গবেষণা করার সামর্থ্য তাদের রয়েছে যার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য থেকে ফলাফল চয়ন করা যায় ও গবেষণার উক্ত বিষয়কে তার অংশসমূহের মধ্যে বিভক্ত করা যায়- যার দ্বারা বিষয়টা গঠিত হয়েছে। ফলে তার অন্তর্নিহিত তথ্য উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে। ফলশ্রুতিতে সে যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকবে তখন তার চেয়ে যে অভিজ্ঞ ও বড় তার মত দ্বারা আলোকিত অথবা কোন পরামর্শ ব্যতিরেকে অথবা যে কোন পরামর্শের উপযুক্ত নয় এমন ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করে সমাধানের প্রচেষ্টা চালাবে। তবে তরুণ, অভিভাবক, মা-বাবা ও শিক্ষকের মধ্যে ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে। যেখানে থাকবে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মূল্যায়ন। থাকবে না কোন তাচ্ছিল্য ও অবমূল্যায়ন। সেখানে শুধু থাকবে তরুণ সন্তানদের প্রতি উৎসাহ, স্নেহ ও মমতা। তাহলে সে এজাতীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে অবশ্যই অভিভাবকের নিকট বিষয়টা উপস্থাপন করবে নিশ্চয়। তার পরামর্শ নেবে, তিনি যে দিকনির্দেশনা ও উপদেশ দেবেন তা সাদরে গ্রহণ করবে। কাজেই এই পরিস্থিতিতে তরুণের নৈকট্য অর্জন ও তার মধ্যে সুসম্পর্কের বীজ বপণ করা এবং যে সমস্যা তার ভেতরে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব সে সম্পর্কে খুব কাছ থেকে জানতে সচেষ্ট থাকা মা-বাবা ও শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য।

পবিত্রতা বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ

তরুণ-তরুণীরা বয়োঃসন্ধিক্ষণে উপস্থিত হলে প্রত্যেকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পবিত্রতা অর্জনের বিধানাবলি সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। কারণ এ স্তরে নতুন এমন অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয় যা ইতোপূর্বে

[১৮১] মুসনাদে আহ্মদ : **২১১৮৫**

ছিলো না। যে কোন মসজিদে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তাহারাতের বিধানাবলি বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা উচিত। সেখানে একজন বিজ্ঞ শিক্ষক দরস পরিবেশন করবেন। অপর দিকে একই সাথে তরুণীদের জন্য কোন মহিলা শিক্ষক ক্লাশ নেবেন। এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে সমস্যার প্রকৃত সমাধান। বিশেষ করে আলোচনাটা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয় বরং দলকে সম্মোধন করে হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে কোন সমস্যা নেই। বরং মসজিদে এজাতীয় প্রশিক্ষণের অনুষ্ঠান আলোচ্য বিষয়ের ভাবগাম্ভীর্য ও মর্যাদাটাকে একটু বৃদ্ধি করে বৈকি। সুতরাং এ বিষয়ে কোন অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য অথবা অযৌক্তিক মন্তব্য করার আর কোন অবকাশ থাকল না। বরং সকলেই অনুভব করতে পারবেন যে, এই হলো প্রকৃত দ্বীন। কারণ এখানে তো একজন বিজ্ঞ আলেমের পক্ষ থেকে দ্বীন অথবা তালেবে ইলম সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকে। তা আবার এমন স্থানে বসে যেটা কোরআন তেলাওয়াত ও সালাতের মত সৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত।

নম্রতা, অনুগ্রহ প্রদর্শন ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ না করা

ছাত্রের উচ্চ স্থান অর্জনের আগ্রহ কখনো কখনো অভিভাবককে তার করণীয় পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়ে থাকে। ফলে তা শিক্ষার্থীর জন্য দুঃসাধ্য হয়ে যায়। এমনকি শিক্ষার্থী এতে বেশ বিরক্ত হয়েও উঠে। কিন্তু তাদের ধারণ ক্ষমতার দিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখলে তবে প্রশিক্ষণ ও প্রতিপালন ফলপ্রসূ হতে পারে। আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সমবয়স্ক একদল যুবক আসল। তারা তাঁর নিকট বিশটি রাত অবস্থান করল। অতঃপর যখন তিনি অনুধাবন করলেন যে, তাদের নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার বিষয়টা তাদের নিকট একটু কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদেরকে অন্তিম উপদেশ দিলেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের নিকট হযরত মালেক বিন হুওয়াইরিছ রা. হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আগমন করলাম, তখন আমরা সমবয়স্ক টগবগে যুবক ছিলাম। আমরা তাঁর নিকট বিশ দিন বিশ রাত অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন কোমলহৃদয় ও বিনম্র প্রকৃতির মানুষ। এরপর যখন তিনি বুঝতে পারলেন আমরা নিজেদের পরিবারের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছি এবং আমাদের কষ্ট হচ্ছে। আমরা যাদের পেছনে রেখে এসেছি তাদের সম্পর্কে আমাদেরকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আমরা তার নিকট সবকিছূ খুলে বললাম। তিনি বললেন- 'তোমরা তোমাদের পরিবারের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে অবস্থান করো। তাদেরকে শিক্ষা দাও। তাদেরকে আদেশ করো।' আরো কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন যা আমি মনে রাখতে পেরেছি অথবা আমার মনে নেই। 'তোমরা সালাত আদায় করো যেভাবে তোমরা আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ। অতএব যখন নামাজের সময় উপস্থিত হবে তখন তোমাদের মধ্যে একজন আযান দেবে ও তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞজন নামাজে তোমাদের ইমামতি করবে।'[১৮২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের পরিবারের দিকে আগ্রহ লক্ষ্য করলেন তখন তাদেরকে সেদিকে ফিরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিলেন। এই হাদীস থেকে এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া ও তার প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত হওয়া তাদের প্রতি বিনম্র হওয়া ও মানবিক দুর্বলতাকে অবজ্ঞা না করা শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দের একান্ত কর্তব্য। সুতরাং তাদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করবেন না যাতে তাদের কষ্ট হয়। তারা ফেরেশ্‌তা নয়, বরং তারাও অন্য মানুষের মতই মানুষ।

---

[১৮২]. বুখারী : ৫৯৫

তাকে পুরুষদের সমাজে নিয়ে যাওয়া

যার বয়োঃসন্ধির নিদর্শনগুলো ফুটে উঠেছে সেই তো একজন পুরুষ। এই ভিত্তিতে সে পূরুষদের সমাজে যেতে পারে। তার সঙ্গে এই দৃষ্টিতে আচরণ করতে হবে। তারা এখনো শিশু অথবা বাচ্চা এই ভিত্তিতে আচরণ করা কখনোই সমীচীন হবে না। অনুরূপ তরুণীরাও। ফলে এই আচরণই তাদের কর্ম তৎপরতাকে পুরুষ অথবা মহিলাদের মত বড় ও তাৎপর্য মণ্ডিত করে দেবে। বড়দের সমাজে তাদের অংশগ্রহণকে সহজ করে দেবে। অন্য দিকে তাদের প্রাক্তন শৈশব সমাজকে খুব দ্রুত অতিক্রম করতে সহায়ক হবে।

দায়িত্বভার গ্রহণে কার্যকর অংশগ্রহণ

এই স্তরে এসে সেই ছোট্র শিশুটি একজন প্রাপ্তবয়স্ক তরুণে পরিণত হয়ে গেল। ফলশ্রুতিতে শরিয়তের বিধানাবলি তার ওপর বাধ্যতামূলক হল। অর্থাৎ দায়িত্বভার বহণের পরিপূর্ণতা ও তার কৃত সকল কর্মতৎপরতার ফলাফল বের করতে সে সক্ষম হয়ে গেছে। সে কারণে তার দায়িত্বভার গ্রহণে সদা তৎপর থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। যদি এ ক্ষেত্রে শিশু কোন ভুল করে বসে তারপরও অভিভাবক তাকে এ বিষয়ে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করবে। অভিভাবক অসংখ্য বিষয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ ও আলোচনা করে নিতে পারেন। তিনি তার কথা অনুযায়ী কাজ করবেন যদি তা শুদ্ধ প্রমাণিত হয়। তরুণ সন্তানের সঙ্গে অভিভাবকের পরামর্শ তার এই অনুভূতি জাগ্রত করবে যে, তার মতামতের একটা মূল্য আছে এবং সেও নির্ভরশীল হওয়ার যোগ্য। তার দায়িত্বানুভূতি ও সম্পাদনের আগ্রহ এবং তা বহনে কষ্টসহিষ্ণুতাকে বেশ শক্তিশালী করবে। ফলে তার মত ও চিন্তাকে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ পর্যায় নিয়ে পৌঁছাতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকবে। এর সম্পূর্ণ বিপরীত ফল হবে যদি তাকে অবজ্ঞা ও তার মতামতের দিকে ভ্রুক্ষেপ করা না হয়। প্রকাশ থাকে যে, পরামর্শের পুনরাবৃত্তি তাদেরকে অনুগত নয় বরং যারা অপরের পেছনে চলে তাদেরকে নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। ফলে তারা শ্রমসাধ্য কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। তরুণীদের ক্ষেত্রেও বিষয়টা তরুণদের মতই।

অভিভাবকের কর্তব্য হলো এগুলো শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে সে আহরণ করবে। নিশ্চয়ই মানুষের অনেক প্রয়োজন থাকতে পারে। তার একজন সাহায্যকারীরও প্রয়োজন আছে। এখন থেকেই যদি তরুণের দায়িত্বভার গ্রহণে তাকে অংশগ্রহণ করানোর ক্ষেত্রে তৎপর না হওয়া যায়, তাহলে সে নিজেকে ঐ প্রয়োজনগুলোর আয়োজন সাধনে কষ্টের সম্মুখীন হবে। অথবা অন্য লোকদের সাহায্য নিতে প্রয়াস পাবে যারা তাকে সহায়তা করতে পারে। এর মধ্যে যদিও সাহায্য প্রার্থনার দিক থেকে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায় তা কখনো কখনো সন্তানদেরকে নিষ্কর্মা ও ব্যর্থ ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করে ফেলবে। ফলে তাদের ভূমিকা হবে অন্যের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়ানো। যার অশুভ পরিণতি হতে অভিভাবকগণও মুক্ত থাকতে পারবেন না।

যে সকল কাজ এই বয়সে তরুণদের সম্পন্ন করা কর্তব্য তার মধ্যে অন্যতম হলো, পরিবারের নিত্যপ্রয়োজনীয় কোন কাজ যা গাড়ী ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। সে একই সঙ্গে তখন ড্রাইভ করার আগ্রহ দেখাতে পারে। কিন্তু বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তদারক করা কর্তব্য। কারণ, অধিকাংশ দুর্ঘটনার জন্য এটাই একমাত্র কারণ হয়ে থাকে। প্রথমেই তাকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ দেয়া কর্তব্য। তাকে গাড়ি ড্রাইভ করার অনুমতি দেয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার নিজের ও অপরের জীবন কার্যতঃ সংরক্ষণে সক্ষম না হবে। তেমনিভাবে তাকে স্থায়ীভাবে গাড়ির চাবি দেয়া যাবে না। বরং তা ঘরে মা-বাবার সাথে থাকবে। কেবল প্রয়োজনের সময় তাকে তা দিতে হবে। তাও আবার বের হওয়া

ও প্রত্যাবর্তনের সময় তদারকি করতে হবে। তরুণের কর্মতৎপরতা, কর্মের স্থীরতা ও গাড়ীটি যেন রীতি বহির্ভূতভাবে বের হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে সে ব্যপারে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত।

শ্রমসাধ্য কর্ম জ্ঞান ও তথ্য ভাণ্ডারের দিকে তরুণ সন্তানের অগ্রগতি ও অনুরাগ মূল্যায়ন

মুসলিম বিশ্বের অনেক বরং সিংহভাগ দেশের শিক্ষাগত পরিস্থিতির দিকে লক্ষ করলে যা প্রতিভাত হয় তা হল : কোন বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের সূচনা সাধারণত এই বয়োঃস্তরেই হয়ে থাকে। অধিকাংশ অভিভাবক সন্তানের আগ্রহ সামর্থ্য ও তার প্রস্তুতির দিকে কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করেই তাদের সন্তানদেরকে এমন অধ্যয়ন অথবা উচ্চ পর্যায়ের প্রবাস চাকুরীর দিকে দিকনির্দেশনা দিতে প্রয়াস পান– যাকে তারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ মানের বলে জ্ঞান করে থাকেন। অতঃপর তারা এ বিষয়ে তরুণের ওপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করে থাকেন–যা অনেক সময় প্রত্যাশিত ফলাফল প্রাপ্তি থেকে তাদেরকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবে। বহু বাবা অথবা অভিভাবক রয়েছেন (যে বিষয়ে তার সন্তান ভালো অথবা সক্ষম নয় সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে নিজ সন্তানের জীবন থেকে অনেকগুলো বছর নষ্ট করার কারণে) যারা অনুতাপ ও লজ্জায় আঙ্গুল কাঁটছেন।

এখানে আমাদের একথা বলে রাখা উচিত : প্রত্যেকটি উপকারী জ্ঞান অথবা কারিগরি বিদ্যা -চাই তা যে মানেরই হোক না কেন- মুসলিম উম্মাহর তা নিতান্ত প্রয়োজন। সন্তান যখন সেগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। সে ওখান থেকে যে ফল লাভ করতে পারবে তা পার্থক্যবোধহীন ভোগবাদী সমাজের দৃষ্টিতে এর চেয়ে কোন উৎকৃষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে প্রভুত অর্জনের চেয়ে অনেক মহৎ ও বড়। (উদাহরণ স্বরূপ) একজন অভিজ্ঞ মেকানিক্স অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের চেয়ে অনেক বেশি সমাজের উপকার করে থাকেন। সম্পদও তার চেয়ে বেশি উপার্জন করেন। সন্তানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও ভর্তি করা অথবা মেধার দুর্বলতার দরুণ যা অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তার জন্য চাপ প্রয়োগ অভিভাবকদের উচিত নয়। কারণ এর দ্বারা হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বরং যে বিষয়ে উৎকর্ষ সাধন ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সামর্থ্য কিংবা তাদের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় সেই দিকেই তাদেরকে দিকনির্দেশনা দিতে হবে। কিন্তু সন্তানের আগ্রহশূন্যতা নিরসনকল্পে অভিভাবককে সজাগ ও সচেষ্ট থাকতে হবে। এটা তার দুর্বলতা, সামর্থ্যহীনতা নাকি কর্মটা তার জন্য দুঃসাধ্য সেটা বুঝতে হবে।

ইবনে কাইউম রহ. এর এ সংক্রান্ত একটি উৎকৃষ্ট বাণী রয়েছে। তিনি বলেন, 'সন্তানের অবস্থা দেখে তার শিক্ষার বিষয়টি নির্ধারণ করা উচিত। এটা পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নিলে অন্যটা করতে সে উদ্যত হবে না।। সে যদি তার জন্য নির্ধারিত কর্মের বিপরীতটা করতে উদ্যত হয়, তাহলে কখনো সফলকাম হতে পারবে না। তার জন্য যা প্রস্তুত ছিল তাও হারিয়ে যাবে।

যদি দেখা যায় পড়াশুনা না করে সে অশ্বারোহণ, তীর নিক্ষেপ ও তীর নিয়ে খেলা করতে পছন্দ করে। তাহলে তাকে আপনি অশ্বারোহণের উপকরণ ও এর ওপর অনুশীলন গ্রহণের সুযোগ দিন। কারণ এটা তার নিজের ব্যক্তি ও গোটা মুসলিম জাতির জন্য উপকারী। যদি দেখে তার নয়ন যুগল কোন কারিগরি পেশার দিকে উন্মোচিত, প্রস্তুত ও গ্রহণকারী হিসেবে দেখতে পায়। যা হবে বৈধ জনহিতকর কারিগরি পেশা, তাহলে তাকে এর জন্য সুযোগ দেয়া উচিত। এ সকল বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে ভর্তি করাতে হবে ধর্ম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদানের পর। কারণ তা বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার প্রমাণ উপস্থাপন সহজ করে দেয়। যেহেতু বান্দার বিরুদ্ধে পেশ করার মত তাঁর রয়েছে অকাট্য প্রমাণ। যেমনিভাবে বান্দার ওপর তার রয়েছে অফুরন্ত নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।[১৮৩]

১.তুহফাতুল মওদুদ ফি আহকামিল মওদুদ : ২৪৩

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাতেবী রহ. এর রয়েছে মূল্যবান বক্তব্য, যা তিনি সবিস্তারে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টিকুলকে যখন সৃজন করেছেন তখন তারা নিজেদের পার্থিব ও পারলৌকিক প্রয়োজন ও কল্যাণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর ছিল। আপনি কি আল্লাহ তাআ'লার এই বাণীর দিকে লক্ষ করেননি ?

وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا.(النحل-78)

'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না।'[১৮৪]

অতঃপর তাদেরকে প্রতিপালনের প্রয়োজন সাপেক্ষে আস্তে আস্তে এ সম্পর্কিত জ্ঞান দান করেছেন। একবার নবজাতকের অন্তরে প্রত্যাদেশ করেন। যেমন : জননীর স্তন্য স্পর্শ করা ও তা চোষার প্রত্যাদেশ। দ্বিতীয় বার শিক্ষার মাধ্যমে। অতএব মানুষের জন্য সকল কল্যাণকর বিষয় গ্রহণ ও ক্ষতিকর বস্তু নিরসন করার জন্য তার শিক্ষাগ্রহণ ও জ্ঞান অন্বেষণ করা কর্তব্য। ঐ স্বভাবগত এবং আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভাগুলো তার মধ্যে বিকশিত হওয়ার পর যা প্রতিফলিত হবে। কারণ, বিস্তারিত ও সামগ্রিক কল্যাণ আহরণের জন্য এটা হল যেন ভিত্তিমূল। তা হতে পারে কতগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিশ্বাস গত বিষয় অথবা ইসলামী ও অভ্যাসগত শিষ্টাচারসমূহ। এসবের প্রতি যত্নবান হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে তার জন্মগত স্বভাব ও তার প্রতি যে বিস্তারিত অবস্থা ও কর্মসমূহ প্রত্যাদেশ করা হয়েছে তা আরো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হতে থাকবে। ফলে এটা প্রকাশিত হয়ে যাবে তার মধ্যে প্রতিফলিত হবার সাথে সাথে তার ঐ সকল বন্ধুদের মধ্যেও প্রতিফলিত হবে যারা এ প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। সুতরাং বোধ ও বুদ্ধির এমন সমন্বয় আর কখনোই সূচিত হতে পারবে না। প্রাথমিক বয়সে যা তার জন্মগত স্বভাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তার বিপরীত কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া তার পৃষ্ঠে পরিস্ফুট হবে। যার ফলে আপনি লক্ষ করে থাকবেন : একজন প্রস্তুতি নিচ্ছে জ্ঞান অন্বেষণের ও অন্যজন করছেন নেতৃত্বের অন্বেষণ। আর একজন প্রয়োজনীয় কারিগরি বিদ্যা ও অপর ব্যক্তি প্রস্তুতি নিচ্ছেন সকল বিষয়ে লড়াই ও তর্ক করার জন্য।

প্রত্যেকের মধ্যে যদি সামগ্রিক কর্ম তৎপরতা প্রোথিত করা হয়ে থাকে তাহলে এক অভ্যাসকে অপর অভ্যাসের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। ফলে তার আদিষ্ট হওয়াটা শিক্ষাপ্রাপ্ত ও শিষ্টাচার সমৃদ্ধ অবস্থায় হবে যার ওপর বর্তমানে সে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় সেই আবেদনটি প্রত্যেক আদিষ্ট ব্যক্তির ওপর তাৎক্ষণিকভাবে প্রযোজ্য হবে সেই কর্মকাণ্ডসমূহে সে তৎপর। ফলে প্রত্যক্ষদর্শীদের সেই দিকে দৃষ্টিপাত নির্ধারিত হয়ে গেল। অতঃপর সামর্থ অনুযায়ী তার পরিচর্যা করবে। সুতরাং তাদেরকে এমনভাবে যত্ন নিতে হবে যেন অভিভাবকের হাতেই ওরা সঠিক পথের ওপর উঠতে পারে। এটা বাস্তবায়নে তাদের সহায়তা করবে। এরও অনেক পর স্থায়ীত্ব অর্জনের জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে। যাতে প্রত্যেকের মধ্যে তার বিজিত চরিত্র প্রতিফলিত হয় এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, সে দিকে তার ঝোঁক রয়েছে। এরপর তারা পরিবারের মাঝে থাকলে তাদের সাথে সুসামঞ্জস্য আচরণ করা যেতে পারে। ফলশ্রুতিতে তারা তার অধিকারী হয়ে যাবে যদি তা তাদের জন্যই হয়ে থাকে। যেমন জন্মগত গুণাবলি ও প্রয়োজনীয় অনুভূতিগুলো। ফলে সাধিত হবে প্রভুত কল্যাণ ও প্রকাশিত হবে উক্ত প্রতিপালনের ফলাফল।

উদাহরন স্বরূপ : ধরুন, কোন শিশুর মধ্যে উত্তম অনুভূতি, উৎকৃষ্ট বোধ ও শ্রুত বিষয়ের পর্যাপ্ত সংরক্ষণ ইত্যাদি গুণাবলি প্রকাশিত হয়, যদিও এসব ছাড়া অপর গুণাবলিও তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে তা সত্ত্বেও তাকে উক্ত মহৎ লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করতে হবে। সার কথা হলো : তার মধ্যে এ নিশ্চিত গুণাবলি তার মধ্যে শিক্ষার কল্যাণ সংক্রান্ত যে তৎপরতা প্রত্যাশা করছেন তার মূল্যায়ন করা নিতান্ত কর্তব্য। অতএব

[১৮৪]. সুরা নাহল : ৭৮

শিক্ষা গ্রহণ ও সকল বিদ্যা সম্পর্কে সমন্বিত শিষ্টাচারে সমৃদ্ধি অর্জন তার কাছ থেকে কাম্য। সেখান থেকে অন্য দিকেও দৃষ্টি ফেরানো কর্তব্য। ফলে তার থেকে গ্রহণ ও তার সহায়তা নেয়া যাবে। কিন্তু তা একটা নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে হতে হবে। যে সম্পর্কে বিদগ্ধ ওলামায়ে কেরাম নির্দেশ করেছেন। যখন উক্ত 'অন্য' এর মধ্যে প্রবেশ করবে তার স্বভাব বিশেষতঃ সে দিকেই ঝুঁকে পড়বে। ফলে তাকে অপরের থেকে বেশি ভালোবাসবে। তাকে এ ব্যাপারে সচেতন করা পরিবারের ওপর কর্তব্য। যাতে তাকে কোনরূপ অবজ্ঞা অথবা অবমূল্যায়ন ব্যতিরেকে তার কাছ থেকে সে পরিমিতভাবে গ্রহণ করতে পারে। এরপর সে যদি এখানেই অবস্থান করে তাহলে ভালো। যদি অভিভাবক অথবা অপরের থেকে আরো গ্রহণ কাম্য হয়। তাহলে সেক্ষেত্রে তার সাথে তেমন আচরণ করবে যা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। অনুরূপ এটার সমাপ্তি ও এ কথা বলা পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখবে :'অনুরূপ ক্রমবিন্যাস প্রযোজ্য হবে তার ক্ষেত্রেও যার পদক্ষেপ গ্রহণ, সাহসিকতা ও কর্ম পরিচালনার গুণাবলি ইতিমধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং তাকেও ঐ দিকে ধাবিত করবে ও সামগ্রিক বিদ্যা সংক্রান্ত সমন্বিত শিষ্টাচার শিক্ষা দেবে। এরপর তাকে উন্নত থেকে উন্নততর ব্যবস্থাপনার পেশাগত দক্ষতার দিকে নিয়ে যাবে। যেমন : চিকিসা, সংগঠন, সমর, পথ প্রদর্শন অথবা নেতৃত্ব প্রভৃতি থেকে সে যেটার যোগ্য, তার ইচ্ছা, সেটা সে গ্রহণ করবে। সে কারণে প্রতিটি কর্মের ব্যাপারে তাকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে, যেন তা সমগ্র জাতির দায়িত্ব। কারণ, সেই প্রথম এই সমন্বিত পথের অগ্রপথিক। অতএব অগ্রপথিক যদি দাঁড়িয়ে যায় এবং ভ্রমণে অপারগতা প্রকাশ করে, তাহলে তো প্রকারান্তরে তার জন্য অপেক্ষমান সমগ্র জাতিই দাঁড়িয়ে থাকবে। পক্ষান্তরে তার নিকট যদি এমন শক্তি থাকে যা সার্বজনীন কর্তব্যসমূহ পালন ও যে কর্মসমূহ সম্পাদনের জন্য ব্যক্তির দুস্প্রাপ্যতা রয়েছে সে ক্ষেত্রে তার ভ্রমণকে গতিশীল করতে সক্ষম। যেমন : শরিয়তের বিধনাবলির বাস্তবায়ন ও রাষ্ট্রপরিচালনার প্রচেষ্টা- যার মাধ্যমে পৃথিবীর স্বাভাবিক পরিস্থিতি ও পারলৌকিক আমলসমূহ সুস্থির ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। এ সকল ক্ষেত্রে তাকে চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছাতে সক্ষম।[১৮৫]

এখানেই এই সংকলনের সমাপ্তি। আমি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করছি। তিনি যেন এর দ্বারা লেখক, পাঠক ও সকল মুসলিম সন্তানকে উপকৃত করেন। আমীন!

وصلى الله تعالى وسلم على نبينامحمد بن عبدالله النبي الخاتم وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.

১.আল-মুওয়াফিকাত : ১/১৭৯-১৮১, মুসলিম সমাজের অবস্থা ও সম্প্রতিকালের ওলামায়ে কেরামের দিকনির্দেশনা সম্পর্কিত ইবনুল কায়্যুম র. ও শাতেবী র. এ বক্তব্য দু'টি দ্বরা প্রমাণিত হয় যে, আরো সকালেই সূচিত হয়। অর্থ্যাৎ বুঝসম্পন্ন শৈশব স্তরেই হয়। আমাদের বর্তমান সময়ে পরিস্থিতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ার কারণে আমি এখানে বিষয়টির আলোচনা করেছি। যেহেতু বর্তমানে উল্লেখিত বয়োঃস্তরের পূর্বে বিশেষজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দু একটা ব্যতিক্রম পরিস্থিতি তো থাকতেই পারে। তবে ব্যতিক্রমের জন্য কোন মূলনীতি হয় না।

গ্রন্থপঞ্জি

১- আহমামূল কোরআন- আবু বকর আল-জাস্‌সাস

২- আত্‌ তাহরীর ওয়াত্‌ তানভীর- তাহের বিন আশুর

৩- তাফসীরে ইবনে কাছীর- হাফেজ ইবনে কাছীর

৪- তাফসীরে ইবনে সাউ'দ- ইবনে সাউ'দ

৫- তাফসীরে বাগভী- বাগভী

৬- তাফসীরে বায়দাভী- বায়দাভী

৭- তাফসীরে কুরতুবী- ইমাম কুরতুবী

৮- জামেউ'ল বয়ান- ইমাম তাবারী

৯- সহিহ্‌ আল-বুখারী- ইমাম মুহম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী

১০- সহিহ মুসলিম- ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জায আন্‌-নিশাপুরী

১১- ফাত্‌হুল বারী- ইবনে হাজার

১২- উমদাতুল কারী- বদরুদ্দীন আইনী

১৩- সুনানে আবি দাউদ- আবু দাউদ

১৪- সুনানে তিরমিযি- ইমাম তিরমিযি

১৫- আল-মুসনাদ- ইমাম আহমদ

১৬- সহিহ ইবনে খুযাইমা- ইবনে খুযাইমা

১৭- সহিহ ইবনে হিব্বান- ইবনে হিব্বান

১৮- সুনানে বায়হাক্বী- বায়হাক্বী

১৯- আল-মুস্তাদরেক- আল-হাকেম

২০- আল-মু'জামূল কবীর- তাবরানী

২১- আল-মুসান্নাফ- আব্দুর রাজ্জাক সানআনী

২২- মুসনাদুশ্‌ শামিয়্যীন- আবুল কাসেম তাবারানী

২৩- মুসনাদে আবি ইয়া'লা- আবু ইয়া'লা

২৪- মুসান্নাফে আবি শাইবা- আবু শাইবা

২৫- শারহে মাআ'নিল আছার- ইমাম তাহাবী

২৬- তাহজিবুল কামাল- হাফেজ মুযাই

২৭- আউনুল মা'বুদ শারহে সুনানে আবি দাউদ- শামসুল হক আজীমাবাদী

২৮- আল-মুহায্যআব-শিরাজী

২৯- তুহফাতুল মাওদুদ ফি আহকামিল মাওলুদ- ইবনে কাইয়্যূম যাওজিয়া

৩০- আত্ তাম্হীদ- ইবনে আব্দুল বার্‌র

৩১- এহ্য়ায়ে উলুমুদ্দীন- আবু হামেদ গাযালী

৩২- লিসানুল আরব- ইবনে মানযুর

৩৩- ইলমু নাফসিল মারাহিলিল উমরিয়্যাহ- আ. ড. উমার বিন আঃ রহমান মুফ্দা

৩৪- ইলমু নাফসিন নামুব্বি আত-তাফুলাতি ওয়াল মুরাহিক্বাহ- ড. হিশাম মুহম্মদ মুখাইমার

৩৫- আল-মুরাহিকুন দিরাসা নাফসিয়্যা ইসলামিয়া- ড. আব্দুল আযীয বিন মুহম্মদ নুগাইমিশী